বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের শিশু সংখ্যা

১০ম বর্ষ ৪র্থ ও ১১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর '১৬ থেকে-মার্চ ২০১৭

প্রধান সম্পাদক
শওকত হোসেন

সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

স ম্পা দ কী য়ঃ এক

কিছু সবুজ ঘাস যদি আমরা ইট দিয়ে ঢেকে রেখে দেই তাহলে কী ঘটবে? অল্পদিনের মধ্যেই ইটের চাপে সবুজ-সুন্দর ঘাস হলদে-বিবর্ণ, ফ্যাকাসে হয়ে যাবে। আমাদের শিশুদের কি এমন ফ্যাকাসে-বিবর্ণ দশা নয়! আমাদের শিশুরা কি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, বঞ্চিত নয়?

একটি শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে। পারিবারিক পরিবেশ হল তার সার্বিক বিকাশের প্রথম সোপান। পরিবারিক পরিবেশ যদি তার অনুকূলে না থাকে তবে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। তখন শিশুটির মধ্যে নানা ধরনের মানসিক রোগ দেখা দেয়। একটি শিশুর শিশুবয়সে কী প্রয়োজন? খেলার মাঠ? সাঁতার কাটার পুকুর? তার উপযুক্ত বিনোদন? অথবা কোনো সংগঠন? এমতাবস্থায় শিশুরা বিনোদন হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে কম্পিউটার-এ গেইম খেলা ও কার্টুন দেখাকে। অথচ সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেরকম খেলাধুলা বা শরীরচর্চার প্রয়োজন তার অভাবে তারা 'ব্রয়লার' প্রকৃতির প্রাণীর মতো হয়ে উঠছে দিন দিন।

শিশুদের জন্য প্রকৃত শিক্ষা কী? কোন শিক্ষা তাদের শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রেখে দেশের সম্পদ করে তুলবে? আমরা কারা তাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করি? শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণের যোগ্যতাই-বা তাদের কতটুকু আছে তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? শিশুরা যে বয়সে কল্পনার জগতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটবে সেখানে তাদের একাধিক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট-কোচিং আর বাড়ির কাজ করতে করতে ফুরসতহীন চব্বিশটি ঘণ্টা পার করতে হয়। তাদের কাছে রাত আর দিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ফলে অনুভূতির জগৎ তাদের জড়বস্তুর মতো হয়ে যাচ্ছে।

শিশুর সহজাত সৃষ্টিশীল মন বাধা পেতে পেতে এক সময় ভুলে যায় জীবনের অর্থ। নির্জীব কাঠের পুতুল হয়ে বেড়ে ওঠা শিশুটি এক সময়ে যে ফ্রাংকেনস্টাইন হয়ে ওঠে না তা কি আমরা এখন আর হলফ করে বলতে পারি?

শিক্ষায় নারীর অগ্রগতি হয়েছে বলা হয়। অথচ শিক্ষাজীবন শেষে নারীরা সংসারজীবনে এসে 'বাঁধা গোলাম বা বাঁধা বুয়া'য় পরিগণিত হয়।

এর কারণ কী? কারণ হল পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থা নারী শিশুশিক্ষার্থীকে তার জীবনের প্রভাতবেলায় নিজেকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখায় না। নারী ছাড়া সে নিজেকে আর কিছুই ভাবতে পারে না। এতে তার অধিকার, তার মতামতের যে গুরুত্ব আছে সেটা সে কোনোদিন জানতেও পারে না। রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার এই ত্রিকোণ-খাচায় বন্দি নারীশিশুরা লোহার শেকলে যেন আরো মজবুত করে গেঁথে যাচ্ছে।

'বাংলাদেশের শিশু সংখ্যা'য় যারা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শরমিন নিশাত
সম্পাদক, হালখাতা
১৫ মার্চ ২০১৭

স ম্পা দ কী য়: দুই

একজন শিশু যে হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, যার হাতে কোনই ক্ষমতা নাই– অথচ সেই শিশুটি পুরো বাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর কারণ শিশুটির শিশুত্ব। এই শিশুত্ব সমাজের যে যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে, সে-ও অন্যদের নিয়ন্ত্রণের ভার পায়। যখন একটি সমাজ নিয়ন্ত্রণহীন, বল্গাহীন হয়, তখন সেখানে যে জিনিসের ঘাটতি তৈরি হয়, সেটি ওই শিশুত্ব।

শিশুর রয়েছে নিজস্ব কিছু কৌশল ও রাজনীতি। যার একটি হল কারও ক্ষতি সে করে না, আরেকটি হল যাকে সে অপছন্দ করে তাকে আঘাত করে সহনীয় মাত্রায়। যে সমাজে আঘাত যত নিষ্ঠুর থাকে, সে সমাজের মানুষ ততো রসহীন ও উগ্র হয়। নিষ্ঠুরতা জন্ম নেয় প্রেমহীনতা থেকে, উগ্রতা যার পরিণতি।

সুতরাং ব্যক্তির অন্তর্গত শান্তি, পরিবারের সুখ, একটি সমাজের শৃঙ্খলা– সবই অর্জিত হতে পারে শিশুর কাছ থেকে। শিশু তাই বিশ্ব-শান্তিরও শিক্ষক!

দুই.

উন্নত দেশগুলো পোষা প্রাণীকেও যখন পালন করছে বিশেষ যত্নে, তখনো বাংলাদেশের শিশুদের একটা বড় অংশকে প্রতিরাতে ঘুমাতে যেতে হয় ক্ষুধার্ত পেটে। শুধু তা-ই নয়, দেশে শিশু-নির্যাতন কমানোর কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়ায় দিন দিন তা বেড়েই চলছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, নির্যাতনের ফলে ২০১৬-তে মৃত্যুবরণ করেছে ৪৬৫ জন শিশু। যা উদ্বেগজনক!

শিশুকাল না-পেরুতেই একজন নারী-শিশুর মুখোমুখি হতে হয় স্বামী-শাশুড়ি'র বেঁধে দেয়া সতর্কবেঁড়ির– তার কিছুদিন বাদেই নেমে আসে সন্তান ধারণ ও পালনের ধকল!

১৮ বছরের একজন মানুষের কিছুই বুঝে ওঠার কথা নয় তার চারপাশ সম্পর্কে। ২০১৬-তে শিশু-বিবাহের বয়স পূর্বের ১৮ থেকে কমিয়ে আরও শিথিল করা হল। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে ১৬ বছরেও বিয়ে দেয়া যাবে! এই সব নির্যাতনমূলক আইন প্রণয়ন করা হয় মূলত নারীর কথা মাথায় নিয়ে– যা নিশ্চিতভাবে মানবীয় অপরাধ ! রাষ্ট্র নিজেই যখন এ ধরনের অপরাধ করার মধ্যদিয়ে কোটি কোটি শিশু-নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ করে দেয়– তখন সমাজে সাধারণভাবেই অপরাধ বৈধতা ও প্রতিষ্ঠা পায়!

হতাশাজনক ব্যাপার হলেও বাংলাদেশের আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করে কিছু বলা নেই। এতেও প্রমাণিত হয় আমাদের রাষ্ট্র শিশু-স্বার্থের প্রতি কতটা উদাসীন। প্রশ্ন হল, আন্তর্জাতিক আইন ও সনদগুলোতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ থাকলেও একটি স্বাধীন দেশের আইনে কেন তা থাকবে না? আইন থাকলেও যেখানে মানুষ অমান্য করে চলে, সেখানে আইন-ই যদি না-থাকে, তাহলে আমরা কিসের বলে সমাধান চাইব!

শিশু-পাচার আমাদের দেশের আরেকটি বড় সমস্যা। এ সমস্যাটি কতিপয় চক্র দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। কেবল আইন দিয়ে এর সুরাহা সম্ভব নয়– এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ ও সম্পদের পাশাপাশি ব্যাপক সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। দুঃখজনক হল, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের সকল সুবিধা আমরা গ্রহণ করছি বটে কিন্তু সম্ভ্রমহানির ফলে যে-সকল শিশুর জন্ম হয়েছে, তাদেরকে আমরা স্বীকার করি না, তাদের সামাজিক মর্যাদাটুকু দিতে ঘৃণাবোধ করি।

শিশুরা পবিত্র, সুন্দর কিন্তু অসহায়। এই পবিত্রতা ও সৌন্দর্য আমরা যদি রক্ষা করতে চাই, তাহলে শিশুর অসহায়ত্বও দূর করতে হবে আমাদের। সমাজ যে-ব্যাপারে সচেতন হয়, রাষ্ট্র সে-ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বাধ্য। প্রথমেই কাজটি সরকার করে দেয় না– সরকারের ঘাড়ে এসে পড়লে তখনই সে উদ্যোগী হয়। কাজেই শিশু তার মায়া দিয়ে ভরিয়ে তোলে যে বড়দের পৃথিবী, সেই শিশুর সুরক্ষার ভারও বড়দের। শিশুদের নিয়ে যারা নানামুখী অপরাধে লিপ্ত, তাদেরও মনোজগৎকে শিশুর মায়ায় ভরিয়ে তুলতে পারলে, তাদেরকেও সচেতন করে তুলতে পারলে, তবেই সুরক্ষা পাবে শিশুরা, মায়ায় ভরে উঠবে আমাদের দেশ, পুরো পৃথিবী।

'হালখাতা'র 'বাংলাদেশের শিশু সংখ্যা'য় যারা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই সীমাহীন কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা। সবার মঙ্গল হোক।

শওকত হোসেন
প্রধান সম্পাদক, হালখাতা
১৫ মার্চ ২০১৭

সূচি

প্রবন্ধ
শিশু, শিক্ষা ও ভালোবাসা
গালিব আহসান খান ০৮

নিবন্ধ
আমাদের ছেলেবেলায়
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৫

প্রবন্ধ
ইন্টারনেটের কানা-গলি
মুহম্মদ জাফর ইকবাল ২০

প্রবন্ধ
আমাদের শিশুদের খাবারগুলো নিরাপদ হোক
অধ্যাপক আবম ফারুক ২৬
বিষমাখা লিচু ও নিহত শৈশব
পাভেল পার্থ ৫২

প্রবন্ধ
স্বাধীন রাষ্ট্রে ‘বিজয়শিশু’
সাব্বির খান ৬৩

অনুবাদ
ঢাকায় শিশু গৃহভৃত্য
তেরেস ব্লঁশে / সৈয়দ আজিজুল হক ৬৬

নিবন্ধ
শিশু-ভাবনা, শিশুতোষ নয়
জেবউননেছা ৯২

আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম
ফে র দৌ সী সু ল তা না ১০০
শিশু নিয়ে কিছু ভাবনা
আ ব দু ল আ উ য়া ল ১১১
জাদুঘরের গল্প: শিশুদের নিয়ে শিশুদের প্রতি
নী রু শা ম সু ন্না হা র ১১৪
আজকের শিশু আগামী দিনের বাংলাদেশ
মো ফা জ্জ ল শা ম স্ ১১৯

প্র ব ন্ধ
আমাদেরও আছে অধিকার
আ লী ই মা ম ১২১
বাংলাদেশের শিশু ও শিশুদের আইনি অধিকার
জ্যো তি র্ম য় ব ড়ু য়া ১৩৪
শিশু ও জাতির ভবিষ্যৎ এবং রাষ্ট্রের ভাবনা
আ ল ম গী র খা ন ১৩৮

প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশে শিশু-অপুষ্টির ব্যাপকতা
খু র শী দ জা হা ন ১৪৭

প্র ব ন্ধ
শিশুর মন ও মানসিক স্বাস্থ্য
আ হ মে দ হে লা ল ১৫৪

প্র তি ক্রি য়া
নবজাতকদের থাইরয়ড: অভিভাবকদের যা জানা দরকার
সা হি দা আ খ তা র ১৫৯

প্র ব ন্ধ
শিশুর ভাষা অর্জন
গু ল শা ন আ রা ১৬৪

প্র ব ন্ধ
শিশু সাময়িক পত্রিকা
ব দি উ জ্‌জা মা ন ১৭০

প্র ব ন্ধ
শিশুর মানস গঠনে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠাগার
আ ল ম তা লু ক দা র ২২৭

প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশের শিশুনাটকের চর্চা: সংকট ও সম্ভাবনা
তা ন ভী র আ হ মে দ সি ড নী ২৩২

প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র-বাস্তবতা
মো. আ মি নু ল ই স লা ম ২৩৭

শিশু, শিক্ষা ও ভালোবাসা

গা লি ব আ হ সা ন খা ন

আমরা একদিন শিশু ছিলাম, এটা কি আমরা ভুলে গিয়েছি? ভুলিনি। মনে পড়ে সেই কথা, কত আদর-যত্নে আমরা বড় হয়েছি। মায়ের আদর-ভালোবাসা তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল আমাদেরকে। কিন্তু আজ আমরা বড় হয়েছি। আজকে যারা শিশু তাদের জন্যে আমরা দেব ভালোবাসা। জীবনের শেষে এসে এটাই হবে আমাদের আনন্দ। শিশুদের জন্যে একটা সুন্দর জীবন কিভাবে আমরা দিয়ে যেতে পারি তারই কিছু মনের কথা আজ বলব। হঠাৎ এখন মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা, ওটা দিয়েই শুরু করব। কবিতার কথাটা হল,

খোকা মাকে শুধায় ডেকে —
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে —
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোকে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি। ...[১]

এটা সত্য, আমাদের শিশুরা তাদের জন্মের পূর্বে আমাদের মনের মধ্যেই থাকে। জন্মের পর আমরা তাদের ভেঙে-গড়ে তুলি, এই ভাঙা-গড়া কিভাবে আমাদের বাংলাদেশের শিশুদের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে তারই কিছু দিক আমি তুলে ধরব এখানে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে।

এটা সত্য যে, বাস্তবে শিশুরা উপরোক্ত কবিতার শিশুটির মতো প্রশ্ন করে; তাদের মধ্যে এক

ধরনের চিন্তাশীলতাও থাকে। আমাদের মতো তাদের মধ্যেও এক ধরনের ব্যক্তিত্ববোধ থাকে; শিশুরা তাদের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করে, অনেক সময় বড়দের কথা অমান্য করে নিজস্ব চিন্তা-চেতনাও প্রকাশ করে। শিশুদের এই ব্যক্তিত্ববোধকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা আমাদেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে শিশুদের জীবন সুন্দর করে গড়ে তুললে সেটা বাবা-মা হিসেবে আমাদের জন্যে হবে সার্থকতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে হবে কল্যাণকর, কারণ আমাদের শিশুরাই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। এমন দৃষ্টিকোণ থেকেই প্লেটো লিখেছিলেন যে, 'শিশুর জননী আর ধাত্রীর প্রতিও নির্দেশ থাকবে ... তারা যত্নের সাথে শিশুর তুলতুলে শরীরকে যেমন তৈরি করে, তার চেয়েও যত্নের সঙ্গে ... শিক্ষায় শিশুদের নরম মনকে তৈরি করে তুলবে'।[২] প্লেটো এটা লিখেছিলেন আদর্শ রাষ্ট্র বিষয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে। আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের জন্যে জনগণকেও ভালো মানুষ হতে হবে; এবং এটা সম্ভব ভালো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, যে ব্যবস্থা শিশুকাল থেকেই মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করবে। এভাবে আমরা আমাদের সোনার বাংলাকে আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলব।[৩] শিশুদের জন্যে একটা ভালো শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হতে পারে তারই কিছু ধারণা আমি ব্যক্ত করব আমার এ আলোচনায়।

শিশুশিক্ষা বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমেরিকার প্রয়োগবাদী দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানী জন ডিউই (John Dewey 1859-1952)। ডিউই রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে *The School and Society* এবং *The Child and the Curriculum*, যার মধ্য দিয়ে তিনি স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে মতাদর্শ গড়ে তোলেন। এসব মতাদর্শের প্রয়োগমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি একটি ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন যা পরবর্তীতে ডিউই স্কুল নামে খ্যাতি অর্জন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা ল্যাবরেটরি স্কুল বলতে যা বুঝি, তা ডিউই'র ল্যাবরেটরি স্কুলেরই প্রতিরূপ। এটাও উল্লেখ্য যে, শিক্ষা বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন চীন, জাপান, রাশিয়া ও তুরস্কে।[৪] শিশুশিক্ষা বিষয়ে ডিউই'র মতাদর্শ এখানে আমি তুলে ধরব।

শিশুশিক্ষা বিষয়ে ডিউই'র মতাদর্শের মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। প্রথমটি হল, শিশুশিক্ষা বিষয়ে সে সময়ে প্রচলিত দুটো মতাদর্শকে তিনি বর্জন করেন। দ্বিতীয়টি হল, এ বিষয়ে ডিউই নিজস্ব একটি মতাদর্শ গড়ে তোলেন। প্রথম যে মতাদর্শটি ডিউই বর্জন করেন সে মতাদর্শ অনুযায়ী শিশুরা হল নিস্পৃহ প্রকৃতির জীবনের অধিকারী এবং তথ্য ও জ্ঞানকে তাদের ওপর আরোপ (impose) করা হয়। এ মতাদর্শকে বর্জন করা যুক্তিসঙ্গত এ কারণে যে, শিশুরা স্বভাবতই নিস্পৃহ প্রকৃতির নয়, তাদের মধ্যে যে সক্রিয় প্রাণপ্রভা থাকে তা উপরোক্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাকে আরোপ করা হয় না, শিক্ষাকে দেয়া হয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাকে যদি আরোপ করা যেত তাহলে সবাইকেই শিক্ষিত করা যেত। দ্বিতীয় যে মতাদর্শটি ডিউই বর্জন করেন তা সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে নব্য শিক্ষা (New Education) নামে পরিচিত ছিল।

এই মতাদর্শ অনুযায়ী শিশুদের মানসিক প্রবণতাকে এবং শিশুরা কী শিখতে চায় সেটাকে প্রাধান্য দেয়া হত। মনোবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে ডিউই এ মতাদর্শকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন, কারণ শিশুদের মন-মানসিকতা অভিজ্ঞতার দিক থেকে অপরিণত থাকে এবং কী তারা শিখবে সে বিষয়ে তাদের পক্ষে সঠিক চিন্তা করা সম্ভব হবে না। এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে ডিউই বলেন যে, শিক্ষা হল, অথবা হওয়া উচিত, অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণের (reconstruction) চলমান ধারা যার মধ্য দিয়ে অপরিপক্ক অভিজ্ঞতা এগিয়ে যাবে সেই অভিজ্ঞতার দিকে যা দক্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তির অভ্যাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৫]

ডিউই'র এ মতাদর্শ পরবর্তীতে এমন গুরুত্ব লাভ করে যে, সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্লোগান "Learn by Doing" গড়ে ওঠে। "Learn by Doing"-এর অর্থ এটা নয় যে, শিক্ষা একটি বুদ্ধিবৃত্তি-পরিপন্থী বিষয় এবং এ কারণে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নয় বরং কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এ স্লোগানের উদ্দেশ্য ছিল এটা তুলে ধরা যে, একজন শিশু প্রকৃতিগতভাবেই একজন সক্রিয়, কৌতূহলী এবং নতুন কিছু জানার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সত্তা। ডিউই মনে করেন যে, এ কারণে যথার্থ অর্থের শিক্ষাব্যবস্থাকে শিশুসত্তার এসব সক্রিয় দিকের প্রতি মনোযোগী হতে হবে এবং সেভাবেই শিশুকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। এমন ব্যবস্থায় একজন শিশুর মধ্যে সৃজনশীল বিকাশ ঘটবে। এ প্রসঙ্গে ডিউই এটাও মনে করেন যে, একটি শিশুসত্তা এমন নয় যে, সে সত্তাকে যেমন ইচ্ছে তেমন রূপই দেয়া যাবে বা এমনও নয় যে, তা পূর্ণভাবেই স্থির এবং পূর্বনির্ধারিত। শিশুসত্তার প্রকৃত এই রূপের কারণেই কেবল তা সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করতে পারবে। এমন সৃজনশীল বিকাশের মধ্য দিয়েই শিক্ষামূলক অভ্যাস গঠন হয় এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। এভাবেই শিশুর নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে। ডিউই মনে করেন যে, শিশুকে সদগুণ শিক্ষা দেয়া হয় শিশুর উপর তা আরোপ করে নয় বরং অভ্যাস গঠনের কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়াগুলো হল, ন্যায়বোধসম্পন্ন মানসিকতা, চিন্তাশীলতা, বস্তুনিষ্ঠতা, নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মনকে পরিবর্তন করার সাহস বজায় রাখা।[৬] ডিউই তাঁর এই মতাদর্শকে বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তা এখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ডিউই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরি স্কুলে শিক্ষাব্যবস্থাকে কেবল শ্রেণিকক্ষের মধ্যে বইভিত্তিক শিক্ষাদান এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে একইসাথে কিছু ব্যবহারিক কাজের মধ্যেও বিস্তৃত করেছিলেন। স্কুলে শিক্ষার্থীদেরকে শণ, তুলা এবং পশমের সুতা দেওয়া হত; এসব থেকে কিভাবে বুননের কাজ করা যেতে পারে, কাপড় তৈরি করা যেতে পারে, এসব বিষয়ের ব্যবহারিক শিক্ষা শিক্ষার্থীগণ লাভ করত। এ ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ শৃঙ্খলা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন করতে পারত। এ ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষায় যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তা ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মনে করা হত। ডিউই মনে করেছিলেন যে, স্কুল একটি ছোট আকারের

সমাজের মতো হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে ডিউই'র এমন চিন্তাধারায় গণতান্ত্রিক একটা চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল। এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ডিউই এমনও মনে করেছিলেন যে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ব্যক্তি-মানুষের অভ্যাস সমাজের সমষ্টিগত ধারার সাথে মিলে চলবে, যে সমষ্টিগত ধারা থেকে সমাজের প্রচলিত প্রথা বা কনভেনশন গড়ে ওঠে।[৭] ডিউই এখানে সমষ্টিগত মূল্যবোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে।

ল্যাবরেটরি স্কুল বিষয়ে ডিউই'র মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীগণের মধ্যে শ্রম, শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অভ্যাস গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে ভালো নাগরিক তৈরি করা। বাংলাদেশে ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরাও এমন উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এখানে আমার মত হল যে, এই কার্যক্রমকে আমরা যেন আগামী দিনগুলোতে আরো প্রসারিত করতে পারি। ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা এবং পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের অভ্যাস গঠনের মধ্য দিয়ে একটি ভালো সমাজ গঠনে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এটাই হবে কাম্য।

শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার উপরোক্ত কাঠামোর সাথে আরো একটি বিশেষ দিক যুক্ত করতে হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুরা যেমন অধ্যবসায়ী, সুশৃঙ্খল ও পারস্পরিকভাবে সহযোগী হবে, তেমনি নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধও শিশুশিক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে তুলতে হবে। এটা যদি শিশুকালে না হয় তাহলে পরবর্তীতে এমন হবার সম্ভাবনা থাকবে অতি সীমিত। কারণ, শিশুকালই হচ্ছে মানুষের জীবন গঠনের মূল ভিত্তি। শিশুকালে যদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টিতে ভুগে দুর্বল শরীর নিয়ে গড়ে ওঠে তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব সারাজীবনই তাকে ভোগ করতে হবে। শিশুকালে শারীরিক গঠনের সাথে মস্তিষ্কের গঠনও একইভাবে গড়ে ওঠে। আমাদের মন-মানসিকতা যেহেতু মস্তিষ্ক দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়, শিশুকালেই ভালো মানুষ হবার নৈতিক আদর্শ মস্তিষ্কে অর্থাৎ চিন্তা-চেতনায় ধারণ করতে হবে। মস্তিষ্ক গঠনের পূর্ণতা আসার পর নতুন পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে সীমিত। এটা এভাবেই যে, শিশুকালে যে কথা বলা শিখতে পারে না, পরবর্তীতে সারাজীবনই সে বাকপ্রতিবন্ধী থাকে। এ বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করব মাদ্রাসাশিক্ষার দিকটি। মাদ্রাসাশিক্ষার শিশুদেরকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়, সেই শিশুরা পরবর্তীতে সারাজীবন সেভাবেই জীবন ধারণ করে। এভাবেই, আদব-কায়দা, রুচি-সংস্কৃতি, সভ্যতাবোধ — এগুলোও এক ধরনের মৌলিক শিক্ষা এবং শিশুকালেই এসবের সূচনা হয় ও ভিত্তি গড়ে ওঠে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলব যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে এবং এভাবে শিক্ষার কারিকুলাম তৈরি করতে হবে। এটা আশাবাদী দিক যে, বাংলাদেশে বর্তমানে স্কুলশিক্ষা পর্যায়ে "ধর্ম ও নৈতিকতা" বিষয়ক কোর্স চালু করা হয়েছে। কিন্তু এটা আরো জোরালো হবে যদি নৈতিক শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়। একাত্তরে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে জেনে এসেছি যে, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এটাও একটি আশাবাদী দিক। আমি মনে করি, ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতার মূল কথাটা হতে হবে যে, যার

ধর্ম যেটাই হোক না কেন, সবাইকেই নৈতিক হতে হবে। দর্শনের নৈতিক শিক্ষামূলক কিছু ক্লাসিক মতাদর্শ রয়েছে যা যেকোনো ধর্মের মানুষই গ্রহণ করতে পারবেন। যেমন, ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন যে, কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে কর্তব্য করাই হবে নৈতিকতা।[৮] এমন নৈতিক মতাদর্শকে নির্বিশেষে যেকোনো মানুষই গ্রহণ করতে পারবেন; কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে কর্তব্য করতে পারবেন না কেবল তারা, যারা অনৈতিক প্রকৃতির। ধর্মনিরপেক্ষভাবে, অর্থাৎ নির্বিশেষে, সবাই গ্রহণ করতে পারবেন এমন আরো একটি ক্লাসিক নৈতিক মতাদর্শ হল জন স্টুয়ার্ট মিল-এর সুখবাদ। মিল মনে করেন যে, ভালো গুণগত মানের সুখ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এমন কাজটি করাই হবে নৈতিকতা।[৯] প্রতিটি মানুষই সুখী জীবনের অধিকারী হতে চাইবেন — ভালো গুণগত মানের সুখের ক্ষেত্রে এ মতের বিরোধিতা করার কিছু নেই; ধর্মনিরপেক্ষভাবে নির্বিশেষে সবার জন্যেই এটা ভালো হবে। নৈতিকতার এমন ক্লাসিক মতাদর্শ নিয়ে, যেমন কর্তব্যের ধারণা এবং সুখের ধারণা নিয়ে, মতভিন্নতা ও বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু এটা এ কারণে নয় যে এসব মতাদর্শে ত্রুটি আছে, বরং এ কারণে যে বিশ্বের সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রেই মতাদর্শ স্থান ও সময়ের সাথে আপেক্ষিক হয়। আপেক্ষিকতার ভিন্নতা কোনো ত্রুটি নয়, বরং বৈচিত্র্য। এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন যে, final truth belongs to heaven,[১০] অর্থাৎ পরম সত্য স্বর্গে থাকে, এ জগতে নয়। রাসেলের মতটি সত্য এবং উপরোক্ত ক্লাসিক নৈতিক মতাদর্শগুলোকে চূড়ান্ত নয় বলে সমালোচনা করা যাবে না। এমতাবস্থায় শিশুশিক্ষার কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে নির্বিশেষে সবার জন্যে গ্রহণযোগ্য নৈতিক শিক্ষা। এর জন্য আবশ্যক হবে সহজভাবে সরল ভাষায় লিখিত নৈতিক শিক্ষামূলক গ্রন্থ, শিশুরা যেন সহজে সেটা বুঝতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা যেমন থাকবে, পরিবার ব্যবস্থায়ও তেমন নৈতিক শিক্ষা থাকতে হবে। প্রতিটি শিশুই একটি পরিবারের একজন। পরিবারের অভিভাবক যারা, শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের মা এবং বাবা, তারাও শিশুদের নৈতিক শিক্ষা, অর্থাৎ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেবেন। শিশুরা শিখবে কোনটা ভালো এবং কোনটা উচিত; এভাবে তারা শিখবে কী তারা করতে পারে এবং কী তারা করতে পারবে না। এভাবে শিশুদের শিক্ষাজীবনের প্লে-গ্রুপের পর্যায় থেকে দৈহিক ও মানসিকভাবে গড়ে ওঠার সময়ে তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনা ও আচরণগত অভ্যাস গড়ে উঠবে, তারা আদব-কায়দা, শোভনতা, শিষ্টাচার শিখবে। পারিবারিক এই শিক্ষা হবে প্রশিক্ষণমূলক।

এখানে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যে একটা পার্থক্যও করতে হবে। শিশুকালে শিক্ষা শুরু হয় প্রশিক্ষণ দিয়ে। যেমন, শিশুদেরকে প্রথম যখন গণনা করতে শেখানো হয় তখন সেটা হয় ব্যবহারিক ও দৈহিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। প্রথম যখন এক, দুই, তিন, চার, এমন গণনা শেখানো হয় তখন কোনো একটি বস্তুকে, যেমন একটি কলম দেখিয়ে এক, এবং দুটো কলম দেখিয়ে দুই, এরপর তিনটা কলম দেখিয়ে তিন বুঝানো হয়। এই প্রক্রিয়াটি দৈহিক,

অভিজ্ঞতামূলক এবং ব্যবহারিক। এই প্রক্রিয়াকে বার বার অনুশীলন করে গণনার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং গণনা শেখা হয়। এই ধরনের শিক্ষা হল প্রশিক্ষণমূলক। কিন্তু স্কুলে একটা পর্যায়ে শিশুরা যখন শেখে যে $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, তখন সেটা শেখা হয় চিন্তামূলক অনুশীলন দিয়ে, যা দৈহিক বা ব্যবহারিক নয়। চিন্তামূলক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়; দৈহিক আচরণগত অভ্যাস গঠনের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করা যায়। শিশুকালে যে নৈতিক শিক্ষা শিশুরা গ্রহণ করবে পারিবারিক পরিবেশ থেকে সেটা হবে নৈতিক প্রশিক্ষণ।

লক্ষণীয় যে, পারিবারিক পরিবেশে যারা নৈতিক প্রশিক্ষণ দেবেন, তাদেরকেও নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে জানতে হবে। কারণ, যিনি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেবেন তার নিজের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষার্থী শিশুদের অভিভাবকদের এসব বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে; শিক্ষাবর্ষে অন্তত দু'বার এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের যৌথ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা এ বিষয়ে সহায়ক হবে।

অভিভাবকদের ভুলের কারণে শিশুদের যে বড় মাপের ক্ষতি হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। দৃষ্টান্তটি হল,

> একজন ছাত্র স্কুলে পরীক্ষায় ভালো করেনি। ছাত্রটির ওপর তার বাবা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এক পর্যায়ে বাবা রেগে ছেলেকে বললেন, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, যেভাবেই হোক তোমাকে পরীক্ষায় ভালো করতেই হবে'। ছেলেটি ভাবতে শুরু করল, যেভাবেই হোক তাকে পরীক্ষায় ভালো করতেই হবে। ছেলেটি ভাবতে থাকে, যেভাবেই হোক, তাহলে কিভাবে? ছেলেটি বন্ধুদের সহায়তা নিতে শুরু করল। বই পড়তে যেয়ে কিছু বুঝতে না পারলে বন্ধুদের সহায়তা নিল। প্রশ্নের উত্তর কিভাবে লিখবে, সেখানে বন্ধুদের পরামর্শ নিল। এমন সহায়তা নিতে নিতে এক পর্যায়ে ছেলেটি পরীক্ষার হলে বন্ধুর সহায়তা নিল; বন্ধুর উত্তরপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখে [অর্থাৎ নকল করে] তার উত্তর লিখল।[১১]

শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় এ ধরনের সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে আবশ্যক দর্শনেরই একটি ভূমিকা। দর্শনের মূল তিনটি শাখা হল, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যা। শিশুশিক্ষায় নীতিবিদ্যার ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। শিশুশিক্ষায় অধিবিদ্যার কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যুক্তিবিদ্যার। আমরা যদি যৌক্তিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে উপরোক্ত 'যেভাবেই হোক' কথাটি থেকে যে সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখেছি তেমনটি হবে না। 'যেভাবেই হোক' কথাটির অর্থ 'ভালোভাবে' হতে পারে, অথবা 'খারাপভাবে' হতে পারে। 'যেভাবেই হোক' কথাটির অর্থ এখানে অস্পষ্ট। ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা না করে শিশুদের সাথে কথা বলা অভিভাবকদের জন্যে ঠিক নয়। শিশুরা এমন ভুল যেন না শেখে সেজন্যে বিচারমূলক চিন্তা শিক্ষার দিকটি শিশুশিক্ষার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিচারমূলক চিন্তা যেহেতু যুক্তির গঠন, ধরন এবং প্রয়োগের সাথে যুক্ত,

তাই দর্শনের শাখা যুক্তিবিদ্যাকে শিশুশিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর জন্যেও আবশ্যক হবে সহজভাবে সরল ভাষায় বিচারমূলক চিন্তা বিকাশের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করা।

আমার এ মতের পক্ষে আমি বলব যে, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশেও বর্তমানে শিশুদের জন্যে দর্শন শিক্ষাকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দর্শন থেকেই শিশুরা শিখবে ভালো মানুষ হবার ভিত্তি নৈতিক আচরণ এবং বিচারমূলক যৌক্তিক চিন্তা। বিচারমূলকভাবে যুক্তিভিত্তিক চিন্তা করতে না শিখলে ভালো মানুষ হওয়া যাবে না। শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখেই যুক্তরাষ্ট্রে University of Washington-এ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে Center for Philosophy for Children[১৯]। এভাবেই কানাডার University of Alberta-তে Faculty of Arts-এ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে Philosophy for Children Alberta[২০]। এটাও উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং কানাডায় শিশুদেরকে দর্শন শেখানোর জন্যে ইংরেজিতে শিশুদের জন্য উপযোগী করে অনেক বইও প্রকাশ করা হয়েছে। একটি বইয়ের শিরোনাম আমি এখানে উল্লেখ করব। বইটি হল *Philosophy for Kids*।[২৪]

আমার উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলব যে, শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে দর্শন একটি অপরিহার্য বিষয়। দর্শনকে অনেকে অবমূল্যায়ন করেন এ বিষয়ে সঠিকভাবে সবকিছু না বুঝে এবং জ্ঞানের সর্বশেষ বিকাশের দিকগুলো সঠিকভাবে না জেনে। এটাই আমার শেষ কথা যে, এসব ভুলকে পেছনে রেখে আমরা এগিয়ে যাব মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা থেকে সোনার বাংলাকে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে গড়ে তোলার দিকে।*

তথ্যপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "জন্মকথা", *শিশু*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, কলিকাতা : বিশ্বভারতী, মাঘ ১৩৭৭, পৃ. ৭।

২. সরদার ফজলুল করিম, অনূদিত, *প্লেটোর রিপাবলিক*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২, পৃ. ১১১।

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য, গালিব আহসান খান, *আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২।

৪. দ্রষ্টব্য, Wright, W. K., *A History of Modern Philosophy*, New York: Macmillan, 1967, p. 535.

৫. Edwards, P., ed., *The Encyclopedia of Philosophy*, New York: Macmillan and The Free Press, 1967, vol. 2, p. 384.

৬. দ্রষ্টব্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৪।

৭. Wright, W. K., *op. cit.*, p. 536-38.

৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রাশিদা আখতার খানম, *নীতিবিদ্যা : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬, অধ্যায় ৩।

৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায় ৪ ।
১০. Russell, B., *An Outline of Philosophy*, London: George Allen and Unwin, 1927, p. 3.
১১. গালিব আহসান খান, *আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৭১ ।
১২. দ্রষ্টব্য, http://depts.washington.edu/nwcenter/
১৩. দ্রষ্টব্য, http://p4c.ualberta.ca/
১৪. White, D. A., *Philosophy for Kids*, Waco, Texas: Prufrock Press, 2001.

[লেখক: অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত, গবেষণা কর্মের জন্যে, ইউজিসি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।]

নি ব ন্ধ

আমাদের ছেলেবেলায়

আ ব দু ল্লা হ আ বু সা য়ী দ

আমাদের ছেলেবেলায় প্রায় প্রতিটা বাপই ছিল এক-একটা হারাধন । ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল অনেক—কারও সাত, কারও দশ, কারও পনেরো—যা শুনে একালের ছেলেমেয়ের দল চোখ আকাশে তুলে চাঁদ দেখার চেষ্টা করে । বাড়িতে এত ছেলেমেয়ে থাকার ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে । এর দুটো ভালো দিক নিয়ে প্রথমে কথা বলব । প্রথমত এত ছেলেমেয়ের ভালো-মন্দকে

আলাদা আলাদাভাবে দেখভাল করা কোনো বাবা-মায়ের পক্ষে সম্ভব হত না বলে এবং প্রতিটি ছেলেমেয়ের সবরকম চাহিদা- আবদার মেটানোও সাধ্যের বাইরে ছিল বলে ছেলেমেয়েরা পরিবার থেকে পাওয়া প্রাপ্তিটুকুকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে শিখত। এতে তাদের কূপম-ুকতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা যেমন কমে আসত তেমনি বেড়ে যেত সবাইকে দিয়ে-থুয়ে সবার সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা। যেহেতু তারা জানত মিলিত ভাগবাঁটোয়ারার ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকার ওপরেই নির্ভর করছে তাদের টিকে-থাকা, তাই ছোট স্বার্থ ছোট প্রাপ্তি নিয়ে টানাটানি কাড়াকাড়ি করার প্রবণতা এমনিতেই কমে আসত। ফলে তারা বেড়ে উঠত অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ছেলেমেয়ে হিসেবে। আমাদের বাসায় আমরা ছিলাম এগারো ভাইবোন। আমাদের বাসায় যখন কোনো বড়সড় পাকা পেঁপে আসত তখন আমরা জানতাম সে পেঁপে যত সোনালি সুপরিপক্ব আর বড় আকারেরই হোক, ওই পেঁপের নির্দিষ্ট সাইজের একটা ছোট টুকরাই কেবল আমার জন্যে বরাদ্দ। অন্যায় আবদারে চোখের পানি নাকের পানি একাকার করে ফেললেও ওই সাইজের একটুকুও বেশি-কম করা যাবে না। এর ফলে প্রতিটা মানুষ ছেলেবেলাতেই এই জগতে নিজের অবস্থান বা অধিকার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিতে পারত, পৃথিবীর সবকিছুর ওপর অযৌক্তিক দাবি আর অত্যাচার চালিয়ে সবাইকে উপদ্রুত করে তুলত না।

এ তো গেল-ছেলেমেয়েদের উপকারের দিক। কিন্তু কেবল ছেলেমেয়ে নয়, এই অবস্থাটা বাপ-মাকেও কিছু বাড়তি সুবিধা দিত। ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি থাকত বলে তাঁদের বিপুল বাৎসল্য স্নেহকে অনেকের মধ্যে ভাগবাঁটায়ারা করে বেঁচে থাকা সম্ভব হত তাঁদের পক্ষে। এতে তাঁদের মন সুস্থ, উৎকণ্ঠাহীন, প্রশান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে থাকার সুযোগ পেত। ফলে সন্তানদের দুর্ভাগ্যকে তাঁরা যেমন একালের বাপ-মাদের তুলনায় অনেক সহজভাবে মেনে নিতে পারতেন তেমনি পারিবারিক সৌভাগ্যগুলোও অনেক সুস্থিরভাবে উপভোগ করতে পারতেন। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই ছিল প্রকৃতির রীতি। এই নিয়মের আওতাতেই মানুষের জীবন আবর্তিত হয়েছে।

আজ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ষাটের দশকে এদেশে বড়সড়ভাবে পরিবার পরিকল্পনা চালু হবার পর আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোয় সন্তানসংখ্যা বিপুলভাবে কমে যেতে শুরু করে। ছেলেমেয়ের সংখ্যা সাত-আট থেকে এসে দাঁড়ায় এক থেকে দুইয়ে। এটা ঠিক যে, বিশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষের মৃত্যুহার অসম্ভবরকম কমে যাওয়ায় যে জনসংখ্যা-সমস্যা তৈরি হয়েছিল তা মোকাবেলা করার জন্যে মানুষকে, অনেকটা উপায়হীন হয়েই, পরিবার পরিকল্পনার সাহায্য নিতে হয়; কিন্তু এর খেসারতও মানুষকে কম দিতে হয়নি। এর ফলে সারা পৃথিবীজুড়ে মানুষের জগৎ যেমন বহুরকম সামাজিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে তেমনি (বিশেষ করে নারীদের) যে-পরিমাণ দুরারোগ্য ও জটিল রোগের শিকার হতে হচ্ছে তার পরিমাণও কম নয়।

ব্যাপক পরিবার পরিকল্পনার ফলে আজ মানুষের সন্তানসংখ্যা বিপুলভাবে কমে গেছে। আগেই বলেছি পাঁচ-সাত-দশ বা পনেরোর জায়গায় আজ মানুষের সন্তানসংখ্যা এসে ঠেকেছে দুই বা

এক-এ। কাজেই পাঁচ-সাত-দশ বা পনেরো জন সন্তানের জন্যে পিতামাতার হৃদয় থেকে যে-বাৎসল্যরস উৎসারিত হত তা আজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুজন বা একজনের মধ্যে। ফলে আগের দিনের পিতামাতারা যেভাবে তাঁদের স্নেহকে অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়ে সুস্থ ও ভারসাম্যময় মন-মানসিকতা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন, আজকের পিতামাতারা আর তা পারছেন না। একজন বা দুজন সন্তানের মধ্যে স্নেহ সুতীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়ায় তা পিতামাতার মনে তাদের ব্যাপারে তীব্র আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। হারিয়ে ফেলার ভয়ে তারা অনুক্ষণ অসুস্থ হয়ে থাকছে। কৃপণের মতো, স্বার্থপরের মতো তারা তাদেরকে নিজেদের বুকের ছোট কুঠুরির ভেতর অসহায়ের মতো আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। তীব্র স্নেহ থেকে জন্ম-নেওয়া এই তীব্র আতঙ্ক সন্তানের ওপর নেমে আসছে তীব্র অত্যাচারের রূপ নিয়ে। সন্তানের সামনে তারা দেখা দিয়েছে ভয়াবহ স্বৈরাচারীর চেহারায়। পুরোপুরি নিজেদের স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার আলোকে তারা তাদের সন্তানদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে তারা আপসহীন ও নির্মম। এর এতটুকু এদিক-ওদিক হলে তাকে তারা সন্তানের জন্যে ক্ষতিকর ভেবে শিউরে উঠছে। সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে পুরো জিম্মি হয়ে গেছে। তারা বেড়ে উঠছে তাদের বাপ-মায়ের চাওয়া-পাওয়ার আজ্ঞাবাহী পুতুল হিসেবে।

আমাদের ছেলেবেলায় পাঁচ-সাত-দশ কি পনেরো জন গতানুগতিক ছেলেমেয়ের সংসারে এক-আধজন প্রতিভাবান বা বিদ্রোহী সন্তান যে দেখা দিত না তা নয়। প্রায়শই সন্তানদের ভেতর থেকে এক-আধজন বাপ-মায়ের জাপিয়ে দেওয়া বিধানকে অস্বীকার করে নিজেদের পথে এগিয়ে যেতে চাইত। কিন্তু তাদের রসাতলে যাবার দুর্ভাবনাকে আজকের বাবা-মায়ের মতো তারা পুরোপুরি নির্দয়-হাতে দমন করে দিত না। হয়তো ওই বিরাট সংসারের ভাবে ক্লান্ত থাকত বলেই তাদের সে-শক্তি থাকত না। তা ছাড়া তারা ধরেই নিত যে এতগুলো সুবোধ আর অনুগত সন্তানের মধ্যে এমনি দু-একটা সৃষ্টিছাড়া, বেয়াড়া বা উদ্ভট সন্তান থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। ফলে প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কারও কারও পক্ষে সেকালে পরিবারের আক্রমণ এড়িয়ে নিজের স্ব-স্বভাবী প্রতিভা নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হত।

আজ বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তের বাইরে পা ফেলার কোনো শক্তিই প্রায় সন্তানের নেই। পিতামাতার সিদ্ধান্তই আজ তার একমাত্র ভবিতব্য ও অনিবার্য নিয়তি। তার ওপর পিতামাতার কর্তৃত্ব প্রায় নিরঙ্কুশ। পিতামাতারা যদি সবাই বিবেচক, বিজ্ঞ, প্রতিভাবান ও মেধাবী হতেন তা হলে এ নিয়ে কোনো সমস্যা হত না। কিন্তু সাধারণ অভিভাবকেরা মোটামুটিভাবে গড়পড়তা সাধারণ মানুষ। তাদের স্বপ্নের দিগন্ত নেহাতই সাদামাটা। সব পিতামাতার মতো তারা তাদের একটি বা দুটি সন্তানকে, তাদের বুকের ধন মানিককে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি করে তুলতে চান। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুব স্পষ্ট বা সুচিন্তিত নয়। প্লেটো বা আইনস্টাইন তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ নয়। এঁদের তারা চেনে না। তাদের জানামতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তারা তাদের সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার করে তুলতে চায়। এই লক্ষ্যে জীবন বাজি রেখে

তারা কাজ করে। এই পথে কোথাও বিন্দুমাত্র কাঁটা দেখা দিলে তারা তাকে নির্মূল করে ফেলতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। এর জন্যে দরকারে ভিন্নস্বভাবী সন্তানের স্বপ্ন ও আনন্দের পৃথিবীকেও পায়ের তলায় দলে পিষ্ট করে দিতেও তাদের এতটুকু আপত্তি নেই। এইসব গড়পড়তা বাপ-মায়ের হাতে সাধারণ বা গতানুগতিক ছেলেমেয়েদের খুব একটা ক্ষতি হয় না। তাদের ভেতর অনন্য কিছু থাকে না বলেই ক্ষতি হয় না। কিন্তু ক্ষতি হয়ে যায় প্রতিভাবান ও মেধাবী ছেলেমেয়েদের। বাপ-মায়ের মেধাহীন স্বপ্নের নির্দয় শিকার হয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্বের ধার সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যায়, তারা গতানুগতিক সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, বা ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়াশোনা করে ভালো আয়ের চাকরিবাকরি করতে হলে যা দরকার তা হল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরদিন থেকেই ভালো ছাত্র হওয়ার চেষ্টা শুরু করা। আজ আমাদের দেশে ভালো ছাত্র হবার উপায় একটাই : পাঠ্যপুস্তকসর্বস্ব লেখাপড়া আর বিপুল নোট উদরস্থ করে যেতে পারা। আমাদের অভিভাবকেরাও সন্তানের জীবন বলতে আজ শুধুমাত্র এই কাজটুকুই বোঝেন। এর বাইরে আর সবকিছুই তার জন্যে নিষিদ্ধ। তার জীবন কাটে এক শ্বাসরুদ্ধকর দুঃসহ বন্দিত্বের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অসুস্থ অমলের মতো। তাকে বাইতে যেতে দেওয়া হয় না। বিকেলের অনাবিল খেলাধুলার আনন্দ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনবিকাশের সুযোগ থেকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করা হয়। অথচ এ সবই করা হয় তার ভবিষ্যৎ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের কথা ভেবে। বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কিছু মুহূর্ত কাটাবার অবকাশ, দুটো সুন্দর আনন্দময় কল্পনাসমৃদ্ধ বই পড়ার সুযোগ, ইচ্ছাখেয়ালে কোনো অপরিচিত রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ-খুশিতে বেড়িয়ে পড়ার বিলাস—এসব কোনোকিছুই তার জীবনে নেই। তার জীবনের প্রতিটি দিন শুরু হয় স্কুলে সবার ঊর্ধ্বশ্বাস গলদঘর্ম ব্যস্ততায়। কোনোরকমে নাকেমুখে কিছু গুঁজে স্কুলের দিকে ছুট দেয় সে। স্কুলে শেষ করে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে যখন সে ফিরে আসে তখন পৃথিবীর ওপর বিকেলের ছায়া নেমে এসেছে। এই সময় তার কচি শরীর অল্পকিছু বিশ্রাম চায়। কিন্তু অভিভাবকদের কঠোর নিষেধের কারণে সে-সুযোগ তার মেলে না। বিশ্রাম করবে? জীবনকে অপচয় করলে ভালো বা সমৃদ্ধ জীবন কী করে মিলবে তার ভবিষ্যতে! মুখে কোনোমতে দুটো গুঁজে দিয়ে আবার তাকে ছুটতে হয় একই লেখাপড়ার ধান্ধায়। তবে এবার আর স্কুলে নয়, প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে। এক প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি থেকে আর-এক প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কৈশোরের মনোরম বিকেল আর সন্ধ্যাগুলোকে পিষ্ট করতে করতে পিঠের ওপর ভবিষ্যৎ-জীবনের বোঝা নিয়ে পরিশ্রান্ত শরীরে সে ছুটতে থাকে। সন্ধ্যার কিছুটা পরে যখন সে ফিরে আসে তখন সে ক্লান্ত এবং নিঃশেষিত। এর পরেও দিনের লেখাপড়ার ঘানি টানা তার শেষ হয় না। রাত্রের খাবারের পর পরের দিনের হোমওয়ার্ক শেষ করে তবে তার মুক্তি।

যে-বয়সে সন্ধ্যার আকাশের একটি-দুটি তারার মতো জীবনের আকাঙ্ক্ষারা একটু একটু করে ফুটে উঠতে থাকে, জীবনের সুকুমার স্বপ্নেরা থরে-থরে স্তবকে-স্তবকে বিকশিত হতে থাকে, সেই বয়সটাকে যদি শুধু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ আর প্রাইভেট টিউটরের দুয়ারে দুয়ারে এভাবে নিষ্পিষ্ট করে ফেলা হয় তবে সেই সন্তান তো উপভোগ-শক্তিবর্জিত একটা মূঢ়, অকর্ষিত ও অবিকশিত মানুষ হিসেবে রয়ে গেল। জীবনের আনন্দময় আস্বাদনের সুকুমার অলীক অনুভূতিগুলোই তো তার জীবনে পাতা মেলল না। যদি ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ জীবন তার দরজায় এসে দাঁড়াবে তখন তাদের অভ্যর্থনা জানাবে সে কী দিয়ে? প্রেমের আনন্দের দ্বিধা-থরোথরো মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে সে করবেটা কী? গোবিন্দ দাসের কবিতায় আছে :

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।

অঙ্কুর যদি (গ্রীষ্মের খরায়) সূর্যের তাপেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবে (পরে) বর্ষার মেঘ এসে কী করবে। কচি অপরিণত কিশোর-হৃদয়ের ওপর এই দুর্বিষহ নিগ্রহ, কেবলমাত্র পাঠ্যসর্বস্ব নোটসর্বস্ব মুখস্থচর্চার এই আনন্দহীন কালো অত্যাচার শিশুর জীবনকে যদি উন্মোচিতই হতে না দিল, এইসব কষ্টে শেষপর্যন্ত কী লাভ হবে তার? তাছাড়া জীবনের অপার্থিব খুশির আনন্দে যে-কিশোর বা তরুণ পাগলা ঘোড়ার মতো আদিগন্ত মাঠ ছুটে পেরিয়ে যায়নি, খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে দুহাতে ছিঁড়ে হিংস্র আনন্দে উচ্চকিত হয়নি, গাছের মগডালে উঠে আকাশকে বুকের ভেতর ডাক দেয়নি, বড় জীবনকে সে কীভাবে আস্বাদ করবে? সত্যিকার বড়কিছু করাই-বা কী করে সম্ভব তার পক্ষে?

উৎস: গ্রন্থ: নিষ্ফলা মাঠের কৃষক।

[লেখক: সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। সম্পাদক, ষাটের দশকের প্রভাববিস্তারী ছোটকাগজ 'কণ্ঠস্বর'।]

ইন্টারনেটের কানা-গলি

মু হ ম্ম দ জা ফ র ই ক বা ল

প্রায় বিশ বছর আগে আমি যখন প্রথমবার দেশে ফিরে এসেছিলাম তখন যে বিষয়গুলো নিয়ে ধাক্কা খেয়েছিলাম তার একটি ছিল টেলিফোন। আমেরিকায় সবার বাসায় টেলিফোন এবং সেই টেলিফোন নিখুঁতভাবে কাজ করে, আমাদের দেশে টেলিফোন বলতে গেলে কোথাও নেই, আর যদিও বা থাকে সেগুলো কখনোই ঠিকভাবে কাজ করে না। তারপরও যার বাসায় টেলিফোন আছে তাদের অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। তবে তার একটা যন্ত্রণাও আছে, আশেপাশের সব বাসা থেকে লোকজন টেলিফোন করতে চলে আসে। যারা একটু ছোটলোক ধরনের মানুষ তারা টেলিফোনের ডায়ালের অংশটুকুতে তালা মেরে রাখত, টেলিফোন রিসিভ করা যেত কিন্তু টেলিফোন করা যেত না। শুধু যে টেলিফোন ছিল না তা নয়, মনে হয় টেলিফোনের তারও ছিল না কারণ একই টেলিফোনের তার দিয়ে একাধিক মানুষ কথা বলত এবং তার নাম ছিল "ক্রস কানেকশন।" প্রায়ই টেলিফোন করতে গিয়ে আবিষ্কার করতাম ইতোমধ্যে সেই টেলিফোনে অন্য কেউ কথা বলছে। তখন অনুরোধ করা হত, "ভাই, আপনারা টেলিফোনটা একটু রাখেন, আমরা একটু কথা বলি।" অবধারিতভাবে অন্য দুইজন বলত, "আপনারা রাখেন, আমরা কথা বলি।" ঝগড়াঝাটি মান-অভিমান সবই হত।

শুধু যে বাসায় টেলিফোন ছিল না তা নয়, পাবলিক টেলিফোনও বলতে গেলে ছিল না। আমার মনে আছে আমাদের ক্যাম্পাসে শুধু একটা একাডেমিক বিল্ডিংয়ের সামনে একটা কার্ড ফোনের বুথ ছিল। টাকা দিয়ে কার্ড কিনে সেই কার্ড ঢুকিয়ে ফোন করতে হত। প্রায় সময়েই ফোনের কানেকশন হত না কিন্তু টেলিফোন বুথ নির্দয়ভাবে কার্ড থেকে টাকা কেটে নিত। দুই পক্ষই দুই পাশ থেকে হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করছি, কেউ কারো কথা শুনছি না কিন্তু এই ফাঁকে ঠিকই কার্ড থেকে পুরো টাকা উধাও হয়ে গেছে!

এখন সেই সময়কার কথা মনে হলে নিজেরাই আপন মনে হাসি। আমার মনে হয় এখন প্রায় সবার বাসাতেই যতজন মানুষ তার থেকে বেশি টেলিফোন। একসময় টেলিফোন দিয়ে আমরা শুধু

কথা বলতাম, এখন যতই দিন যাচ্ছে টেলিফোনে কথা বলা কমে অন্য কাজকর্ম বেড়ে যাচ্ছে। আমরা টেলিফোনে এস.এম.এস. পাঠাই— ইংরেজিতে বাংলা লিখে সবার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমি রীতিমতো আতংকে থাকি যে কোনো এক বইমেলায় আমি দেখবে কেউ একজন ইংরেজিতে বাংলা লিখে একটা বই বের করে ফেলেছে। আমজনতাকে অবশ্য সে জন্যে দোষ দেয়া যায় না, আজকাল দেখছি সরকারও ইংরেজিতে বাংলা লিখে নানা ধরনের বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয় টেলিফোনে এস.এম.এস. পাঠানোর পরপরই যে কাজটা করা হয় সেটি হচ্ছে ছবি তোলা। কয়েকজন মানুষ একত্র হয়ে গল্পগুজব করছে, চা-নাস্তা খাচ্ছে এই পরিচিত সামাজিক দৃশ্যের মাঝে অবধারিতভাবে এখন নতুন একটি দৃশ্য যোগ হয়েছে, সেটি হচ্ছে একজন তার মোবাইল বের করে ছবি তুলছে। এক সময় মানুষ যত্ন করে ছবি তুলত, এখন সেলফি নামক ছবি তোলার এই বিচিত্র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর যত্ন করে ছবি তোলার বিষয়টাই উঠে গেছে। সেলফি ছবি তোলার যে একটা সামাজিক মানমর্যাদার বিষয় আছে আমি সেটা জানতাম না। একজন কমবয়সী ছেলে আমার সাথে সেলফি তুলতে চাইতেই কাছে দাড়ানো একজন বড় মানুষ এই "বেয়াদপি" করার জন্যে তাকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বসেছিলেন।

কথা বলা এবং ছবি তোলা ছাড়াও এই টেলিফোনে আরো অসংখ্য কাজ করা যায়, আমার মনে হয় না আমি তার তালিকা লিখে শেষ করতে পারব। শুধু তাই নয়, আমি যে কয়টি লিখতে পারব আমার ধারণা পাঠকেরা তার থেকে অনেক বেশি লিখতে পারবেন। টেলিফোনে যে কয়টি কাজ করা যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকারও প্রয়োজন নেই—আমি আমার ছাত্রদের দিয়ে আমার জন্যে পরীক্ষা নেয়ার একটা "অ্যাপ" তৈরি করিয়ে নিয়েছে। এম.সি.কিউ. ধরনের পরীক্ষা নেয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তরটা আমাকে এস.এম.এস. করে পাঠায়, আমার টেলিফোন উত্তরটা যাচাই-বাছাই করে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় কত পেয়েছে সাথে সাথে সেটাও তাদেরকে জানিয়ে দেয়। এখন আমার পরীক্ষা নিতে ক্লান্তি নেই, আমার ধারণা যে কোনোদিন আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসবে।

তবে টেলিফোনে আজকাল যে কাজটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে সেটি সম্ভবত ইন্টারনেট বিচরণ। আজকের লেখাটি এই বিষয় নিয়ে এবং এতক্ষণ আসলে এই কথাটি বলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

দুই.

মূল বক্তব্যে যাবার আগে সবাইকে একটি বিষয় মনে করিয়ে দেয়া যাক, সেটি হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মাঝে পার্থক্য। পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস থাকে তার মাঝে বিশাল একটা শক্তি জমা থাকতে পারে, এই তথ্যটা হচ্ছে জ্ঞান কিংবা বিজ্ঞান। এই শক্তিটা ব্যবহার করে চোখের নিমিষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলার জন্যে যে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে প্রযুক্তি, কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞান খুবই চমৎকার বিষয় এর মাঝে কোনো সমস্যা নেই। আমরা কিন্তু কখনোই প্রযুক্তির ব্যাপারে এরকম ঢালাওভাবে সার্টিফিকেট দিতে পারব না।

প্রযুক্তির মাঝে যেরকম ভালো প্রযুক্তি আছে ঠিক সেরকম অপ্রয়োজনীয় এমনকি খারাপ প্রযুক্তি আছে। কাজেই নতুন একটা প্রযুক্তি দেখলেই সেটা নিয়ে গদ-গদ হয়ে যাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছাড়তে হবে। যে কোনো নতুন একটা প্রযুক্তি দেখলেই রীতিমতো ভুরু কুঁচকে সেটাকে যাচাই-বাছাই করে নেয়া মোটেও প্রাচীনপন্থীর কাজ নয়, রীতিমতো বুদ্ধিমানের কাজ।

এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে কম্পিউটার। আমাদের সবচেয়ে সস্তা মোবাইল টেলিফোনেও একটা কম্পিউটার আছে, আবার যে মহাকাশযানটি সেই প্লুটোর কাছে হাজির হয়ে তার ছবি তুলে পাঠাচ্ছে তার ভেতরেও একটা কম্পিউটার আছে। এই অসাধারণ একটি প্রযুক্তি আসলে আমাদের পুরো সভ্যতাটাকেই নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে। কোনো মানুষ যদি ঠিক করে সে কম্পিউটার ব্যবহার না করেই তার জীবনটা কাটিয়ে দেবে আমার ধারণা তার জীবনটা আক্ষরিক অর্থে আটকে যাবে। অথচ আমি একজন মাকে জানি যিনি একটি কম্পিউটার দেখলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কারণ তার সন্তান কোনো বিশ্রাম না নিয়ে টানা কয়েকদিন একসাথে কম্পিউটার ব্যবহার করে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গেছে। এটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী এবং নিষ্ঠুর একটি উদাহরণ। আমরা জানি সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ নিরাপদে কম্পিউটার ব্যবহার করে সবরকম কাজকর্ম করে যাচ্ছে এবং সে জন্যেই এই উদাহরণটি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কারণ এটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে খুবই নিরীহ এবং নিরাপদ একটা প্রযুক্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেও ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা যায়। এরকম উদাহরণ অনেক আছে।

আমাদের দেশ যেহেতু প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা একটি দেশ তাই আমরা যে কোনো নূতন প্রযুক্তি দেখলেই একেবারে গদগদ হয়ে যাই। সে কারণে দেশে যখন নতুন কম্পিউটার এসেছে আমরা সেটা আমাদের নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার জন্যে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। কম্পিউটারের নামটা দেখেই বোঝা যায় এর জন্ম হয়েছিল "কম্পিউট" বা হিসাব করার জন্যে কিন্তু এই যন্ত্রটি এতই বিচিত্র যে এটি দিয়ে কী কাজ করা যাবে সেটি সীমিত হতে পারে, শুধুমাত্র মানুষের সৃজনশীলতা দিয়ে। সৃজনশীলতা যে সবসময় সঠিক রাস্তায় যায় তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কাজেই আমরা আবিষ্কার করেছি এই দেশে নতুন প্রজন্মের কাছে কম্পিউটারের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়ে গেছে কম্পিউটার গেম। প্রযুক্তির প্রতি আমাদের এতই অন্ধ বিশ্বাস যে বাবা-মা যখন দেখেছেন তাদের ছেলেমেয়েরা সব কাজকর্ম ফেলে দিন-রাত কম্পিউটারের মনিটরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে তখন তারা দুশ্চিন্তিত না হয়ে আহ্লাদিত হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। আমি অন্তত একটি শিশুর বাবা-মায়ের কথা জানি যারা তাদের শিশুটিকে কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পুরোপুরি একটি অসামাজিক জীব হয়ে বড় হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে অহংকার করেন।

কম্পিউটার এসে আমাদের অনেক শিশুর জীবনকে মোটামুটি জটিল করে তুলেছিল, ইন্টারনেট আসার পর তার সাথে একটা নতুন মাত্রা যোগ হল।

তিন.

ইন্টারনেট সম্ভবত আমাদের এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় যে আমি কত বড় সৌভাগ্যবান যে নিজের চোখে এই প্রযুক্তিটিকে জন্ম নিতে এবং বিকশিত হতে দেখেছি। আমরা সবাই জানি একসময় এই দেশের কিছু কর্তাব্যক্তি আমাদের দেশে যেন ইন্টারনেট আসতে না পারে তার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। দেশের তথ্য পাচার হয়ে যাবার ভয়ে তারা সাবমেরিন ফাইবারের যোগাযোগ নিতে রাজি হননি। এই চরিত্রগুলোর নাম এবং পরিচয় জানার আমার খুব কৌতূহল হয়। আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যম তো কত কিছু নিয়েই কতরকম ফিচার করে থাকেন, দেশকে পিছিয়ে নেয়ার কাজে সবচেয়ে অগ্রগামী এই মানুষদের নাম-পরিচয় জানিয়ে একবার একটা ফিচার কেন করল না।

একটা দেশ প্রযুক্তিতে কতটুকু এগিয়ে আছে তার পরিমাপ করার জন্যে নানারকম জরিপ নেয়া হয়। এর একটা পরিমাপ হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং খুবই স্বাভাবিক কারণে আমাদের এই সংখ্যাটি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছিল খুবই কম। ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্যে একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপের দরকার হত এই দেশের আর কতজন মানুষের কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপ কেনার ক্ষমতা আছে? শুধু তাই নয় কম্পিউটার ল্যাপটপের সাথে সাথে ইন্টারনেটের সংযোগের ব্যাপার আছে এবং সবকিছু শেষ হবার পর আমাদের সেই মিলিয়ন ডলার প্রশ্নটি করতে হয়, ইন্টারনেট ব্যবহার করে কী করা হবে?

মোটামুটি একই সময়ে হঠাৎ করে সবগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ইন্টারনেট করার জন্যে কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপের দরকার নেই, খুবই স্বল্পমূল্যের স্মার্ট ফোন দিয়েই সেটা করা সম্ভব। ইন্টারনেট সংযোগেরও দরকার নেই, অনেক জায়গাতেই ওয়াইফাই আছে, যদি না থাকে মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে "মেগাবাইট" কেনা যায়। আর ইন্টারনেট দিয়ে কী করা হবে সেই প্রশ্নটি করা হলে সবাই আমাকে বেকুব বলে ধরে নেবে। এটি কি এখন কোনো প্রশ্ন হতে পারে? অবশ্যই ইন্টারনেট দিয়ে ফেসবুক করা হবে! জরিপ নিয়ে দেখা গেছে বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতকরা আশিভাগ মানুষ ফেসবুক করে থাকে। ইন্টারনেট এবং ফেসবুক এখন এই দেশে প্রায় সমার্থক শব্দ।

তাই হঠাৎ করে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে সাড়ে চার কোটি হয়ে গেছে জানার পরও আমি কেন জানি উল্লসিত হতে পারছি না, বরং কেন জানি নার্ভাস অনুভব করতে শুরু করেছি। তার কারণ এর বড় একটা সংখ্যা আসলে কম-বয়সী কিশোর-কিশোরী-এমনকি শিশু।

আমি আগেই পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমি ফেসবুক বা অন্য কোনো সামাজিক নেটওয়ার্কের বিশেষজ্ঞ নই। আমি কখনো কোনো ফেসবুক একাউন্ট খুলিনি কিন্তু নানা ধরনের মানুষেরা আমার নামে ভূয়া ফেসবুক একাউন্ট তৈরি করে এতই ঝামেলা করতে শুরু করেছিল যে

আমার ছাত্র এবং তরুণ সহকর্মীরা আমার জন্যে একটা "অফিসিয়াল" ফেসবুক একাউন্ট তৈরি করে রেখেছে, এর ভেতরে, কী ঘটে না ঘটে আমি দেখি না, তাই ফেসবুক বা অন্য কোনো সামাজিক নেটওয়ার্কের ভেতর কী ঘটে আমি সেটা জানি না।

কিন্তু অবশ্যই আমি সেটা অনুমান করতে পারি। আমি একবার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সভায় মঞ্চে বসে আছি। আমার পাশে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ বসেছেন, হঠাৎ করে তিনি আমাকে বললেন, "একটা সেলফি তুলি?" আমি মাথা নাড়লাম এবং সেই চলমান সভার মাঝখানে তিনি আমার সাথে একটা সেলফি তুলে ফেললেন। আজকাল সেলফি তোলার পর সেটা শেষ হয়ে যায় না, সেটাকে ফেসবুক দিতে হয় এবং সেই সভার মাঝখানেই তিনি সেটা ফেসবুকে দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বললেন, "এর মাঝে ঊনত্রিশটা লাইক পড়ে গেছে।"

বলা বাহুল্য আমি চমৎকৃত হলাম—লাইকের সংখ্যা দিয়ে নয়, একজন বয়স্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষের এই ছেলেমানুষি আনন্দটি দেখে। যদি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বয়স্ক মানুষ লাইকের সংখ্যা দেখে এরকম বিমলানন্দ পেতে পারেন তাহলে আমাদের ছোট ছোট কিশোর-কিশোরী বা শিশুরা কী দোষ করেছে? তারা কেন ফেসবুক লাইকের জন্যে লালায়িত হবে না? কাজেই খুবই সঙ্গত কারণে আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরী এবং শিশুরা এই লাইক কালচারে ঢুকে গেছে। অন্য সব কারণ ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আবিশ্বাস্য পরিমাণ সময় নষ্টের কারণে অসংখ্য অভিভাবক আমার সাথে যোগাযোগ করে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের দেশে সাড়ে চার কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তার মাঝে কতজন অপরিণত বয়সের ছেলে-মেয়ে আমরা কি সেটা জানি? এই কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্যে ইন্টারনেটের জগৎটি কি একটা আলো-ঝলমলে আনন্দের জগৎ নাকি প্রতি পদক্ষেপে লুকিয়ে থাকা গ্লানিময় অন্ধকার নিষিদ্ধ জগৎ? একজন শিক্ষিকা তার ক্লাশের ছেলেমেয়েদের ইন্টারনেটের উপকারিতা বোঝানোর জন্যে গুগলে একটা বাংলা শব্দ লিখে সার্চ দিয়েছিলেন, এই শব্দটির মতো পূত পবিত্র নির্দোষ এবং নিরীহ শব্দ বাংলা ভাষায়, দ্বিতীয়টি নেই কিন্তু সেই শব্দের সূত্র ধরে ক্লাশের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সামনে মালটি-মিডিয়াতে বাংলা পর্নোগ্রাফির কুৎসিত জগৎ বন্যার পানির মতো নেমে এসেছিল। আমি নিজে ইন্টারনেটে পত্রিকা পড়তে পড়তে আশেপাশে ক্লিক করে কিছু বোঝার আগেই হিংস্র মানুষের ঘৃণা ছড়ানো ভয়ংকর সাইটে ঢুকে পড়েছি। বাকস্বাধীনতার নামে এ ধরনের অমানবিক হিংস্র ওয়েবসাইট যে থাকতে পারে আমি সেটা জানতাম না। যদি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা নিজের অজান্তেই এরকম ভয়ংকর ওয়েবসাইটে ঢুকে যেতে পারেন তাহলে কেউ যখন সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে তখন সে কোথায় গিয়ে হাজির হবে সেটি কি চিন্তা করা সম্ভব?

বিষয়টি যথেষ্ট গুরুতর, খুব কম বয়সে একটা বাচ্চা যদি শিখে যায় যে নিজের ছবি কিংবা নিজের কর্মকাণ্ডের বর্ণনাতে অসংখ্য পরিচিত-অপরিচিত মানুষের "লাইক" পাওয়া হচ্ছে জীবনের একমাত্র আনন্দের বিষয় সে তাহলে পুরোপুরি একটা ভুল মানুষ হয়ে বড় হবে। আমরা শিশুদের

শৈশব অনেক আগেই কেড়ে নিয়েছি, এখন তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের একটা জগৎ—এর চাইতে বড় দায়িত্বহীন কাজ কী হতে পারে?

আমি কোনো সমাধান দেয়ার জন্যে এই লেখাটি লিখতে বসিনি, খবরের কাগজে একটা কলাম লিখে আমি এর সমাধান দিতে পারব আমি সেটা মনেও করি না। তবে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বাড়ানোর আগ্রহে আমরা যে আমাদের দেশে অসংখ্য বাচ্চাদের সময়ের আগেই একটা বিপদজনক জায়গায় ঠেলে দিয়েছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি মাথায় থাবা দিয়ে হায় হায় করে মাতম করতেও রাজি নই। ইন্টারনেট একটা অবিশ্বাস্য শক্তিশালী প্রযুক্তি, এটাকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যবহার করে ম্যাজিক করে ফেলা সম্ভব। আমি তাই সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই পুরো বিষয়টাকে নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে। অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার সময় হয়েছে। দেশের বড় বড় হর্তাকর্তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় হয়েছে। জ্ঞানীগুণী মানুষদের চিন্তা করার সময় হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো কিভাবে এই সমস্যার সমাধান বের করেছে সেগুলো খুঁজে দেখার সময় হয়েছে।

আমরা শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে চাই, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের একটা জগৎ উপহার দিতে চাই না। ইন্টারনেটের কানাগলিতে তাদের হারিয়ে ফেলতে চাই না।

[লেখক: শিশু-কিশোরদের প্রিয়তম লেখক। অধ্যাপক, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়।]

আমাদের শিশুদের খাবারগুলো নিরাপদ হোক

অ ধ্যা প ক আ ব ম ফা রু ক

খাদ্যে ভেজাল পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও একটি বড় সমস্যা। অতি দ্রুত বড়লোক হতে চাওয়া অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে আমাদের অধিকাংশ খাবার আজ বিষাক্ত পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা খাবার খাই মূলত শরীরের ক্ষয় পূরণ এবং শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সাধনের জন্য। প্রকৃতির নিয়মে খাবার তাই পুষ্টিকর। কিন্তু ব্যবসায়ী যখন অতিরিক্ত মুনাফার লোভে খাবারে কৃত্রিম কিছু মেশায় তখন খাবারের মান নষ্ট হয়। খাবারের এসব কৃত্রিম উপাদান আবার অধিকাংশই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এসব ক্ষতি আবার শিশু, গর্ভবতী মা এবং বৃদ্ধদের জন্য তরুণ-তরুণীদের চাইতে বেশি ক্ষতিকর। শিশুদের জন্য বেশি ক্ষতিকর কারণ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তখনো পরিণত বা ম্যাচিউর হয়নি। গর্ভবতী মায়ের জন্য বেশি ক্ষতিকর কারণ তার শরীরের ভেতরে যে ভ্রূণটি বেড়ে ওঠছে সেটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো অত্যন্ত অপরিণত। বৃদ্ধদের জন্য বেশি ক্ষতিকর কারণ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দীর্ঘদিন আগে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বয়সের কারণে এখন জরাগ্রস্ত ও দুর্বল। ফলে এসব অপরিণত কিংবা দুর্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাবারে অসাধু ব্যবসায়ীদের মেশানো উপাদানগুলোকে সামাল দিতে গিয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুদের বেলায় তাদের মস্তিষ্ক, অন্যান্য স্নায়ু ও বিভিন্ন অঙ্গের যে ক্ষতি হয় তা ইররিভারসিবল অর্থাৎ এ ক্ষতি আর কখনোই পূরণ হওয়ার নয়। তার মানে ক্ষতিগ্রস্ত এ বাচ্চাটি সারাজীবন তার এ ক্ষতি বয়ে বেড়াবে। আমাদের বাচ্চারা যে খাবারগুলো খায় সেগুলো নিরাপদ হওয়া সেজন্য অনেক বেশি জরুরি।

বাচ্চারা যেসব খাবার খায় তার মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের প্রিয় খাবারগুলোই বেশি ক্ষতিকর বা বেশি বিষাক্ত। এরকম কিছু খাবার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কোমল পানীয় বা কোল্ড ড্রিংকস্‌গুলো বাচ্চাদের ভীষণ পছন্দের। এই জনপ্রিয়তা শুধু ঠাণ্ডা পানির বিকল্প হিসেবেই নয়। বাচ্চারা এর স্বাদও খুব পছন্দ করে। কৌশলী বহুল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব পানীয়ের প্রস্তুতকারকরা এমন একটি ধারণা বাচ্চাদের মনে সুকৌশলে গেঁথে দিয়েছে

যে এসব কোল্ড ড্রিংকস আধুনিকতার প্রতীক এবং যতই খাওয়া যাক না কেন, নিরাপদ। তাছাড়া তারা বাচ্চাদেরকে লোভ দেখিয়ে ঠেলে দিচ্ছে তাদের সামগ্রী কেনার নেশায়। নেশার ঘোরে বাচ্চারা বাধ্য হচ্ছে কোল্ড ড্রিংকসের অপ্রয়োজনীয় এবং প্রায়ই অতিরিক্ত পানে। বাচ্চারা যে টাকা দিয়ে কোল্ড ড্রিংকস্ খাচ্ছে তা দিয়ে তারা পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারত। আমিষ ও ক্যালরি-ঘাটতির এ দেশে এই ক্ষতি অবশ্যই একটি জাতীয় ক্ষতি।

কোল্ড ড্রিংকসে থাকে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, সাইট্রিক এসিড, টারটারিক এসিড ও ফসফরিক এসিড। এগুলো পানির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। ছিপিবদ্ধ অবস্থায় এই গ্যাস বোতলের পানিতে প্রবল চাপে পানিতে মিশে থাকে এবং ছিপি খোলামাত্র বুদ্‌বুদ্ আকারে বেরিয়ে আসতে থাকে। তবে এরপরেও বেশ কিছু গ্যাস পানিতে মিশে থাকে, যা অতি ধীরে ধীরে নির্গত হয়। এগুলো খালি পেটে খেলে পেটে অম্লত্ব বা এসিডিটি বেড়ে যায়, ফলে একসময় ক্ষত বা আলসার তৈরি করতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে কোল্ড ড্রিংকস্ একারণেই পাকস্থলীর খিঁচ ধরা ব্যথা ও অগ্নিমান্দ্য সৃষ্টি করে।

তাছাড়া কোল্ড ড্রিংকসের এসিড, বিশেষ করে ফসফরিক এসিড, দাঁত ও হাড়ের ক্ষয় করে। ঘন ঘন কোল্ড ড্রিংকস্ সেবনে এই এসিড ও সাইট্রিক এসিড দাঁতের উপরিভাগকে ক্ষয় করে এর চক্‌চকে ভাবকে নষ্ট করে দেয়। বাচ্চাদের দাঁতে শক্ত এনামেলের ভাগ কম এবং তুলনামূলকভাবে নরম ডেনটিনের ভাগ বেশি থাকে বলে কোল্ড ড্রিংকসে ব্যবহৃত এসিডগুলো বড়দের চাইতেও বাচ্চাদের দাঁতের ক্ষতি করতে পারে বেশি। একারণে যে কোল্ড ড্রিংকস্ যত বেশি টক, তার উপরিউক্তভাবে ক্ষতিও করে বেশি।

কোল্ড ড্রিংকসের সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং বেশি খেলে রক্তের ক্ষারত্ব বেড়ে গিয়ে এলকালোসিস এবং সেখান থেকে কিডনির গোলযোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া যাদের রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম তাদের ক্ষেত্রে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মাংসপেশির অস্বস্তিকর কাঁপুনি সৃষ্টি করতে পারে। কোনো বাচ্চার লিভারের কার্যকারিতার গোলযোগ থাকলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট না দেয়া অর্থাৎ কোল্ড ড্রিংকস না খাওয়াই ভালো। নিতান্তই বাধ্য হলে 'উইথ এক্সট্রিম কশান্' তা খেতে হয়। স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা চলছে এরকম বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহারে সমান সাবধানতা প্রয়োজন। বাংলাদেশে যে হারে কোনো বিচার-বিবেচনা না করে বাচ্চাদের কোল্ড ড্রিংকস্ খাওয়ানো হচ্ছে তাতে তাদের মারাত্মক ক্ষতির আশংকা থেকেই যাচ্ছে। এক থেকে ৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের নিরাপদ মাত্রা ১০০ মিলিগ্রামের বেশি নয়। কিন্তু কোল্ড ড্রিংকসের একেকটি বোতলে এটি ব্যবহার করা হয় এর কমপক্ষে ২৫ গুণ। কোল্ড ড্রিংকস্ বাচ্চাদের কী পরিমাণে ক্ষতি করতে পারে তা এই হিসাব থেকে সহজেই অনুমেয়।

১৯৮৭ সালে *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল*-এ সি জি উড্‌স ও তাঁর সহযোগীদের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় (সংখ্যা ২৯৪, পৃষ্ঠা ৮৬৯)। তাতে দেখা যায়, সাইট্রিক এসিড ও

সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দিয়ে তৈরি একটি বুদ্‌বুদময় পানীয় ৭ জন বাচ্চাকে খাওয়ানোর পর বিষক্রিয়ায় একজনের তাৎক্ষণিকভাবেই বমি শুরু হয়।

বাচ্চাদের শরীরে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের বিষক্রিয়ার আরেকটি উদাহরণ হল ১৯৮৩ সালে *কানাডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন জার্নাল*-এ (সংখ্যা ১২৮, পৃষ্ঠা ৮২১) এম এস পুক্‌জিনস্কি ও তাঁর সহযোগীরা একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, "তিন বছরের একটি মেয়ের পেটে ব্যথা হয় বলে বাড়ির লোকজন তাকে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দিয়ে একটি 'গার্হস্থ্য ওষুধ' তৈরি করে ১০ দিন ধরে খাওয়ায়। মেয়েটি ভালো হওয়ার পরিবর্তে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। চিকিৎসকেরা সেখানে দেখেন যে তার রক্তে সোডিয়ামের মারাত্মক আধিক্য বা হাইপারনেট্রিমিয়া ঘটে গেছে। মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য তারা ফ্লুইড থেরাপি শুরু করেন এবং একসময় সে রক্ষা পায়।"

কোল্ড ড্রিংকসের দীর্ঘদিন বা অতিরিক্ত ব্যবহারে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট রক্তের প্লাজমাতে লিথিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এই লিথিয়াম মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। ফলে এ কারণে বাচ্চাদের মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশন কিংবা মনোবৈকল্য বা ম্যানিয়া দেখা দিতে পারে।

কোল্ড ড্রিংকসের মধ্যে কোনো কমলা বা লেবুর উপস্থিতি নেই, যদিও লেবেলে বা বিজ্ঞাপনে কমলা বা লেবুর ছবি ব্যবহার করা হয়। কমলা বা লেবুর গন্ধ ও রঙ সবটাই কৃত্রিম। কৃত্রিম রং অধিকাংশই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। যেগুলো ক্ষতিকর নয় বা কম ক্ষতিকর বলে দীর্ঘদিনের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে বিজ্ঞানীরা তিনভাগে ভাগ করেছেন। এক) যেসব রং খাদ্য ওষুধ ও প্রসাধনীতে ব্যবহার করা হয়। দুই) যেগুলোকে খাদ্যে নয় তবে ওষুধ ও প্রসাধনীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই গ্রুপের রংগুলো প্রথম গ্রুপের চাইতে কম নিরাপদ বলে এগুলোকে খাদ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ পরিমাণগত বিবেচনায় ওষুধ বা প্রসাধনীর চাইতে খাদ্যের মাধ্যমে অনেক বেশি পরিমাণ রং শরীরে প্রবেশ করে। তিন) ঠোঁট, মুখমণ্ডল ও হাত বাদে শরীরের অন্যান্য অংশের প্রসাধনীতে ব্যবহার্য রং। অর্থাৎ এই রংগুলো যাতে কোনোভাবে মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা নেয়া হয়েছে। এই তিনভাগের বাইরে যেসব রং সেগুলো ক্ষতিকর এবং এগুলো কাপড় রাঙানো থেকে শুরু করে বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের চারপাশে যেসব খাবার বিক্রি হচ্ছে এবং হরদম আমরা যেগুলো খাচ্ছি সেগুলোর আরো কিছু উপাদান আমাদের জন্য ক্ষতিকর, বাচ্চাদের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর। ইফতারি বাজারের অত্যন্ত জনপ্রিয় পেঁয়াজু, ছোলা, বেগুনি, আলুর চপ, জিলিপি ইত্যাদিকে দেখতে আকর্ষণীয় করার জন্য যেসব রং মেশানো হচ্ছে সেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাছাড়া যে তেলে এগুলো ভাজা হচ্ছে সেগুলো শুরুতে ক্ষতিকর না হলেও দিনের পর দিন উপর্যুপরি ব্যবহারে প্রচণ্ড তাপে সেগুলো ক্ষতিকর তেলে রূপান্তরিত হচ্ছে। সেমাইতে পোড়া মবিল

ব্যবহারের খবর ও দৃশ্য আমরা টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় দেখেছি। বিভিন্ন রকম সেমাইতে বিভিন্ন ক্ষতিকর রং ব্যবহার ছাড়াও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এগুলো তৈরি করা হয়। চানাচুর বিস্কুট কেক লজেন্স পেস্ট্রি এমনকি রেস্টুরেন্টের সিঙ্গারাতে পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষতিকর রং টেক্সটাইল কালার মেশানো হয়। তথাকথিত বিভিন্ন ফ্রুট জুস ও আইসক্রিমের অধিকাংশই রং-ই ক্ষতিকর। হোটেলের কাবাব-কাটলেট ইত্যাদিতেও ক্ষতিকর কালো ও বাদামি রং ব্যবহার করা হয়। চায়নিজ রেস্টুরেন্টগুলোর খাবারগুলোতে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রং প্রায়ান্ধকার কম আলোতে প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু সেসব খাবার দিনের আলোতে বা উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে এলে রং বিষয়ে অনেক অসচেতন মানুষও ভয় পেতে পারেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে-পার্বণে আমাদের দেশের মানুষের মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস আমাদের সংস্কৃতিরই অংশ। কিন্তু এসব রঙিন মিষ্টির অধিকাংশই তৈরি হচ্ছে ক্ষতিকর রং দিয়ে। বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ গুঁড়া মশলাতে, বিশেষ করে হলুদ ও মরিচে, রয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকর হলুদ ও লাল রং। কয়েক বছর আগে আমাদের দেশের অত্যন্ত বিখ্যাত দুটি প্রতিষ্ঠান লাল মরিচের আচার রপ্তানি করতে গিয়ে বিদেশের কয়েকটি ল্যাবরেটরিতে আটকে গেছে। বিদেশের সেসব ল্যাবরেটরি অভিযোগ করেছে যে কোম্পানি দুটি মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ লাল রং সুদান রেড ব্যবহার করেছে। আমাদের দেশের কাঁচাবাজার ও ফলের বাজারে ক্ষতিকর রং ব্যবহার নিয়ে কিছুদিন আগেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের পরিচালিত জরিপে শরবত কনসেনট্রেট ও শরবত পাউডার হিসেবে বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ৫টি পণ্যের প্রতিটিতেই এমারান্থ, টারট্রাজিন ও সানসেট ইয়েলো নামের ক্ষতিকর লাল ও হলুদ রং-এর উপস্থিতি দেখা গেছে।

এসব রংগুলো অধিকাংশই 'খাবার রং' নয়, তা হল অত্যন্ত ক্ষতিকর 'টেক্সটাইল কালার' বা কাপড় রাঙানোর রং। এগুলো দিয়ে গামছা লুঙ্গি শাড়ি থান ইত্যাদি রং করা হয়। আমরা সচেতন নই বলেই বাজার থেকে তৈরি খাবার কেনার সময় রঙিন খাবার কিনি। কিন্তু নিজেদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আজ সচেতন হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এসব রং ও উপাদান এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, হাঁপানি, পাকস্থলীতে হজমের গোলযোগ, পেটে তীব্র গ্যাস, পেপটিক আলসার, অস্থিমজ্জায় গোলযোগের কারণে রক্তকণিকার গঠনগত অস্বাভাবিকতা, লিভারের মারাত্মক ক্ষতি, কিডনির অকার্যকারিতাসহ নানাবিধ দুরারোগ্য অসুখ ও জীবনহানি ঘটাতে পারে।

দই-মিষ্টিসহ আমাদের দেশের তৈরি খাবারগুলোতে যেসব রং ব্যবহার করা হয় সেগুলো অধিকাংশই বিজ্ঞানীদের অনুমোদিত 'পারমিটেড কালার' বা 'ফুড কালার' নয়, এগুলো প্রায় সবই 'টেক্সটাইল কালার'। ফুড কালারের দাম বেশি বলেই কম দামের টেক্সটাইল কালার মেশানো হয়। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে কাপড়ের কারখানার আশেপাশে নদী-খাল বা অন্য জলাশয়গুলোর পানি রঙিন। কারণ টেক্সটাইল কালার কারখানা থেকে বেরিয়ে প্রকৃতিতে গিয়ে দীর্ঘদিনেও সহজে পরিবর্তিত হয় না অর্থাৎ এগুলোর অধিকাংশই বায়ো-ডিগ্রেডেবল নয়। ফলে

কাপড়ের কারখানার রঙিন বর্জ্য যেসব নদী খাল বা জলাশয়ে নির্গত হয় সেখানকার মাছ ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ মরে যায়, মরে যায় শৈবালসহ সব ধরনের জলজ উদ্ভিদ। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ক্ষতি হয় মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী। বায়ো-ডিগ্রেডেবল নয় বলে এসব টেক্সটাইল কালার আমাদের শরীরের মেটাবোলিজম বা বিপাক প্রক্রিয়ায় নষ্ট না হয়ে দীর্ঘদিন শরীরে থেকে প্রাণঘাতী ক্ষতি করতেই থাকে। এই টেক্সটাইল কালারগুলো খাদ্য ও পানীয়ের সাথে মিশে শরীরে প্রবেশের পর এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে সবচেয়ে বেশি ও দৃশ্যমান ক্ষতি হয় আমাদের লিভার, কিডনি, হৃদপিণ্ড ও অস্থিমজ্জার। ধীরে ধীরে এগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চা ও বৃদ্ধদের বেলায় এগুলো নষ্ট হয় তাড়াতাড়ি, তরুণ-তরুণীদের কিছুটা দেরিতে। আজকাল আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনি ফেলিউর ইত্যাদি অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এর প্রধান কারণ আমাদের দেশের খাদ্যে ব্যাপক ভেজাল ও ক্ষতিকর রং-এর ব্যবহার। বাংলাদেশে ইদানীং বাচ্চাদের হাঁপানিও অনেক বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা বাচ্চাদের হার্টের অসুখের সাথেও এখন এসব রংয়ের সম্ভাব্য সম্পর্ক খতিয়ে দেখছেন। অথচ দুঃখের কথা হচ্ছে যে আমাদের দেশে বাচ্চাদের খাদ্য ও পানীয়গুলোতেই রং বেশি বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো খেয়ে কত বাচ্চা যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার হিসাব করার কোনো উপায় আমাদের নেই।

বাচ্চাদের খাবারে যেমন জুস, কেক, বিস্কুট, পেস্ট্রি, জ্যাম, জেলি, আইসক্রিম ইত্যাদিতে চিনির বদলে যে কৃত্রিম মিষ্টিকারক ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কেও আপত্তি রয়েছে। ১৯৮২ সালের জাতীয় ওষুধনীতিতে কৃত্রিম মিষ্টিকারক সোডিয়াম সাইক্লামেট দিয়ে তৈরি ওষুধগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) ক্যান্সার সৃষ্টির অভিযোগে এটিকে ১৯৭০ সালে সে দেশে নিষিদ্ধ করে। কোম্পানি অনেক মামলা-মোকদ্দমা করার পরেও এটি সেখানে এখনো নিষিদ্ধই রয়েছে। ওষুধ সবাই সবসময় ব্যবহার করে না, তাছাড়া ওষুধে এটি লাগেও অনেক কম। ওষুধের তুলনায় খাবারের মাধ্যমে এটি তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে খাওয়া হলেও অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে ক্ষতিঝুঁকি বেশি হলেও বাংলাদেশের খাদ্যে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে ২০০৩ সালে। কিন্তু তারপরও এটি চিনির বিকল্প হিসেবে রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি হয়ে আসছে। সর্বশেষ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে এটি নিষিদ্ধ হয়েছে ২০০৬ সালের ৬ মার্চ। মোবাইল কোর্টগুলো মিষ্টির দোকান, বেকারি ও আইসক্রিমের কারখানায় অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ সোডিয়াম সাইক্লামেট আটক করলেও এর আমদানি বন্ধ থাকেনি। গত ৩০ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে যৌথবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস হওয়ার সময় ৩৮ টন সোডিয়াম সাইক্লামেট আটক করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও এটি আমদানির অনুমতি নিশ্চয়ই কোনো সরকারি অফিস থেকেই গিয়েছে। এত কিছুর পরেও 'ঘনচিনি', 'পুষ্টি চিনি', 'ডায়াবেটিক চিনি', 'ডি-সুগার' ইত্যাদি বাহারি ও প্রলুব্ধকর নামে বহাল

তবিয়তে আমাদের দেশের অনেক ওষুধের দোকানসহ বিভিন্ন দোকানে এটি এখনও বিক্রি হচ্ছে এবং ক্রেতারাও না জেনে এটি এখনো ব্যবহার করছে।

এই সোডিয়াম সাইক্লামেট চিনির চাইতে ৩০ গুণ বেশি মিষ্টি। আরেকটি কৃত্রিম মিষ্টিকারক স্যাকারিন বা সোডিয়াম স্যাকারিনের মতো এর পরিমাণ একটু বেশি হয়ে গেলে খাদ্য বা পানীয় তিতা হওয়ার কোনো ভয় নেই। স্যাকারিনগুলো খাওয়ার কিছুক্ষণ পর মুখে একটু তিক্ত স্বাদ আসতে পারে, আমরা একে বলি 'বিটার আফটার টেস্ট', সোডিয়াম সাইক্লামেটে সে ভয়ও নেই। সোডিয়াম সাইক্লামেটের দামও তুলনামূলকভাবে কম। তাই আমাদের দেশে দই, মিষ্টি, আইসক্রিম, বিভিন্ন পানীয়, এমনকি চকলেট-টফি তৈরির কোম্পানিগুলোর অনেকেই সোডিয়াম সাইক্লামেট ব্যবহার করছে। বাচ্চারাও না জেনে এগুলো সমানে খাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) উপর্যুক্ত সুবিধাদি বিবেচনা করে সোডিয়াম সাইক্লামেটকে জনগণের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেয় ১৯৫১ সালে। কিন্তু ধীরে ধীরে সোডিয়াম সাইক্লামেটের বিভিন্ন অজানা ক্ষতিকর দিকগুলো ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। জার্মানিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে সাইক্লামেট ব্যবহারে লিভারসহ শরীরের নানা অঙ্গের মারাত্মক ক্ষতির কথা প্রকাশিত হওয়ার পটভূমিতে যখন নতুন তথ্য এল যে এটি মূত্রথলিতে ক্যান্সার তৈরি করে তখন এফডিএ ১৯৭০ সালে সব ধরনের খাদ্য, পানীয় ও ওষুধে এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সে বছরই বিখ্যাত *টক্সিকোলজি এন্ড এপ্লাইড ফার্মাকোলজি* নামক জার্নালে প্রকাশিত হয় যে এটি মায়োকার্ডিয়াল ক্যালসিফিকেশন অর্থাৎ সহজ কথায় হৃদপিন্ডের মাংসপেশি শক্ত হয়ে যায় বলে সহজে রক্ত পাম্প করতে পারে না, ওষুধেও এ সমস্যা সারানো যায় না; এবং করোনারি ভেসেলস্-এর স্ক্লেরোসিস্ অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের ধমনি-শিরাগুলো চর্বি জমে শক্ত হয়ে যাওয়া ঘটায়। ১৯৭২ সালে *জার্নাল অব ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট* জানায় যে এই ক্যালসিফিকেশন কিডনিতেও ঘটে এবং এর ফলে রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া অর্থাৎ কিডনি বড় হয়ে যাওয়া দেখা দেয়। ১৯৭৫ সালে বিশ্বখ্যাত জার্নাল *টক্সিকোলজি* প্রকাশ করে যে এটি কিডনিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাছাড়া মূত্রথলিতে ক্যান্সার হওয়ার আশংকাকেও এই জার্নালটি পুনর্ব্যক্ত করে। ১৯৭৬ সালে *জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন* সোডিয়াম সাইক্লামেটের ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনা ও এফডিএ কর্তৃক এটি বাতিল করার পক্ষে সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে। ১৯৭৭ সালে *জার্নাল অব ইউরোলজি* মূত্রথলিতে এর ক্যান্সার সৃষ্টির আরো প্রমাণ প্রকাশ করে। ১৯৮০ সালে এফডিএ তার *ফেডারেল রেজিস্টারে* আরো মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা জানায় এবং এফডিএ তার এক যুগেরও বেশি সময় ধরে পরিচালিত অনেকগুলো গবেষণার সারমর্ম প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায় সোডিয়াম সাইক্লামেট ফুসফুস, লিভার এবং লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমেও টিউমার তৈরি করে। এফডিএ তখন আরো ঘোষণা করে যে স্বাস্থ্যের ওপর সোডিয়াম সাইক্লামেটের ক্ষতি সম্পর্কে যুগের পর যুগ গবেষণায় তারা এতটাই নিশ্চিত হয়েছে যে এ নিয়ে আর নতুন কোনো গবেষণার

প্রয়োজন নেই এবং এফডিএ কর্তৃক দূর ভবিষ্যতেও একে মানুষের খাদ্যে ও পানীয়ে ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা আরো জানিয়েছেন যে উপর্যুক্ত ক্ষতিগুলো ছাড়াও সোডিয়াম সাইক্লামেট ফটোসেনসিটাইজেশন তৈরি করে অর্থাৎ এটি খেয়ে রোদে বেরুলে এলার্জি বা গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়। এটি কোনো কোনো এন্টিবায়োটিকের বিশোষণে বাধা দেয় বলে কোনো কোনো জীবাণুজনিত অসুখ জটিল আকার ধারণ করে। এর ব্যবহারে ক্রোমোজমের ক্ষতি হয় অর্থাৎ বাবা-মা এটি খেলে বিকলাঙ্গ বা অস্বাভাবিক বাচ্চা জন্ম নিতে পারে। তদুপরি গর্ভবতী মায়েরা এটি খেলে বাচ্চা ডাউনস্ সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে বাচ্চার নাক বোঁচা, চোখ উপরের দিকে টেনে থাকা, জিহ্বা বের করে হা করে তাকিয়ে থাকা, বোকা বোকা চেহারা, ফোলা ফোলা শরীর ইত্যাদির সমষ্টি দেখা দিতে পারে।

বিএসটিআইকে ধন্যবাদ যে অবশেষে ২০০৩ সালে সোডিয়াম সাইক্লামেটকে খাদ্য ও পানীয়ে ব্যবহারে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এরপর ২০০৫ সালের ১৬ আগস্ট বিএসটিআই লিখিতভাবে জানায় 'সোডিয়াম সাইক্লামেট স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়'। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের ৬ মার্চ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের খাদ্য ও ওষুধে সাইক্লামেট ব্যবহার ও আমদানি নিষিদ্ধ করে। কিন্তু সরকারি অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে এটি খোলাবাজারে এরপরেও পাওয়া গেছে, এখনও যাচ্ছে। খাদ্য ও পানীয় উৎপাদকদের কারখানায় এটি ব্যবহারের বিষয়টিতো ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই উদ্‌ঘাটন করেছেন।

বাংলাদেশে সাইক্লামেটগুলো 'ঘনচিনি', 'ডায়াবেটিক চিনি', 'পুষ্টি চিনি' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিক্রি হয়। সম্প্রতি তাতে যোগ হয়েছে 'ডি-সুগার', 'ডি-সুগার (গোল্ড)' ইত্যাদি নতুন নামগুলো। ২৩ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে দৈনিক *প্রথম আলোয়* 'ডি-সুগার নামে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ সোডিয়াম সাইক্লামেট, আগে বিক্রি হত ঘনচিনি নামে' শীর্ষক খবরে জানা যায়, ২০০৫ সালের ২২ অক্টোবর পত্রিকাটিতে ঘনচিনি নামে সোডিয়াম সাইক্লামেট দেদার বিক্রির খবর প্রকাশের পর 'নানা সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের মুখে ঘনচিনি বিক্রি কমে আসে। কিন্তু পণ্যটির আমদানি ও বিক্রি বন্ধ হয়নি। দুই মাস আগে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সোডিয়াম সাইক্লামেটের বিশাল একটি চালান আটক করা হয়। এমনকি তিনটি ইউনানি ওষুধ কারখানাতেও সোডিয়াম সাইক্লামেট পাওয়া যায়। চিনির তুলনায় দাম অনেক কম হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ বিপজ্জনক উপাদানটি ব্যবহার করে আসছে।'

বাংলাদেশে সাইক্লামেটের বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো তাদের এই ক্ষতিকর পণ্য বিক্রির বাজার-কৌশল হিসেবে অসত্য তথ্যও পরিবেশন করছে। যেমন তারা বলছে সাইক্লামেট ক্ষতিকর নয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) কখনো সাইক্লামেটকে নিষিদ্ধ করেনি। অথচ বাস্তবতা হল, এফডিএ ১৯৭০ সালে এটি নিষিদ্ধ করেছে (সূত্র: *ইউ এস ফেডারেল রেজিস্টার*, ভল্যুম ৩৫, নং ১৩৬৪৪, তারিখ ২৭ আগস্ট ১৯৭০)।

সাইক্লামেট ব্যবসায়ীরা যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে সেজন্য সন-তারিখের ক্রম অনুযায়ী এ বিষয়ক কিছু তথ্য নিচে দেয়া হল -

১৯৬৯ সালের অক্টোবরে এফডিএ বিজ্ঞানী ড. জ্যাকুলিন ভেরেট দেখতে পান যে গর্ভে থাকাকালীন সোডিয়াম সাইক্লামেট প্রয়োগ করা হলে মুরগির বাচ্চা মারাত্মভাবে বিকৃত শারীরিক গঠন নিয়ে জন্মায়। তিনি এনবিসি টেলিভিশনে এ ধরনের বিকৃত আকৃতির কিছু মুরগির বাচ্চা প্রদর্শন করেন। কিন্তু ড. রবার্ট ফিঞ্চ নামে আরেকজন বিজ্ঞানী এই গবেষণার যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর কয়েকদিন পর সাইক্লামেটের উৎপাদক কোম্পানি এবোট ল্যাবরেটরিজ তাদের করা একটি গবেষণার ফলাফলে স্বীকার করে যে, তাদের পরীক্ষাধীন ২৪০টি ইঁদুরের মধ্যে সাইক্লামেট ব্যবহারে ৮টির মূত্রথলির টিউমার ধরা পড়েছে। তবে তারা বলে যে, গবেষণাটিতে টিউমার আক্রান্ত ইঁদুরের সংখ্যা তেমন বেশি নয়, তাই ভয়ের কিছু নেই।

এরপর কিছুদিন পর ড. রবার্ট ফিঞ্চ আরো কিছু গবেষণার ফলাফল হাতে পেয়ে আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং বাজার থেকে অবিলম্বে সব সাইক্লামেট প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করেন। এর সাথে মূত্রথলিতে ক্যান্সার সৃষ্টি ও আরো অন্যান্য মারাত্মক অভিযোগের প্রেক্ষিতে এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সালে এফডিএ খাদ্য ও ওষুধে সাইক্লামেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে (সূত্র: *সাইন্স*, ৪-৯-১৯৭০, পৃষ্ঠা ৯৬২)।

পরবর্তীতে কিছু গবেষণায় সাইক্লামেটের সাথে ক্যান্সারের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না পাওয়া গেলেও শরীরে অন্যান্য ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানকে ক্যান্সার সৃষ্টিতে সাইক্লামেট কর্তৃক উৎসাহ প্রদানের প্রমাণ গবেষকরা পান। ইতোমধ্যে সাইক্লামেটের উৎপাদক এবোট ল্যাবরেটরিজ এফডিএ-এর কাছে সাইক্লামেটের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বেশ কয়েকবার আবেদন করলেও প্রতিবারই এফডিএ তা প্রত্যাখ্যান করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থ *সেন্টার ফর সাইন্স ইন দি পাবলিক ইন্টারেস্ট* (সিএসপিআই) তার ৯ লক্ষাধিক সদস্য নিয়ে স্বাস্থ্য পুষ্টি খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ১৯৭১ সাল থেকে কাজ করছে। তাদের প্রকাশিত *নিউট্রিশন অ্যাকশন হেলথ্‌লেটার* অত্যন্ত প্রশংসিত, পুরস্কারপ্রাপ্ত ও গোটা উত্তর আমেরিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত। তাদের মতে বিতর্কিত কৃত্রিম মিষ্টিকারক সাইক্লামেটকে ১৯৭০ সালে প্রাণীদেহে ক্যান্সার সৃষ্টির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানকালের গবেষণাতেও দেখা গেছে এটি প্রাণীদেহে অণ্ডকোষের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্যান্সার তৈরি না করলেও অন্যান্য ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান কর্তৃক ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয় (সূত্র: সিএসপিআই, *নিউট্রিশন অ্যাকশন হেলথ্‌লেটার*, ১৯৭৮)।

এফডিএ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সাইক্লামেটের ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের একটি কমিটি এক বছর ধরে যে গবেষণা চালিয়েছিল তার ফলাফলে দেখা গেছে, সাইক্লামেটগুলো অন্যান্য ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানকে শরীরে ক্যান্সার

সৃষ্টির উদ্দীপনা জোগায়। কমিটি সবাইকে ভবিষ্যতে সাইক্লামেট ব্যবহারের সময় এর অণ্ডকোষের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতাকেও বিবেচনায় রাখতে বলে। (সূত্র: *সাইন্স নিউজ*, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৫ জুন ১৯৮৫)

১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ তারিখে এফডিএ কর্তৃক প্রকাশিত *এফডিএ কনজিউমার* পত্রিকায় বলা হয়, এফডিএ কর্তৃক ১৯৭০ সালে নিষিদ্ধ সাইক্লামেট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স তার গবেষণায় সুপারিশ করেছে যে, প্রাণীদেহে পরিচালিত ইতোপূর্বের দু'টি গবেষণায় সাইক্লামেট 'টিউমার প্রমোটার' এবং 'কো-কারসিনোজেন' হিসেবে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা নিয়ে এফডিএ আরো কাজ করুক। সেখানে আরো উল্লেখ করা হয় যে, সাইক্লামেট 'জেনেটিক ডেমেজ' এবং 'টেস্টিকুলার এট্রোফি' সৃষ্টি করে বলে বিগত দিনের গবেষণায় পাওয়া তথ্যগুলোও গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা উচিত।

১ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখে *রিজন* পত্রিকায় জ্যাকব ক্রেমার লেখেন যে, ১৯৬৯ সালের একটি গবেষণাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে এফডিএ সাইক্লামেটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সে গবেষণায় ধরা পড়ে যে, সাইক্লামেট ইঁদুরের শরীরে ক্যান্সার তৈরি করে। এ নিয়ে আরো গবেষণা চলছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সাইক্লামেট অন্যান্য উপাদানকে ক্যান্সার সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এছাড়া তিনি আরো জানিয়েছেন যে, সাইক্লামেট খাওয়ার পর সাইক্লোহেক্সাইলএমিন নামে যে মেটাবলাইট তৈরি হয় তা ইঁদুরের অণ্ডকোষকে সংকুচিত করে।

১৯৯৫ সালের মার্চে প্রকাশিত *এনভায়রনমেন্টাল হেলথ্ পারস্পেক্টিভস্* (ভল্যুম ১০৩, নম্বর ৩)-এ ক্রিস্টিন হোয়াইটের নিবন্ধ থেকে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোডিয়াম সাইক্লামেট ও পটাশিয়াম সাইক্লামেট ইত্যাদি নিষিদ্ধ এবং কোনো দেশ যদি এগুলো দিয়ে কোনো খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে সেদেশে পাঠাতে চায় তাহলে সেগুলো ফুড ড্রাগ এন্ড কসমেটিক অ্যাক্টের ডিলেনি অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী সীমান্তেই আটকে দেয়া হবে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ততোটা জোরালো নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা বরং তাদের চেয়ে ভালো, বিশেষ করে রং ও ওষুধের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। কিন্তু তারপরও ভারতে সোডিয়াম সাইক্লামেট নিষিদ্ধ। থাইল্যান্ডে আইন রয়েছে যে, সেদেশে সোডিয়াম সাইক্লামেট বা এ দিয়ে তৈরি কোনো খাদ্য আমদানি করতে হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমদানিকারককে জিএমপি এক্সপোর্ট সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। ১৯ এপ্রিল ২০০১ তারিখে সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট এজেন্সি সে দেশের খাদ্যে সোডিয়াম সাইক্লামেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। খাদ্য উপাদানের আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণের জন্য গঠিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ কমিটি *কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস্* খাদ্যে সোডিয়াম সাইক্লামেটের ব্যবহার অনুমোদন করে না। আর্জেন্টিনা ২০০৬ সালে সোডিয়াম সাইক্লামেটের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে। এর আগে এটি বিদেশ থেকে আনার ব্যাপারে

নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইন্দোনেশিয়া সরকারও সাইক্লামেট দিয়ে তৈরি যেকোনো খাবার শিশুদের কাছে বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে।

তালিকাটি এভাবে অনেক বড় করা সম্ভব। কারণ বিশ্বের অধিকাংশ দেশই জানে যে সাইক্লামেটের নিয়মিত ব্যবহারে ক্যান্সার ছাড়াও অণ্ডকোষের ক্ষতি হয়, যার ফলে টেস্টোস্টেরন নামের হরমোনটির নিঃসরণ কমে যায়, আবার এর ফলে যৌনআকাঙ্ক্ষা কমে যাওয়া, পুরুষত্বহীনতা, বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা ইত্যাদি দেখা দেয়। তদুপরি সাইক্লামেট মানবদেহের ফুসফুস, লিভার, মূত্রথলিতে টিউমার, হার্টে মায়োকার্ডিয়াল ক্যালসিফিকেশন (হৃদ্-মাংসপেশি শক্ত হয়ে যায় বলে স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হওয়া) সৃষ্টি করে এবং রক্তবাহী ধমনিতে চর্বি জমে।

তবে কোনো কোনো দেশ তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে এখনো সাইক্লামেটকে নিষিদ্ধ করেনি। আবার কেউ কেউ তাদের দেশে সাইক্লামেটের একটি মাত্রা বেঁধে দিয়ে বলেছে যে এর বেশি খাওয়া ঠিক হবে না। যারা এই দৈনিক গ্রহণযোগ্য মাত্রা ঠিক করে দিয়েছে তাদের দেশের মানুষগুলো স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক সচেতন, তাদের সব পণ্যে সব উপাদানের নাম ও পরিমাণ লেখা বাধ্যতামূলক এবং সরকারের পক্ষ থেকে সৎ-দক্ষ মাঠ কর্মকর্তা প্রচুর ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থাও অত্যন্ত কঠোর। তাই যাতে এই দৈনিক গ্রহণযোগ্য মাত্রা কেউ অতিক্রম করতে না পারে সে বিষয়ে ক্রেতা-ভোক্তা, উৎপাদক ও সরকার – এই তিন পক্ষই অত্যন্ত সচেতন। ফলে সাইক্লামেট ব্যবহারে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও কম ও নিয়ন্ত্রিত। এরকম কয়েকটি উদাহরণ –

১৬ জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে লন্ডনের *মিরর* পত্রিকায় জেনেথ নাইট লেখেন যে, ২৮ বছর আগে কৃত্রিম মিষ্টিকারক সাইক্লামেট প্রাণীদেহে অণ্ডকোষকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বীর্যের শুক্রাণু কমিয়ে ফেলে বলে জানা যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা আশংকা করেন যে মানুষের শরীরেও এর ব্যবহারে একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৬৯ সালে তাই ইংল্যান্ডে এটি নিষিদ্ধ করা হয় এবং আমেরিকা ও কানাডায় এটি এখনো নিষিদ্ধ, তবে ইংল্যান্ডে কোনো কোনো খাদ্য ও পানীয়তে এটিকে আবার দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য ইংল্যান্ডে সাইক্লামেট ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়, কেবল অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় থাকলে।

১৯ জুলাই ২০০২ তারিখে ইউরোপিয়ান কমিশনের হেলথ এন্ড কনজিউমার প্রটেকশনের ডিরেক্টর জেনারেল সাইক্লামেটের অনুমোদিত দৈনিক মাত্রা কমানোর জন্য সুপারিশ করেন। সেই সাথে তিনি চুইংগাম ও মুখের দুর্গন্ধনাশক মিষ্টিসহ খাদ্যে সাইক্লামেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেন। তিনি সফট্ ড্রিংকসেও এর ব্যবহার কমিয়ে আনার দাবি জানান।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে ইউরোপিয়ান কমিশনের *ইউরোপিয়ান রিপোর্ট*-এ সাইক্লামেটের অনুমোদিত মাত্রা বিষয়ে বলা হয়, এলকোহলবিহীন পানীয়ে সাইক্লামেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা

উচিত যেমনটি অনেক আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা হয়েছে। সাইক্লামেট ইঁদুরের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে এবং ক্যান্সার তৈরি করে।

ইউরোপের কয়েকটি দেশ, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সাইক্লামেটের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞার বদলে অনুমোদিত দৈনিক মাত্রা প্রতিদিন প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ১১ মিলিগ্রাম নির্ধারণ করে। এই মাত্রাটি খুব বেশি নয়। কিন্তু বাচ্চাদের বেলায় কী হবে? তাদের জন্য তো কেউ আর আলাদা করে রসগোল্লা-চম্‌চম কিংবা আলাদা ড্রিংকস্‌-লজেন্স-চকলেট বানাবে না। তারা তো বড়দেরটার হিসাবেই খাবে, কারণ ব্যবসায়ীরা বড়দের হিসাবেই এগুলো বানাবে। ফলে তাদের দৈনিক গ্রহণযোগ্য মাত্রার অনেকগুণ যে তারা খেয়ে ফেলবে না তা কে নিশ্চিত করবে? তাছাড়া আরো বড় সমস্যা হল আমাদের এখানে কোনো ব্যবসায়ীই তো তার খাদ্যপণ্যে কতটুকু সাইক্লামেট আছে তা কখনো বলেনি এবং এখনো বলছে না। ভবিষতেও যে বলবে এমন কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

তবে সাইক্লামেটের মাত্রা নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে উপাদানটি ক্ষতিকর বলে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে, ক্ষতিকর বলেই এর যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে না, যদি করতেই হয় তাহলে নির্দিষ্ট মাত্রাসীমার মধ্যে করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারও এটিকে ঢালাওভাবে ব্যবহারের অনুমতি কখনো দেয়নি। ১১-৯-২০০২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে সরকারের আমদানি ও রফতানি নিয়ন্ত্রক দফতরের প্রধান নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ দেয়া হয় সোডিয়াম সাইক্লামেট আমদানি ও বাজারজাত নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলি সম্পর্কে জানিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য। সে গণবিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয় প্রতিটি খুচরা প্যাকেটে বাংলায় সোডিয়াম সাইক্লামেট কথাটি এবং একজন মানুষ দৈনিক সর্বোচ্চ কতটুকু পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে তা লিখে রাখার জন্য। এর উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। মানুষ যাতে ব্যবহারের আগেই জানতে পারে যে এটি সেই সোডিয়াম সাইক্লামেট। সেই সাথে মানুষ যাতে বেশি পরিমাণে খেয়ে না ফেলে তার জন্যই এই সাবধানতা। কিন্তু এই সাবধানবাণী লেখা হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশের অন্যতম স্বাস্থ্য গবেষক প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী ১৭-৬-২০০৬ তারিখে *দৈনিক জনকণ্ঠকে* বলেন, 'সোডিয়াম সাইক্লামেট পরিমাণের বাইরে ব্যবহার করলে ক্যান্সার হবেই। সাধারণ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেভাবে স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে তা করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান এখনো এদেশে গড়ে ওঠেনি। এর বিষক্রিয়া সংক্রান্ত টক্সিকোলজিক্যাল গবেষণায় এনিম্যাল এক্সপেরিমেন্টগুলোও এটি ব্যবহারে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কথাই বলে।'

এদেশে সাইক্লামেট বিক্রয়কারীরা বারডেম হাসপাতালের গবেষণা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট এটি অনুমোদন করেছে বলে দাবি করে থাকে। এ ধরনের উদ্ভট দাবি তারা তাদের লেবেলেও উল্লেখ করে। কিন্তু এ দুটো প্রতিষ্ঠানে এরকম

টক্সিকোলজিক্যাল স্টাডি করার মতো উপযুক্ত অবকাঠামো নেই। হেমাটোলজিক্যাল, এনজাইমেটিক ও হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল স্টাডিজ করার কিছু সুবিধা এখানে থাকলেও ক্যান্সার নির্ণয়ের ও অন্যান্য বিষাক্ততা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় *ইন-ভিট্রো* এবং *ইন-ভিভো* সাইটোলজিক্যাল স্টাডিজ, কারসিনোজেনেসিটি স্ক্রিনিং, জিন মিউটেশন টেস্ট, জার্ম সেল স্টাডিজ, ডমিন্যান্ট লিদ্যাল স্টাডিজ ইত্যাদি করার কোনো সুবিধা এগুলোতে কেন, এদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানেই নেই। বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশে থাকার কথাও নয়। তাছাড়া মানুষের শরীরে উপাদানটির নিরাপত্তা চিত্র বুঝতে ক্লিনিক্যাল স্টাডিজ করারও কোনো বিকল্প নেই। সবচেয়ে বড় কথা এধরনের বিষাক্ততা পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগার কথা। কিন্তু সাইক্লামেট ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী তারা নাকি কয়েক সপ্তাহেই এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নিরাপত্তা সনদ পেয়ে গেছেন। ব্যাপারটি রহস্যজনক এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক তদন্ত করলে হয়তো থলের ভেতর কোনো বিড়াল থাকলে তা বেরিয়ে আসত।

এ প্রসঙ্গে ২৩-১০-২০০৭ তারিখের *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকায় বারডেমের বায়েমেডিক্যাল রিসার্চ গ্রুপের সমন্বয়কারী ও প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী বলেন, 'বারডেম কখনোই কোনো পণ্য ব্যবহারের অনুমোদন দেয় না বা অনুমোদন বাতিলও করে না। এ রকম লেখা তথ্যবিকৃতির নামান্তর।'

একই কথা বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের তখনকার পরিচালক প্রফেসর ড. নাজমুল হাসান। এ বিষয়ে একই তারিখে তিনি *প্রথম আলো*তে বলেন যে তাঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানকে সোডিয়াম সাইক্লামেট নিয়ে কোনো সনদপত্র দেননি, একজন অবসরগ্রহণকারী শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে এ সনদ দিয়েছিলেন। তিনি জানান, 'পরে এ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। কোনো প্রতিষ্ঠান পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের নাম ব্যবহার করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর দায়দায়িত্ব নেবে না।'

এর আগে ৮ জুন ২০০৬ তারিখের *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এর প্রথম পাতার প্রথম ক্যাপশন 'ক্যান্সার ঝুঁকির মুখে কোটি কোটি মানুষ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, বিগত সরকারের আমলে কোনো রকম সরকারি কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও এই ইন্সটিটিউটের নাম ও প্যাড ব্যবহার করে একজন প্রবীণ পুষ্টিবিজ্ঞানী সোডিয়াম সাইক্লামেটসহ আরো অনেক পণ্যের দেদার নিরাপত্তা সার্টিফিকেট প্রদান করেন, যদিও এসব পণ্যের নিরাপত্তা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি অবকাঠামো এমনকি কোনো এনিম্যাল হাউসও সেখানে ছিল না। এই কাজের সাথে সেই প্রতিষ্ঠানের আরো কয়েকজন জড়িত ছিলেন এবং অভিযোগ রয়েছে যে কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়াই মানবদেহের জন্য বিষাক্ত বলে পরিচিত অনেক পণ্যই তাঁরা এ যাবত নিরাপদ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, যা দেখিয়ে অসাধু আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা কাস্টমস্ ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের বিতর্কিত পণ্য ছাড় করিয়েছেন। তাদের এই কাজ জনস্বাস্থ্যের জন্য অব্যাহতভাবে ক্ষতিকর হওয়ায় 'ভোক্তা অধিকার আন্দোলন' নামের একটি সংগঠনের পক্ষে

অ্যাডভোকেট বি এ রশীদ ইন্সটিটিউটের তখনকার পরিচালককে উকিল নোটিশ দেয়ার পর তিনি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানান। এ ধরনের সনদ দেয়ার কোনো ক্ষমতা ইন্সটিটিউটের আছে কিনা *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এর জিজ্ঞাসার জবাবে ইন্সটিটিউটের পরিচালক স্বীকার করেন, 'আমাদের এ ধরনের কোনো ক্ষমতা নেই। তাছাড়া এটি পরীক্ষা করার মতো ল্যাবরেটরি সুবিধাও নেই।' যতদূর জানা যায় উকিল নোটিশের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টও জমা দিয়েছেন। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়নি বা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলেও জানা যায়নি।

সাইক্লামেটের বিপুল ক্ষতি অনুধাবন করে বিএসটিআই ২০০৩ সালে এটি নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। কিন্তু কেন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি তা জানা যায়নি। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর বিএসটিআই ২০০৫ সালের ১৬ আগস্ট লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে জানায় 'সোডিয়াম সাইক্লামেট স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়'। কিন্তু এরপরও সরকারি উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। অবশেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্যে ও ওষুধে সাইক্লামেট নিষিদ্ধ করে ২০০৬ সালের ৬ মার্চ।

কিন্তু ২০০৬ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাইক্লামেট খাদ্য ও ওষুধে নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও এটি আমদানি হয়েছে, এমনকি বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের জরুরি অবস্থা ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের পরেও। ১ মে ২০০৭ তারিখে *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকার 'চট্টগ্রাম বন্দরে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ঘনচিনির চালান আটক। এসব ক্যান্সার সৃষ্টিকারী : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়' শীর্ষক খবরে বলা হয় যৌথ বাহিনী বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ৩৮ টন ঘনচিনির (সোডিয়াম সাইক্লামেট) চালান তার আগের দিন আটক করেছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ বলে ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় লিখিত অভিমত দেয়। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম কাস্টমস্ হাউসের একজন যুগ্ম কমিশনার বলেন, 'মাসখানেক আগে সোডিয়াম সাইক্লামেটের এ চালানটি বন্দরে আসার পর আমরা পণ্যের নমুনা পাঠিয়ে এ ব্যাপারে মতামত চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠিয়েছি। জবাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে জানায়, মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে সোডিয়াম সাইক্লামেট দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়ার (ক্রনিক টক্সিসিটি) সৃষ্টি করে, যা মূত্রথলি, কিডনি ও হৃদযন্ত্রে মারাত্মক ক্ষতির কারণ এবং ক্যান্সার তৈরির কারণ হতে পারে।' অবশ্য জনস্বার্থে আটককৃত এই ৩৮ টন সাইক্লামেট নিয়ে পরবর্তীতে কী করা হয়েছে সে বিষয়ে আর কোনো সংবাদ কোথাও দেখা যায়নি।

বড় ও বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর সাইক্লামেট বাংলাদেশের বাজারে এখনো আছে। সোডিয়াম সাইক্লামেট, পটাশিয়াম সাইক্লামেট, ক্যালসিয়াম সাইক্লামেট, সাইক্লামিক এসিড ইত্যাদি বিভিন্ন নামের যৌগ থাকলেও প্রধানত সোডিয়াম সাইক্লামেট যৌগটিই বাংলাদেশে বিক্রি হয়। বিদেশ থেকে আসার সময় উপর্যুক্ত নামগুলো ছাড়াও 'সুকারিল', 'সুগারন', 'সুগারিন', 'সুকরুন',

'সুকরুসা', 'সুসেট', 'সিলান' ইত্যাদি নামেও এটি আসতে পারে। আগেই বলেছি বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো একে 'ঘনচিনি', 'ডায়াবেটিক চিনি', 'পুষ্টি চিনি', 'ডি-সুগার', 'ডি-সুগার (গোল্ড)' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিক্রি করছে। হয়তো ভবিষ্যতে আরো কোনো নতুন নামে বিক্রি করবে। কৃত্রিম মিষ্টিকারক কেনার আগে তাই লেবেলের বাণিজ্যিক নামের পাশাপাশি এর আসল নামটিও দেখে নিন উপর্যুক্ত তালিকার সাথে মেলে কিনা। আগেই সাবধান করে দিচ্ছি আসল নামটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখা থাকবে অত্যন্ত ছোট অক্ষরে, এত ছোট যে প্রায় দেখাই যাবে না, খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে। এর কারণটাও মনে হয় খুব পরিষ্কার, বিক্রেতা কোম্পানিও জানে তারা কী সুখাদ্য বিক্রি করছে! আসল নাম তারা একারণেই ছোট করে লেখে।

গরিব দেশ বলে আমাদের এখানে কোনো খাদ্য উপাদান ক্রমাগত পরীক্ষার সুযোগ নেই। তাছাড়া সঙ্গত কারণেই এ ধরনের পরীক্ষা যুগের পর যুগ ধরে ক্রমাগত চলতে থাকে। আমাদের তাই উন্নত দেশের ল্যাবরেটরিগুলোর প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর নজর রাখতে হয়। তাদের আছে বিষাক্ততা পরীক্ষা বিষয়ক বিশাল অধিকাঠামো ও নিখুঁত মনিটরিংয়ের আন্তরিক ইচ্ছা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে এফডিএ এবং কোডেক্স এলিম্যান্টারিয়াস্ যদি ভবিষ্যতে কখনো সাইক্লামেটের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় তাহলে আমরা বাংলাদেশের জনগণও এটি ব্যবহারের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে সম্মত আছি। তার আগে নয়। ততদিন আসুন আমরা সতর্ক থাকি আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের খাদ্যের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে।

এবার ফরমালিন প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। ফরমালিন রাসায়নিকটি আগে লাশ বা প্রাণীদেহের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হত। এছাড়া বিভিন্ন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে, স্টুডিওতে, ট্যানারি শিল্পে, প্লাস্টিক কারখানায় এটি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা এতকাল বিদেশ থেকে এটি আমদানি করত। তাদের হাত থেকে এই ফরমালিন খোলা বাজারে চলে আসত এবং বাংলাদেশে শুধু মাছই নয়, এমনকি দুধ ও বিভিন্ন ফলমূল সংরক্ষণের জন্যও ফরমালিন লুকিয়ে ব্যবহৃত হত। অথচ সারা পৃথিবীতে কোনো দেশেই ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ফরমালিন মেশায় না। খাদ্যসামগ্রীতে এর ব্যবহার আন্তর্জাতিকভাবেই নিষিদ্ধ। ফলে ক্রেতারা এতদিন এসব খাদ্যসামগ্রী কিনে ক্ষতিগ্রস্ত হত। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এর ক্ষতি হত আরো বেশি। ফরমালিনের ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের লেখালিখি ও সারা দেশের জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে সরকার যে অভিনন্দনযোগ্য কাজটি করেছে তা হল ২০১৩ সালে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে আইন জারি করা। এর মাধ্যমে ফরমালিনের আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং এখন অসাধু ব্যবসায়ীরা আর এটি আমদানি করতে পারছে না। ফলে বর্তমানে মাছ, দুধ, সবজি, ফল ইত্যাদিতে ফরমালিনের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। এই নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় ভবিষ্যতে এগুলোতে ফরমালিনের ব্যবহার অসম্ভব হবে, জনস্বাস্থ্যও রক্ষা পাবে।

ফরমালিন অত্যন্ত বিষাক্ত বলে নিয়মিত ফরমালিনযুক্ত খাবার খেলে শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার হওয়ার আশংকা থাকে। এছাড়া ফরমালিন খাদ্য পরিপাকে বাধা দেয়, পাকস্থলীর ক্ষতি

করে, লিভারের এনজাইমগুলোকে নষ্ট করে এবং কিডনির কোষ নেফ্রনগুলোকে ধ্বংস করে। ফলে গ্যাস্ট্রিক আলসার বাড়ে, লিভার ও কিডনির নানা রকম জটিল ও দুরারোগ্য রোগ দেখা দেয়। মহিলাদের শরীরে ফরমালিন প্রবেশ করলে মাসিক ঋতুস্রাবের সমস্যা দেয়। গর্ভবতী মায়েদের জন্য ফরমালিন আরো ক্ষতিকর, অন্যান্য সমস্যা ছাড়াও এর কারণে গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ হয়। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন এজেন্সি বলেছে ফরমালিন ফুসফুস ও গলবিল এলাকায় ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এর আগে ১৯৮৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার বলেছে ফরমালিন মানবদেহের বিভিন্ন অংশের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ১৯৯২ ও ১৯৯৬ সালে আমেরিকার স্টেট অব ক্যালিফোর্নিয়াও ক্যান্সার সৃষ্টি করে বলে ফরমালিনকে কার্সিনোজেন বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করে। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গলবিল এলাকায় ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য ফরমালিনকে দায়ী করে (সংস্থার প্রেস বিজ্ঞপ্তি নং ১৫৩)। ২০০৫ সালের ১০ ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা পোস্ট পত্রিকায় ফরমালিনযুক্ত মাছ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনা জানা যায়। বড়দের শরীরে ফরমালিনের ব্যবহারে এমন মারাত্মক ক্ষতি হলে অপরিণত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বাচ্চাদের শরীরে কেমন ক্ষতি হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাচ্চাদের খাবারে আরো দু'টি বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি হল কৃত্রিমভাবে পাকানো ফল এবং প্লান্ট গ্রোথ হরমোন দিয়ে ফলানো বড় সবজি। আমাদের শহুরে বাজারে বর্তমানকালে ফল মানেই হল কৃত্রিমভাবে পাকানো ফল। বিশেষ করে কলা, আম ও পেঁপে কিনতে গিয়ে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিকভাবে পরিপক্ক ফল না পাওয়া যেন এক স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। টমেটো যদিও ফল নয়, এটি সবজি, কিন্তু একেও স্বাভাবিক পরিপক্ক পাওয়া দুষ্কর। লোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা ফলগুলো পাকার আগেই বাজারে নিয়ে আসে বেশি লাভ পাওয়ার আশায়। কাঁচা এই ফলগুলো তারা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে কৃত্রিমভাবে দ্রুত পাকিয়ে বিক্রি করে। ফলে এগুলোতে কোনো স্বাদ ও গন্ধ থাকে না, উপরন্তু স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ক্রেতা-ভোক্তারা বাধ্য হয়ে কোনো বিকল্প না পেয়ে এগুলো কেনে। ব্যবসায়ীরাও যখন দেখে যে ক্রেতারা এগুলো কিনছে, এগুলো অবিক্রিত থাকে না, তখন তারা এই কৃত্রিমভাবে পাকানোর কাজ অব্যাহত রাখে। ক্রেতা-ভোক্তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থেই এই চক্র ভাঙা দরকার।

অবশ্য ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা ফল কেনেন তার রঙ দেখে। অথচ কেনা উচিত ছিল তার স্বাদ ও গন্ধ দেখে। স্বাদ না হয় কেনার সময় পরখ করা যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক গন্ধ তো যাচাই করা যায়। অনেকেই তা করেন না। আর করেন না বলেই অসাধু বিক্রেতারা যা খাওয়ায় আমরাও তাই খেতে বাধ্য হই।

ফল বা টমেটোর ব্যাপারিরা যারা ফলের বাগান বা টমেটোর ক্ষেত থেকে এগুলো কিনে নিয়ে যায় তারা এগুলো পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। বরং তারা এগুলো তাড়াতাড়ি বড় হওয়ার জন্য 'প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর' দিতে বলে। এর অন্য নাম 'গ্রোথ প্রমোটার' 'গ্রোথ হরমোন' ইত্যাদি।

গ্রোথ হরমোনে এগুলো তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং ব্যাপারিরা এতেই খুশি, পরিপক্ক হওয়ার আগেই তারা এগুলো জমা করে এক ধরনের রাসায়নিক মেশায় যেগুলো 'আর্টিফিশিয়াল রাইপেনার' বলে পরিচিত। ফলে এক বা দুদিনের মধ্যে এগুলোর গায়ে চমৎকার রঙ আসে এবং বাজারে বিক্রি হয়।

পুষ্টি-স্বাদ-গন্ধ পেতে হলে ফলকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিপক্ক হতে দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবে পাকার সময় ফলের ভেতরে নানা ধরনের অসংখ্য প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যেগুলো ছাড়া পুষ্টি-স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যাবে না। স্তরে স্তরে এই যে পরিবর্তন এর প্রথম পর্যায় হল কোষ বিভাজনের মধ্য দিয়ে ফলটি আকারে ও ওজনে বড় হতে থাকে। ফল পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত এই কোষ বিভাজন চলতে থাকে। কিন্তু তখনো এই পূর্ণতাপ্রাপ্ত ফলটি খাওয়ার উপযুক্ত হয় না অর্থাৎ এতে পুষ্টি-স্বাদ-গন্ধ আসে না। এর জন্য ফলটি পাকার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই পর্যায়ে ফলের কোষগুলো পুনরায় প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নরম ও তরল হতে থাকে, শ্বেতসার ও অম্ল অংশগুলো বিভিন্ন চিনিতে রূপান্তরিত হয়, সুগন্ধি উদ্বায়ী তেলসমূহের জন্ম হয়। একই সাথে সবুজ ক্লোরোফিলগুলো ফ্লাভনয়েডে পরিবর্তিত হয় বলে ফলের ত্বকে হলুদ-কমলা-লাল রঙের আভা দেখা দেয়। ফল যখন এই পর্যায়গুলো সম্পূর্ণ করে তখন এর ত্বকে চমৎকার রঙ তৈরি হয়, সেই সাথে আসে এর পূর্ণ মিষ্টত্ব ও সুগন্ধ। কেবল এই পর্যায়ে এসে ফলের পুষ্টিগুণ তৈরি হয়, তার আগে নয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য ফলকে বোঁটার মাধ্যমে গাছ থেকে প্রাণরস সরবরাহ করতে হয়। একদিন দুদিনে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এর জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়।

কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পাকালে ফল এসব পর্যায় সম্পন্ন করতে পারে না। কারণ পূর্ণতা পাওয়ার আগেই এগুলো গাছ থেকে পেড়ে ফেলা হয়। গাছের প্রাণরস থেকে ফলটি হয় বঞ্চিত। যে রাসায়নিকগুলো কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকায় বলে পরিচিত সেগুলো আসলে ফলকে পাকায় না, এগুলো শুধুমাত্র ফ্লাভনয়েড বা রঙ তৈরি করে, কিন্তু শ্বেতসার অম্ল ইত্যাদিকে ঈপ্সিত প্রাণরাসায়নিক রূপান্তরের পথে নিতে পারে না। এর কারণে এসব ফলে মিষ্টত্ব সুগন্ধ স্বাদ কিছুই থাকে না, পুষ্টিগুণ থাকার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ মিষ্টত্ব সুগন্ধ স্বাদের জন্য দায়ী উপাদানগুলোই পুষ্টি উপাদান। কৃত্রিম উপায়ে পাকানো ফল কিনে তাই ক্রেতা-ভোক্তা প্রতারিত হয়ে থাকেন।

সবজিকে দ্রুত আকারে বড় করার জন্য ব্যবহার করা হয় যে গ্রোথ প্রমোটার, তা প্রাণরাসায়নিক পর্যায় না মেনে কোষ বিভাজন ঘটায় বলে উদ্ভিদ কোষগুলো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তাই কোষের অভ্যন্তরে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপাদানগুলো অনুপস্থিত থাকে কিংবা অসম অনুপাতে থাকে। এর কারণে সবজিগুলো আকারে বড় হলেও থাকে স্বাদহীন-গন্ধহীন, দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং এগুলোতে পুষ্টিগুণের ঘাটতি থাকে।

কৃত্রিমভাবে পাকানোর রাসায়নিক ও গ্রোথ প্রমোটার ব্যবহৃত ফল-সবজি কিনে ক্রেতা-ভোক্তারা শুধু যে প্রতারিত হচ্ছেন তাই নয়, এসব ফল-সবজির স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও অনেক। বলা যেতে পারে এগুলো খেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কৃত্রিমভাবে পাকানো ফল খেলে বমিভাব ও বমি, ডায়রিয়া, রক্তসহ ডায়রিয়া, বুক ও পেটে জ্বলুনি, অতিরিক্ত পিপাসা, দুর্বলতা, ঢোক গিলতে ও কথা বলতে কষ্ট, নিশ্বাসে রসুনের গন্ধ, হাত ও পায়ের অসাড়তা, ঠাণ্ডা ভেজা ত্বক ও রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। নিয়মিতভাবে খেলে এসব উপসর্গ অত্যন্ত খারাপের দিকে চলে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, খোসাতে এসব রাসায়নিক লেগে থাকে বলে যেসব ফল খোসাসহ খাওয়া হয় সেগুলো আরো মারাত্মক বিপর্যয়, এমনকি ক্যান্সার তৈরি করতে পারে। আমাদের দেশে আম-পেঁপে-কলা-টমেটো পাকাতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথ্রেল, প্রফিট, রাইপেন, টমটম ইত্যাদি।

গ্রোথ প্রমোটারগুলোর স্বাস্থ্যগত ক্ষতির পুরো বিবরণ এখনো জানা যায়নি। আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে গবেষণা চলছে এবং এর ক্ষতির চিত্র ও মাত্রা বুঝতে আমাদেরকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে গবেষণা ছাড়াই এটুকু খুব সহজেই বুঝা যায় যে এগুলো সবজি পূর্ণাঙ্গতা পাওয়ার প্রাকৃতিক প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো পরিবর্তন করে দেয় বলে এসব সবজির কোষের গঠন আর স্বাভাবিক সবজির কোষের গঠন একরকম হবে না। কোষ-অভ্যন্তরস্থ উপাদানসমূহের এই পার্থক্য বাচ্চার শরীরেও স্বাভাবিকের চাইতে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। পুষ্টিমান, ভিটামিন ইত্যাদির তারতম্যের বিষয়টিতো অবশ্যই বিবেচ্য। অর্থাৎ বাচ্চা এসব বড় আকারের সবজি খেয়ে যতটুকু পুষ্টি পাওয়ার কথা ততটুকু পুষ্টি বা স্বাদ পাচ্ছে না। এদেশে অনেক ধরনের গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে প্রধান হল ভেজেম্যাক্স, ইডেন, ওকোজিম, মেগাভিট ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কোনো আইনে এভাবে কেমিক্যাল দিয়ে ফল পাকানো বা বৃদ্ধির অনুমোদন নেই। এসব কেমিক্যাল বাংলাদেশে বিক্রিও আইনত বৈধ নয়। ভারত থেকে চোরাই পথে এসব এনে টমেটোক্ষেতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৃত্রিমভাবে পাকানোর রাসায়নিক ও গ্রোথ প্রমোটারগুলো বিজ্ঞান নয়, অপ-বিজ্ঞান। এগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। আসুন, আমাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে ফল ও সবজি কেনার আগে আকার আর রঙ দেখে নয় বরং যাচাই করে কিনি। পছন্দ না হলে বিক্রেতাকে ক্ষোভের কথাটি জানাই ও কেনা থেকে বিরত থাকি। একান্তই বিরত থাকা সম্ভব না হলে কম কিনি বা বিকল্প খুঁজি।

বাচ্চাদের খাবারে টেস্টিং সল্ট ব্যবহারও কম ক্ষতি করছে না। আমাদের বাচ্চাদের প্রিয় ফাস্ট ফুড ও অনেক খাবারে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করা হয় খাবারকে সুস্বাদু করার জন্য। কিন্তু টেস্টিং সল্ট নামে ব্যবহৃত এই রাসায়নিক উপাদানটির নাম মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট বা সংক্ষেপে এমএসজি। শুধু সোডিয়াম গ্লুটামেট নামেও এটি পরিচিত। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এর ক্ষতির কথা

বিবেচনা করে একে 'এক্সাইটোটক্সিন' গ্রুপের মধ্যে ফেলেছেন। এটি স্নায়ুকে উত্তেজিত করে স্বাদের অনুভূতি বাড়ায়, কিন্তু এটি এখন বিষাক্ত বলে পরিগণিত হওয়াতেই এর এমন পরিচিতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সাম্প্রতিককালে একটি নতুন অসুখের নামকরণ করেছেন 'চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিনড্রোম'। চাইনিজ খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু বলে লোভনীয়। সুস্বাদু করার জন্য প্রায় সব চাইনিজ খাবারে এই মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এবং যারা নিয়মিতভাবে চাইনিজ খাবার খান তাদের অধিকাংশের মধ্যে এই অসুখটি দেখা দেয় বলেই এর এমন নামকরণ। এই টেস্টিং সল্ট এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন রকম চিপ্স, বাচ্চাদের সিরিয়াল, চকলেট, বেবি ফুড, সস্, বিস্কুট, বিশেষ করে ক্র্যাকারস্, সলটেড্ ও ভেজিটেবল বিস্কুটে। বলা হয় হরেক রকম স্যুপ, সালাদ ড্রেসিং, আজিনোমতো, বিভিন্ন নামের সস্, ফ্রাইড্ রাইস, ফ্রাইড চিকেন, ফ্রাইড প্রন, প্রন বল, সুইট এন্ড সাওয়ার প্রন, চিকেন-ভেজিটেবল, ফিস-ভেজিটেবল ইত্যাদি চাইনিজ খাবার এবং বাজারে বিক্রিত পটেটো চিপস্সহ অন্যান্য চিপস্, নোনা স্বাদের কিংবা সবজির পাতামেশানো মচ্মচে বিস্কুট বা ফাস্ট ফুডের পিজা, স্যান্ডউইচ, নুডলস্ কিংবা হোটেল-রেস্টুরেন্টের রোস্ট, ফ্রাই, কারি ইত্যাদি দারুণ উপাদেয় খাবারগুলো টেস্টিং সল্ট ছাড়া ভাবাই যায় না। টেস্টিং সল্টের ভোক্তা তাই আমাদের বাচ্চা-বুড়ো সবাই। এই স্নায়ু-বিষাক্ত উপাদানটি বড়দের শরীরেই যখন এটি অনেক ক্ষতি করে তখন বাচ্চারা যে এতে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য।

নিয়মিত ব্যবহারে টেস্টিং সল্ট বাচ্চা ও বড়দের শরীরে যেসব ক্ষতি করে তার মধ্যে রয়েছে বমিভাব, মাথাব্যথা, অনিদ্রা, খাবারে অরুচি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, শরীরের অংশবিশেষের কাঁপুনি, বুকে চাপ অনুভব করা, দুর্বলতা, হাতের তালু ও গলায় জ্বলুনি ইত্যাদি। দীর্ঘদিন ধরে টেস্টিং সল্ট ব্যবহারে স্নায়ুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে একসময় পার্কিনসনস্ ডিজিজ ও আলঝাইমারস্ ডিজিজ নামে স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক অসুখগুলো দেখা দেয়। কারো কারো ক্ষেত্রে নিশ্বাস নেয়ার সময় হাঁপানির মতো শব্দ, বুকে কাঁপুনি, হৃদস্পন্দনের পরিবর্তন, শ্বাস নিতে কষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কেউ কেউ আবার টেস্টিং সল্টে খুব সংবেদনশীল এবং এদের সংখ্যা কম নয়।

গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রেও টেস্টিং সল্ট ব্যবহারে সতর্কতা প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে গর্ভবতী মায়েদের খাদ্য থেকে গ্লুটামেট গর্ভস্থ ভ্রূণের শরীরে পৌঁছায়। সেসময় মগজের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এসব এক্সাইটোটক্সিন বাধা দেয়। ফলে অপূর্ণাঙ্গ মগজ নিয়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। পূর্ণাঙ্গ মগজের চাইতে অপূর্ণাঙ্গ মগজে এক্সাইটোটক্সিনের বিষাক্ততা চারগুণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাচ্চার হরমোন সিস্টেমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ক্ষতি হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে বুঝা যাবে না, কিন্তু বাচ্চা যত বড় হবে, ধীরে ধীরে মগজ ও হরমোনের ক্ষতির প্রকাশও ঘটতে থাকবে। তাছাড়া এক্সাইটোটক্সিনের কারণে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং বাচ্চা উগ্র মেজাজি হতে পারে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে তাই টেস্টিং সল্টজাতীয় এক্সাইটোটক্সিনসমৃদ্ধ খাবার পরিহার করা উচিত।

বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের মাধ্যমে আমাদের সন্তানরা টেস্টিং সল্ট নিয়মিতভাবেই খাচ্ছে এবং তা-ও খুব বেশি পরিমাণে। কোনো কোনো চিপসে টেস্টিং সল্টের মাত্রা তো রীতিমতো ভয়ংকর। অতি লোভনীয় ফাস্ট ফুডকে সুস্বাদু করতে ব্যবহৃত হচ্ছে অতিরিক্ত পরিমাণে টেস্টিং সল্ট। বিদেশি সসের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশি সসগুলোতেও দেয়া হচ্ছে বিপজ্জনক মাত্রায় সোডিয়াম গ্লুটামেট। তেল-চর্বিদার খাবারের বদলে চাইনিজ খাবারের প্রতি আকর্ষণ খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু আমাদের ও আমাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে কী পরিমাণ টেস্টিং সল্ট দৈনিক খাওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

আমরা বলছি না যে এসব খাবার খাওয়া যাবে না। আমরা নিশ্চয়ই এসব উপাদেয় খাবার খাব। কিন্তু তা সীমিত পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসব খাবার একেবারে পরিহার করার প্রয়োজন নেই, তবে তা নিয়মিত খাওয়া উচিত হবে না টেস্টিং সল্ট থাকার কারণেই। যেসব সামগ্রীতে টেস্টিং সল্টের মাত্রা বেশি সেগুলো অবশ্যই পরিহারযোগ্য। চাইনিজ খাবার নিশ্চয়ই খাব, কিন্তু নিয়মিতভাবে খেয়ে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হব না—এই হোক আমাদের নীতি।

টেস্টিং সল্টের ক্ষতির বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ১৯৫৭ সালে। সে বছর *আর্কাইভস্ অব অফথাল্‌মোলজি* নামক জার্নালে (নম্বর ৫৮, পৃষ্ঠা ১৯৩-২০১) সোডিয়াম গ্লুটামেট ইঁদুরের চোখের অভ্যন্তরস্থ নার্ভ লেয়ারকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে বলে অভিযোগ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানীরা ১৯৬০ সালে দেখেন যে বাচ্চা ইঁদুরকে বেশি করে টেস্টিং সল্ট খাওয়ালে তার মগজের স্নায়ুকোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীকালের আরো কিছু গবেষণাতেও একই ফল পাওয়া গেলে প্রবল প্রতিবাদের মুখে উন্নত বিশ্বের বেবিফুড কোম্পানিগুলো বাচ্চাদের জন্য উৎপাদিত সব খাবারে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার বন্ধ করে দেয় (সূত্র : *সেন্টার ফর সাইন্স ইন পাবলিক ইন্টারেস্ট নিউজলেটার*, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। অবশ্য অনুন্নত দেশগুলোতে বাচ্চাদের খাদ্যে এর ব্যবহার কখনোই বন্ধ করা হয়নি।

১৯৬৯ সালে বিখ্যাত *সাইন্স* জার্নালে (নম্বর ১৬৯, পৃষ্ঠা ৭১৯-৭২১) টেস্টিং সল্টকে মস্তিষ্কের নিউরোকেমিস্ট্রি পরিবর্তন, গঠনগত ক্ষতি ও শরীর মোটা হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত *নিউরোফার্মাকোলজি* জার্নালও এই মত সমর্থন করে (নম্বর ২২, পৃষ্ঠা ১৪১৭-১৪১৯)। ১৯৮৯ সালে *নিউরোটক্সিসিটি এন্ড টেরাটোলজি* জার্নাল (নম্বর ১১, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩৭) জানায় যে অতিরিক্ত ও নিয়মিত টেস্টিং সল্ট ব্যবহারকারীর বুকে চাপ অনুভব করা, দুর্বলতা, হাতের তালু ও গলায় জ্বলুনি দেখা দেয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, টেস্টিং সল্টকে অনেক বিজ্ঞানী এক্সাইটোটক্সিন নামে অভিহিত করেছেন। এর কারণ তারা নিয়মিত টেস্টিং সল্ট ব্যবহারীদের মধ্যে এর কারণে সৃষ্ট কিছু স্নায়ুবৈকল্যের সমস্যা যেমন মাথাব্যথা, আধকপালি মাথাব্যথা, খিঁচুনি, স্নায়ুর অস্বাভাবিকতা, শরীরে হরমোন নিঃসরণে গোলযোগ, মনোবৈকল্য, শিশুদের ক্ষেত্রে লেখাপড়ায় কম মনোযোগ, শিশুদের পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া, শিশুদের গভীর মনোযোগের কাজগুলোতে অনীহার ফলে

গণিত ইত্যাদিতে কম নম্বর পাওয়া, শিশুদের অতিরিক্ত ছট্‌ফটানি ভাব, হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া, মুটিয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যা সবই স্নায়ুর ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে। ১৯৯৫ সালে বোকা রেটন থেকে সিআরসি প্রেস প্রকাশিত ইকোনোমিডো ও টুরস্কি লিখিত এবং টি ডব্লিউ স্টোন সম্পাদিত *'নিউরোট্রান্সমিটারস্ এন্ড নিউরোমডুলেটরস্'* বইয়ের ২৫৩-২৭২ পৃষ্ঠা থেকে আরো জানা যায় যে দীর্ঘদিন নিয়মিত টেস্টিং সল্ট ব্যবহারের কারণে স্নায়ুতন্ত্র মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পার্কিনসন্স ডিজিজ ও আলঝেইমারস্ ডিজিজের মতো নিউরোডিজেনারেটিভ অসুখ দেখা দিতে পারে। টেস্টিং সল্টকে একারণেই টক্সিন বা বিষ বলে বিজ্ঞানীরা অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশে যে হারে খাবারে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে কত অসংখ্য মানুষ ও শিশুর স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে।

এক্সাইটোটক্সিন মস্তিষ্কের বিশেষায়িত রিসেপটরে গিয়ে এমনভাবে বিক্রিয়া করে যে সুনির্দিষ্ট কিছু নিউরন বা স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে ফেলে। টেস্টিং সল্টের কারণে উপরোক্ত মারাত্মক ক্ষতিগুলো ঘটার কারণ মস্তিষ্কের উল্লেখিত নিউরনগুলোকে নষ্ট করে ফেলা। আর কে না জানে, নিউরন বা স্নায়ুকোষ একবার ধ্বংস হয়ে গেলে আর কখনোই পুনরুজ্জীবিত হতে পারে না। কেউ কেউ যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেন যে টেস্টিং সল্ট হল সোডিয়াম গ্লুটামেট আর গ্লুটামিক এসিড মস্তিষ্কের জন্য নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে প্রয়োজন। ফলে টেস্টিং সল্ট কিভাবে মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে? এ প্রসঙ্গে ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত জার্নাল *মেডিক্যাল সেন্টিনেল*-এ (ভল্যুম ৪, নম্বর ৬, পৃষ্ঠা ২১২-২১৫) মিসিসিপির প্রখ্যাত নিউরোলজিক্যাল সার্জন ড. রাসেল ব্লেক লিখেছেন, 'গ্লুটামেট অবশ্যই একটি নিউরোট্রান্সমিটার, কিন্তু তা থাকে অতি সামান্য মাত্রায় কোষ-বহিঃস্থ তরলে, যার পরিমাণ কিছুতেই ৮ থেকে ১২ মাইক্রোমোলের চাইতে বেশি নয়। এটাই স্বাভাবিক মাত্রা। টেস্টিং সল্ট খাওয়ার ফলে কোষ-বহিঃস্থ তরলে এই ট্রান্সমিটারের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ফলে তখন নিউরনগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে যায়। নিউরনের কাজ হল বৈদ্যুতিক আবেশ 'ফায়ার' করা। অতিরিক্ত উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলে তাই নিউরনগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ফায়ার করতে থাকে, যার বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় একসময় কোষগুলো মরে যায়। উদ্দীপনা বা এক্সাইটমেন্টের কারণে মরে যায় বলে এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'এক্সাইটোটক্সিসিটি' অর্থাৎ তাদেরকে না মরা পর্যন্ত উদ্দীপ্ত করা হয়।

কিন্তু টেস্টিং সল্ট শুধুমাত্র মস্তিষ্কের নিউরন বা স্নায়ুকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না। এটি শরীরে হরমোনের তারতম্যও ঘটায়। এ সমস্যাটিও কম মারাত্মক নয়। এ বিষয়ে ১৯৬৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল *সাইন্স* (নম্বর ১৬৫, পৃষ্ঠা ৭১৯-৭২১) এক গবেষণার ফলাফলে জানিয়েছে, এমএসজি খাওয়ানো ইঁদুরগুলো যে বাচ্চা প্রসব করে সেগুলো ছিল অস্বাভাবিক মোটা ও বেঁটে। এদের পিটুইটারি, থায়রয়েড, এড্রিনাল ইত্যাদি অঙ্গগুলো ছিল অপূর্ণাঙ্গ। তাদের জননেন্দ্রিয়গুলোও তাই। সঙ্গত কারণেই পরবর্তীকালে শারীরতাত্ত্বিক পরীক্ষায় তাদের থায়রয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (টিএসএইচ), গ্রোথ হরমোন, ল্যুটিনাইজিং হরমোন (এলএইচ), ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন

(এফএসএইচ) ও এড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (এসিটিএইচ) কম ছিল। এসব ইঁদুরের মগজ পরীক্ষা করে আর্কুয়েট নিউক্লিয়াসে ক্ষত দেখা যায়, সেই সাথে এদের হাইপোথ্যালামিক নিউক্লি বিনষ্টের চিহ্নও পাওয়া যায়।

আমাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নিয়ে আরো একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গুঁড়া মশলার ভেজাল। *দৈনিক আমাদের সময়* ২৯ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে তখনকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদ প্রকাশ করে যে, এসব মসলায় ক্ষতিকর লেড ক্রোমেট, মেটানিল ইয়েলোসহ বিভিন্ন টেক্সটাইল কালার, ইট, কাঠ, ভুট্টা ও চালের গুঁড়া ব্যাপকভাবে মেশানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে তারা জানায় এসব ভেজাল মসলার কারণে মানুষের শরীরে প্রায় ৫০ ধরনের বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। তারা আরো জানায় যে, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণায় তারা মসলাতে সাইপারমেথ্রিন ও ডায়াজিননের মতো মারাত্মক বিষাক্ত কীটনাশকেরও মাত্রাতিরিক্ত অস্তিত্ব চিহ্নিত করেছে। দুবাই সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি তাদের পরীক্ষাতেও বাংলাদেশের গুঁড়া মসলাতে ভেজাল ও কীটনাশক পেয়েছে এবং এ কারণে তারা এদেশের বেশ কয়েকটি নামকরা কোম্পানির রপ্তানিকৃত মসলার চালান ফেরত পাঠিয়েছে। পত্রিকাটি আরো জানিয়েছে যে বিএসটিআই, সাইন্স ল্যাবরেটরি, সিটি কর্পোরেশন ও মহাখালী জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বাজারের গুঁড়া মসলা পরীক্ষা করে অখাদ্য জাতীয় নানা দ্রব্য মিশ্রণের প্রমাণ পেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মসলা আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি কোম্পানি মোট ৯২ কোটি টাকার পেপরিকা ও মেটানিল ইয়েলো আমদানি করেছে। পেপরিকা হল মরিচের গুঁড়া আর মেটানিল ইয়েলো হল কাপড়কে হলুদ রং করার রাসায়নিক। মরিচের গুঁড়া না হয় আমদানি হয় প্যাকেটজাত করে বিক্রি করার জন্য, কিন্তু মেটানিল ইয়েলো নামক টেক্সটাইল কালারটি মসলাতে কী প্রয়োজন নকল হলুদের গুঁড়া তৈরি করা ছাড়া?

বাংলাদেশে বছরে দেড় থেকে দু' হাজার কোটি টাকার মসলা বিক্রি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশের যেখানে প্রয়োজন বার্ষিক ২৬ লাখ টন মসলা, সেখানে দেশে উৎপাদিত হয় মাত্র ১৪ লাখ টন। বাকি মসলার জন্য আমাদেরকে বিদেশ-নির্ভর হতে হয়।

একইভাবে *দৈনিক ইনকিলাব* ৭ জুলাই ২০০৭ তারিখে জানায় দেশের গুঁড়া মসলা প্রস্তুতকারক অনেক কোম্পানিই বেশি লাভের আশায় হলুদের গুঁড়ায় মিশিয়ে দিচ্ছে লেড ক্রোমেট, মেটানিল ইয়েলো, সানসেট ইয়েলো কিংবা অরেঞ্জ ইয়েলো। পত্রিকাটির মতে ভারতের নাগপুরের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির পরিচালক ড. জয় সোয়াল হলুদ মরিচ ও জিরার গুঁড়ায় টেক্সটাইল কালার মেশানোর প্রমাণ পেয়েছেন। ড. সোয়ালও হলুদের গুঁড়ায় মেটানিল ইয়েলো ও লেড ক্রোমেট পেয়েছেন।

গুঁড়া হলুদে ভেজাল মেশানোর পর আসল হলুদের মতো আকর্ষণীয় করতে মেশানো হচ্ছে যে লেড ক্রোমেট, বিজ্ঞানীরা একে একটি বিষ বলেই জানেন। এটি রক্ত, কিডনি, ফুসফুস, স্নায়ুতন্ত্র ও

ঝিল্লির জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। নিয়মিত খেলে এটি এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিনষ্ট করে দেবে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ব্যবহারে এটি নির্ঘাত ও প্রমাণিত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (সূত্র: *যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওসেনিক এন্ড এটমোস্ফিয়ারিক এডমিনিস্ট্রেশন*)। ঠাণ্ডা পানিতে এটি তেমন রং না দিলেও গরম পানিতে উজ্জ্বল হলুদ, একেবারে আসল হলুদের মতো রং দেয়। এটি মেয়েদের জননেন্দ্রিয়ের ক্ষতি করে এবং গর্ভস্থ শিশুর বিকলাঙ্গতা ঘটাতে পারে। চোখে লাগলে এটি চোখে জ্বালা সৃষ্টি করে (স্বাভাবিক হলুদে যা হয় না), এমনকি কর্নিয়ার ক্ষতি করতে পারে (সূত্র: *সাইন্সল্যাব.কম*, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। উন্নত দেশের টক্সিকোলজির বইগুলোতে দৈবাৎ কেউ এটি খেয়ে ফেললে কী করতে হবে তার বিবরণ রয়েছে। যেমন রোগীকে বমি করানো যাবে না। চিৎ করে শোয়াতে হবে, টাই, কলার, বেল্ট ইত্যাদি ঢিলা করে দিতে হবে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হচ্ছে কিনা লক্ষ করতে হবে। সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখ লাগিয়ে রোগীকে কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে। ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা তো নিতে হবেই। সেসব দেশে তাই এটি একটি রেগুলেটেড রাসায়নিক। আর আমাদের দেশে একশ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ীদের কারণে অধিকাংশ গুঁড়া হলুদের মাধ্যমে আমরা অহরহ এই বিষ খেতে বাধ্য হচ্ছি।

জাতিসংঘের *ইন্টারন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ ইনফরমেশন সেন্টারের* মতে লেড ক্রোমেটকে গর্ভবতী মা, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের থেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ উপরোক্ত ক্ষতিসমূহ ছাড়াও এটি অস্থিমজ্জার মারাত্মক ক্ষতি করে, ফলে রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া এন্‌সেফালোপ্যাথি হওয়ার কারণে এদের খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। পেটে ব্যথা ও কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়াও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও এটি বাধা দেয়।

লেড ক্রোমেটের লেড বা সিসাই হল প্রধান সমস্যা। প্রখ্যাত শিশু চিকিৎসা বিষয়ক জার্নাল *পেডিয়াট্রিক্স* (ভল্যুম ১১৬, নম্বর ২, আগস্ট ২০০৫) সংখ্যা বলেছে মসলাতে সিসা থাকলে তা মারাত্মক 'চাইল্ডহুড লেড পয়জনিং' তৈরি করতে পারে। মসলাতে এই সিসা আরো আসতে পারে জমিতে সিসাযুক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে। এই সিসার কারণে অনেক শিশু, এমনকি প্রাপ্তবয়স্কের, মৃত্যুর ঘটনা বিজ্ঞানীরা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে সিসার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের বেলায় ক্ষতির মাত্রা বেশি হওয়ার কারণ শিশুদের ওজন কম হওয়াতে প্রতি কেজি শরীরে সিসার ঘনত্ব বেশি হওয়া। 'চাইল্ডহুড লেড পয়জনিং' ঘটলে কারো কারো ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সামনের লোবগুলোসহ অন্যান্য অংশের ক্ষতি হয় বলে শিশুটির কিছু দৃশ্যমান ও ব্যবহারগত বৈসাদৃশ্য দেখা দেয়, যা শিশুটি বড় না হওয়া পর্যন্ত হয়তো অভিভাবকরা বুঝতে পারবেন না। এগুলো স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগের কারণে হয় এবং এসব লক্ষণ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হলেও এসব বৈসাদৃশ্য থেকেই যাবে। বাংলাদেশের কত শিশু এভাবে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হচ্ছে তা হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না।

শিশুদের শরীরে সিসার বিষক্রিয়া বিষয়ে *ব্রিটিশ মেডিক্যাল বুলেটিন* (৬৮: ১৬৭-১৮২, সাল ২০০৩)-এর মতে 'তাদের শরীরে সিসা প্রবেশের পর অন্ত্রনালী থেকে প্রায় সবটুকুই বিশোষিত

হয়ে ব্লাড-ব্রেইন বেরিয়ার দ্রুত পার হয়ে যায় বলে ক্ষতিটাও প্রাপ্তবয়স্কদের চাইতে বেশি হয়। শিশুদের শরীরে সিসা প্রবেশের পর তা দ্রুত বের করার ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ অতি সামান্য পরিমাণ সিসাও তাদের স্নায়ুতন্ত্রের যা ক্ষতি করে তা আগের ধারণার চাইতেও বেশি।' ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এ সাবধানবাণী শোনার পর আমাদের শিশুদের ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি! হায়, মসলার ভেজাল বন্ধ করা যাচ্ছে না, কেউ তা বন্ধ করছে না, জেনেশুনে আমাদের শিশুদের মুখে আমরা প্রতিদিন বিষ তুলে দিচ্ছি!

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রকাশনা *স্ট্রিট ফুডস্* (প্রকাশনা নম্বর ১৭/১৮, ১৯৯৬) অনুযায়ী মানসিক সক্রিয়তার অভাব, মস্তিষ্কের ক্ষতি, পক্ষাঘাত, গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ইত্যাদি লেড ক্রোমেটের অন্যতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত দিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য যেসব রং ব্যবহার করা হয় সেগুলোও খাদ্যে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত কোনো রং নয়, সেগুলো সবই কাপড়ে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত টেক্সটাইল কালার, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

ভারতের হায়দরাবাদে অবস্থিত *ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন* ৩১ জুলাই ২০০৫ তারিখে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে জানিয়েছে গুঁড়া হলুদে মেশানো মেটানিল ইয়েলো নামক রংটি খেলে ত্বক চাকা চাকা হয়ে ফুলে যাওয়া, বিভিন্ন রকম এলার্জি, নাক দিয়ে অবিরত পানি পড়া, বমি ভাব, বমি এবং কারো কারো ক্ষেত্রে হাঁপানি দেখা দিতে পারে। এছাড়া এতে গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ হওয়া, অপরিসীম ক্লান্তি, ঝিমুনি, রক্তে হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি ঘটতে পারে। এছাড়া দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি তো রয়েছেই।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মেটানিল ইয়েলো এছাড়াও লিভার ক্যান্সারের একটা বড় কারণ হতে পারে কারণ পরীক্ষাগারে ইঁদুরের শরীরে তারা এই প্রবণতা দেখেছেন। *ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি* (সেপ্টেম্বর ২০০১, ভল্যুম ৩৯, নং ৯, পৃষ্ঠা ৮৪৫-৫২) অনুযায়ী উপরোক্ত আশংকা সত্য, কারণ মেটানিল ইয়েলো লিভারে এন-নাইট্রোসোডাইইথাইলএমাইন তৈরি করে যা হেপাটোকার্সিনোজেনেসিসের মাধ্যমে টিউমার সৃষ্টি করে। জার্নালটি বলেছে, এ ধরনের ভেজাল জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। আরেকটি বিখ্যাত জার্নাল *টক্সিকোলজি লেটারস্* (ভল্যুম ১১৬, ইস্যু ১-২, ২৭ জুলাই ২০০০, পৃষ্ঠা ১১৯-১৩০) একই মত ব্যক্ত করে বলেছে গুঁড়া হলুদে ব্যবহৃত এই রংটি লিভারে টিউমার সৃষ্টির সময় অস্বাভাবিক হারে কোষের বৃদ্ধি ঘটায়।

গুঁড়া মরিচে ভেজাল দেয়ার জন্য যে উজ্জ্বল লাল রংটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তার নাম সুদান রেড। এই রংটি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেই ১৯৬৪ সালে বলেছে যে, এটি মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় কোনো খাবারে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। সংস্থা একই কারণে এই রংটিকে বিষাক্ততা মূল্যায়নে 'ক্যাটাগরি-ই' অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ রংয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে (সূত্রঃ *হু টেকনিক্যাল রিপোর্ট সিরিজ, ১৯৬৫, নং ৩০৯*)।

পরবর্তীতে ক্যান্সার-ঝুঁকির কারণে সুদান রেড রংটির সব যৌগ (অর্থাৎ সুদান ১, সুদান ২, সুদান ৩, সুদান ৪) পৃথিবীর উন্নত সব দেশেই খাদ্যে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। *ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার* সুদান রেডকে সুর্নির্দিষ্টভাবে কার্সিনোজেন বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। এটি শুধুমাত্র জুতা, পেট্রল, মোম, জ্বালানি তেল, চুল, মেঝে ইত্যাদি রঙ করার কাজেই ব্যবহার করা হয়।

ভালো লাল শুকনা মরিচ গুঁড়া করলে এমনিতেই টক্‌টকে লাল পাউডার পাওয়া যায়। এর সাথে কোনো কৃত্রিম লাল রং মেশানোর প্রয়োজন হয় না। তবে জমি থেকে মরিচ তুলে তা শুকানোর সময় ময়লা লাগে। মেশিনে গুঁড়া করার সময় ভালো মরিচের সাথে এসব ময়লা মরিচ এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া মরিচও গুঁড়া করা হয়। এমনকি মরিচের বোঁটাও ফেলা হয় না। এসব কারণে গুঁড়া মরিচের রং ঈপ্সিত রকম লাল হয় না। ফলে উজ্জ্বল লাল করার জন্য এতে সুদান রেডসহ বিভিন্ন টেক্সটাইল কালার মেশানো হয়। ফুড কালারও মেশানো যেত, কিন্তু টেক্সটাইল কালারের দাম অত্যন্ত কম বলে ক্ষতিকর হলেও তা-ই মেশানো হয়।

আমাদের দেশে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত শুকনা মরিচ হয় না বলে কোম্পানিগুলো গুঁড়া মরিচ বিদেশ থেকে আমদানি করে বাংলাদেশে প্যাকেটজাত করে। যেসব দেশ থেকে গুঁড়া মরিচ আমদানি করা হয় তারা তাদের পণ্যের রং উজ্জ্বল করার জন্যও সুদান রেড মেশাতে পারে। ইতোমধ্যে ভারত ও উজবেকিস্তান থেকে রপ্তানি করা গুঁড়া মরিচের চালানে বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষ সুদান রেডের উপস্থিতি বহুবার চিহ্নিত করেছে।

আম-কমলার তথাকথিত জুসগুলো মূলত কৃত্রিম, কিন্তু প্যাকেটের গায়ে 'কৃত্রিম জুস' কথাটি লেখা থাকে না। এগুলোতে আম-কমলার উপযুক্ত উপস্থিতি নেই। পুরো প্যাকেটে পুরোটা আম-কমলার রস হলে স্বাভাবিকভাবেই এগুলোর দাম অনেক বেশি হত। এগুলোতে আম-কমলার মতো কৃত্রিম রং টেক্সটাইল কালার এবং আম-কমলার কৃত্রিম সুগন্ধ দিয়ে কৃত্রিম আম ও কৃত্রিম কমলার জুস বানানো হয়। এগুলো মিষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয় কৃত্রিম সুইটেনার সোডিয়াম সাইক্লামেট। ফলে এসব তথাকথিত আম-কমলার জুস বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়। বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে বাচ্চারা যেন এসব তথাকথিত জুস নিয়মিতভাবে খেতে শুরু না করে সে বিষয়ে সতর্ক হোন। কারণ বাচ্চাদের লিভার-কিডনি-অস্থিমজ্জা-ফুসফুস সবই অপরিণত বলে ক্ষতিকর উপাদানগুলো বড়দের চাইতেও বাচ্চাদের ক্ষতি করে বেশি।

বাজারে এখন বেশ কিছু এনার্জি ড্রিংকস্ বিভিন্ন নামে পাওয়া যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে এগুলো বাচ্চাদের জন্য নয়, প্রবীণদের জন্যও নয়। কারণ এর অতি উচ্চমাত্রার সুগার ও ক্যাফেইন উপাদান। নিষিদ্ধ কোনো উত্তেজক বা এলকোহল অর্থাৎ মদ এগুলোতে মেশানো হয় কিনা তা চূড়ান্তভাবে জানার জন্য আমাদেরকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে বাংলাদেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এগুলোর কোনো কোনোটিতে অতি

উচ্চমাত্রার বা বিপজ্জনক মাত্রার ক্যাফেইনের পাশাপাশি যৌনউত্তেজক উপাদানের উপস্থিতি নির্ণয় করেছে। কী সাংঘাতিক! বাংলাদেশের শহর-গ্রামে এখন যে হারে

ইভ টিজিং ও ধর্ষণ বেড়েছে তার পেছনে এসব যৌনউত্তেজক তথাকথিত এনার্জি ড্রিংকসের ব্যবহারও অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।

কেউ যদি ভেবে থাকেন যে আমাদের দেশে তৈরি পণ্যগুলোতেই শুধু ভেজাল থাকে, অতএব এগুলোর বদলে বিদেশি খাদ্যসামগ্রী ব্যবহার করাই ভালো তাহলে ভুল করবেন। আমাদের দেশে অনেক আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রীতেও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এসব উপাদানের মধ্যে ক্ষতিকর রং, ক্ষতিকর টেস্টিং সল্ট এবং ক্ষতিকর কৃত্রিম মিষ্টিকারক প্রধান। অনেক সময় এগুলোতে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ থাকে না। ব্যবহৃত সবগুলো উপাদানও তারা অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ করে না। খুচরামূল্য লেখা না থাকা এদের আরেক কারসাজি। তারা আমাদের দেশের কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অনুপস্থিতি ও দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থার পুরো সুযোগ নেয়। তাই বিদেশি খাদ্যসামগ্রী কেনার সময়ও সতর্কতার সাথে দেখেশুনে কেনার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের বাচ্চারা আমাদের আদরের ধন। আমরা নিজেরা সৎ-অসৎ পুরুষ-মহিলা যা-ই হই, কিন্তু যার যার সন্তানদের প্রতি আমরা সবাই আন্তরিক। সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক কোনো ক্ষতি হোক তা আমরা কেউ চাই না। আমাদের বাচ্চারা সুস্থভাবে বড় হোক তা-ই আমরা চাই। কিন্তু আমরা যারা বাবা-মা, আমাদের অসচেতনতা ও তথ্য না-জানা এবং কর্তৃপক্ষীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের দুর্বল পরিকল্পনা ও ততোধিক দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা, সেই সাথে দুর্নীতির কারণে আমাদের বাচ্চারা আজ অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ খাবার খেতে পারছে না। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব পরিবারের বাচ্চারাই আজ স্বাস্থ্যহানিকর অনিরাপদ খাবারের শিকার। তাই এই সমস্যা আজ একটি জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে।

সরকার বিশুদ্ধ খাবারের ব্যাপারে আন্তরিক। এজন্য সরকার বিশুদ্ধ খাদ্য আইনকে সময়োপযোগী করেছেন, ভোক্তা অধিকারকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য অধিদপ্তর সৃষ্টি করেছেন, সর্বস্তরে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য একটি কর্তৃপক্ষও গঠন করেছেন। সরকারকে এজন্য অভিনন্দন জানাই। পৃথিবীর অনেক দেশেই এসব আইন-দপ্তর-কর্তৃপক্ষ নেই। সে হিসেবে আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে আছে। কিন্তু শুধুমাত্র অফিস আর কর্মকর্তা দিয়ে গতানুগতিক পদ্ধতিতে এগিয়ে আমরা এই গুরুতর ও ব্যাপক সমস্যার সমাধান করতে পারব না। এসব জায়গায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদেরকে ব্যাপকভাবে নিয়োগ ও দায়িত্ব দিলে অবস্থার উন্নতি হতে বাধ্য।

পৃথিবীর উন্নত ও উন্নত হতে চায় এমন সব দেশে যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাকে সেখানে নিয়োগ দেওয়া হয়। কারণ সমস্যাগুলো যখন হয় অত্যন্ত টেকনিক্যাল তখন কেবল টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরাই এগুলোর সমাধান করতে পারেন, যদি তারা আন্তরিক হন। এভাবেই দেশগুলো সমস্যার সমাধান করছে।

আমাদের দেশের ভেজাল নিরোধ-সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো থেকে দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। তাই এসব অফিস যখন সরকারি বিপুল পরিমাণ টাকার অপচয় করে বিজ্ঞাপন দেয় কত ডিগ্রি তাপে মাংস রান্না করতে হয় কিংবা কত ডিগ্রি ঠাণ্ডায় মাংস সংরক্ষণ করতে হয়, তখন বিষয়টি হাস্যকর হয়ে যায়। কারণ বাংলাদেশের মানুষ থার্মোমিটার ছাড়াই এতকাল ধরে মাংস রান্না ও সংরক্ষণ করে এসেছে, কোনো সমস্যা হয়নি। সবাইকে বুঝতে হবে যে আমাদের সমস্যাটা থার্মোমিটারের নয়, সমস্যাটা ভেজালের। এরকম 'পর্বতের মূষিক প্রসব' বাংলাদেশের মানুষ আর দেখতে চায় না।

[লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ; সাবেক চেয়ারম্যান, ফার্মেসি বিভাগ; সাবেক ডিন, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আহ্বায়ক, জাতীয় ওষুধনীতি ২০১৬ প্রণয়ন উপ-কমিটি।
ফোন: ০১৮৩ ০০০ ২৮২৬ ই-মেইল: abmfaroque@yahoo.com]

বিষমাখা লিচু ও নিহত শৈশব

পা ভে ল পা র্থ

শিশু বিষয়ে লেখা চলতি আলাপখানি নিদারুণভাবে পুরোটাই *'শিশু চিন্তা জগতের'* বাইরের, একেবারেই ধারেকাছেরও নয়। কিন্তু নির্দয় ও দুঃসহ কায়দায় বাংলাদেশের শিশুদের চলমান বেড়ে ওঠা কি জীবনমরণের অনেকটাই জড়িয়ে আছে এই দুঃসহ যন্ত্রণাময় আলাপ। এই আলাপ কোনোভাবেই *'শিশুতোষ'* কোনো কিছু নয়, এমনকি *'ছেলে বা মেয়েভুলানো ছড়া গীতও'* এখানে নেই। নেই রূপকথা বা শিশুদের কার্টুন কি কমিকস। চলতি আলাপখানি শিশুমৃত্যু ঘিরে এক বিষমাখা শৈশবের বিচারহীন দগদগে ক্ষতের। নয়াউদারবাদী কর্পোরেট দুনিয়ার ঔপনিবেশিক লোভ বাংলাদেশের শিশুদের উপর এই ক্ষত অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্র কি সকল এজেন্সি এই জুলুম তরতাজা রাখছে। বাংলাদেশের শিশুবেলা কি শৈশব আজ বহুজাতিক বিষ কোম্পানির কাছে বন্দি। এখানে লিচু খেলে মরতে হয়, এই মরণের কোনো বিচার হয় না। কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। কোনো জবাবদিহিতা কি একটা জিজ্ঞাসাও নেই। কর্পোরেট বিষে লাগাতার শিশুমৃত্যুর এই অন্যায় খতিয়ান থেকে যেন জোর করে সকল 'জিজ্ঞাসা চিহ্ন' মুছে ফেলা হয়েছে।

চীনের গোয়াংডং প্রদেশ ও হাইনান দ্বীপের বর্ষারণ্যে লিচু প্রাকৃতিকভাবে জন্মালেও উষ্ণম-লীয় এ চিরসবুজ বৃক্ষ বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, ব্রাজিল, পশ্চিম আফ্রিকা ও পাপুয়া নিউগিনি অঞ্চলে ফলের জন্য চাষ করা হয়। বাংলাদেশের এক এক অঞ্চল এক এক ভৌগোলিক নির্দেশনার জন্য খ্যাত। দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও লিচু অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দেশে নানান জাতের লিচুর ধরন থাকলেও বর্তমানে

বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় বারি লিচু-১, চায়না-১, চায়না-৩, বোম্বাই, মঙ্গলবাড়ি, বেদানা ও মোজাফ্ফরি জাতের লিচু। ২০১৫ সনে দিনাজপুরে ৪ হাজার ৫৭ হেক্টর জমিতে ৫,২৯৮টি বাগানের ৬ লাখ ৪৫টি লিচুগাছে লিচু উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩,২২৭ মেট্রিক টন। লিচু মৌসুমে লিচুতে ফুল আসার সাথে সাথে দিনাজপুরের সকল লিচুবাগান বাৎসরিক হিসেবে কিনে ফেলে ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফল ব্যবসায়ীরা। ফুল আসা

থেকে শুরু করে মুকুল পর্যায়, ফল পাকানো থেকে শুরু করে পরিবহন ও বিক্রি পর্যন্ত লিচুতে প্রয়োগ করা হয় নানান মাত্রার রাসায়নিক বিষ। কখনো এগুলো কীটনাশক, কখনো উদ্ভিদ হরমোন এবং কখনো কার্বাইড ও ফরমালিন জাতীয় রাসায়নিক। দিনাজপুর অঞ্চলের লিচুবাগানগুলোতে সবচে বেশি ব্যবহৃত হয় বায়ার ক্রপ সায়েন্স, সিনজেনটা, বিএএসএফ, করবেল কেমিকেল ইন্টারন্যাশনাল, ইনতেফা নামের কর্পোরেট কৃষি কোম্পানির সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক। মুকুল থেকে শুরু করে ফলের আকার বড় করা এবং সবশেষ ফলের পচনরোধে ফরমালিনে চুবানো হয়। লিচুবাগানে বিষ স্প্রে করার সময় অনেক লিচু ঝরে পড়ে, এসব বিষমাখা লিচু খেয়ে দিনাজপুর অঞ্চলে লাগাতার খুন হচ্ছে আমাদের শিশুরা। ২০১২ সনে ১৩ জন এবং ২০১৫ সনের জুন পর্যন্ত ১১ জন। অন্যায় এ শিশুমৃত্যু নিদারুণভাবে নিশ্চুপতা আর বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে বন্দি হয়ে আছে। রাষ্ট্রপক্ষ, প্রশাসন, কর্তৃপক্ষ, করপোরেট বিষ কোম্পানি, মানবাধিকার সংগঠন, শিশু সংগঠন, মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক বলয়, গণমাধ্যম কি নাগরিক প্রতিক্রিয়া সকলেই বিষমাখা লিচু খেয়ে একের পর এক শিশুমৃত্যুকে নিদারুণভাবে মেনে নিয়েছে। কোনো বিচার নেই, কোনো আওয়াজ নেই। কারো বুকে এই একটুখানি দরদও উছলে ওঠেনি গরিব শিশুদের নিথর দেহগুলোর প্রতি। আমরা তাহলে কেমনতর মানবিক সভ্যতার বিকাশ করে চলেছি?

জুন ২০১৫

২০১৫ সনের ২৯ মে থেকে ২০ জুন পর্যন্ত দিনাজপুরে বিষমাখা লিচু খেয়ে নিহত হয়েছে ১১ শিশু। তবে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) ভাষ্য, ১১ শিশুর ভেতর ৮ জনের মৃত্যুর কারণ কীটনাশক মানে বিষমাখা লিচু খেয়ে মৃত্যু (সূত্র: *প্রথম আলো*, ২৩ জুন ২০১৫)। বীরগঞ্জ উপজেলার ধূলট গ্রামের ফুলকুমার (২), সেন গ্রামের শামীমা (৫), সাদুল্ল্যাপাড়া গ্রামের স্বপন আলী (৬) ও সনকা গ্রামের মামুন (৫)। বিরল উপজেলার নূরপুর গ্রামের মিনারা (আড়াই), মাদকবাটি গ্রামের সামিউল (দেড়) ও সাকিব (৩)। খানসামা উপজেলার আঙ্গারপাড়া গ্রামের রেমি (৪), কাহারোল উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের ইয়াসমীন (সাড়ে চার), পার্বতীপুর উপজেলার জুড়িল গ্রামের জেরীন (৫) এবং চিরিরবন্দরের দোগনবাড়ি গ্রামের আবু সায়েম (৪)। বীরগঞ্জের সাদুল্ল্যাপাড়া গ্রামের নিহত স্বপন আলীর মা দিনমজুর, বাবা পুরনো কাগজ বিক্রি করে। তাদের বাড়িটি লিচুবাগানের ধারে, প্রায় চারশ লিচুগাছ। ২০১৫ সনের ২ জুন লিচুবাগানে এমন বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয় আশেপাশের মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসে। ভয়াবহ ঝাঁঝালো গন্ধ আর চোখমুখ জ্বালা করতে থাকে। বাগান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া লিচু খায় স্বপন আলী। রাতে খিঁচুনি দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, ৩ জুন দিনাজপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ওইদিনই সে মারা যায়। বিরলের মাদকবাটি গ্রামের সামিউলের মা-বাবা লিচুবাগানের দিনমজুর। ১৮ জুন লিচু খেয়ে ওইদিনই বিরল হাসপাতালে ভর্তি হয় ও মারা যায় এই দেড় বছরের শিশু। নিহত সকলের ঘটনাই একই রকম, স্বাস্থ্যসমস্যাগুলোও একই ধরনের। লিচু খাওয়ার চব্বিশ

ঘণ্টার ভেতরেই সবার মৃত্যু ঘটেছে। লিচু খেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসছে অনেক শিশু। সকলের ভেতরেই আতংক।

জুন ২০১২

কী ঘটেছিল ২০১২ সনে? নির্দয়ভাবে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ২০১২ সালের জুন মাসেও কীটনাশক প্রয়োগ করা লিচু খেয়ে মারা যায় ১৪ জন শিশু (সূত্র : *দ্য ডেইলি স্টার*, ২৮ জুন ২০১২)। কীটনাশক ব্যবহার করা লিচু খেয়ে দিনাজপুরে ১৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে জানান (সূত্র: *প্রথম আলো*, ২৯ জুন ২০১২)। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ২৭ জুন ২০১২ তারিখে একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। কলেজের পরিচালকের স্বাক্ষরিত ওই তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, ১ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের শিশু ওয়ার্ডে মোট ১৫ জন শিশু ভর্তি হয় এবং ১৩ জন মারা যায়। ঘটনার পরপরই রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) একটি প্রতিনিধিদল দিনাজপুর আসে এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানায়, কীটনাশকের বিষক্রিয়াই শিশুমৃত্যুর কারণ। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁওয়ের নিহত শিশুদের সকলেরই আবাস লিচুপ্রধান অঞ্চলে। আক্রান্ত হওয়ার আগে কুড়িয়ে ও এলাকার বাগান থেকে লিচু খেয়েছিল নিহত শিশুরা। এদের সকলেরই বয়স মাত্র দুই থেকে দশ বছরের ভেতর।

কবি নজরুলের লিচুবাগানে আজ বিষ-বাণিজ্যের প্রহরী

আমাদের চারধারের উদ্ভিদ কি প্রাণীরাজ্যের সকলেই কোনো না কোনো উদ্ভিদ কি প্রাণীপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কোনো একটি উদ্ভিদ পরিবারে থাকে অসংখ্য 'গণ', আর একটি গণের অধীনে থাকে অসংখ্য প্রজাতি। আমরা যে কলা খাই, প্রায় সকল কলাই 'Musa' গণের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু সব কলার প্রজাতি এক নয়। রামকলা (*Musa ornata* Roxb.), কাঁচাকলা (*Musa paradisica* L.), কাঁঠালীকলা (*Musa sapientum* L.) কি আইট্টাকলা (*Musa sapientum* L. var. *sylvestris*) প্রজাতি ভেদে কলাদের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামও ভিন্ন ভিন্ন। সব কলাই আবার Musaceae নামের এক উদ্ভিদ পরিবারের অংশ। প্রকৃতিতে কোনো কোনো সময় একটি পরিবারে কেবলমাত্র একটি প্রজাতি বা একটি গণ, একটি গণের অধীনে একটিই মাত্র প্রজাতি দেখা যায়। তখন সেসব প্রজাতি, গণ ও পরিবারকে 'একক বৈশিষ্ট্যের (Monotypic) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জীবন্ত জীবাশ্ম হিসেবে পরিচিত গিংকো বাইলোবা তেমনি একটি প্রজাতি, যার আর কোনো ভাই-বোন স্বজন প্রতিবেশী নেই। প্রজাতিটি *Ginkgo* গণের এবং Ginkgoaceae পরিবারের একমাত্র সদস্য। আমাদের মধুমাসের খুব পরিচিত ফল লিচুও তেমনি একটি 'একক প্রজাতি', Sapindaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত Litchi গণের ভেতর লিচুই (*Litchi chinensis* Sonn) একটিমাত্র প্রজাতি। ফরাসি প্রকৃতিবিদ পিয়েরে সোনেরাত ১৭৮২ সালে তাঁর ইন্দো-চীন অঞ্চল ভ্রমণের ভেতর দিয়ে লিচুকে সনাক্ত করেন। চীনের গোয়াংডং প্রদেশ ও হাইনান দ্বীপের বর্ষারণ্যে

লিচু প্রাকৃতিকভাবে জন্মালেও উষ্ণমণ্ডলীয় এ চিরসবুজ বৃক্ষ বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, ব্রাজিল, পশ্চিম আফ্রিকা ও পাপুয়া নিউগিনি অঞ্চলে ফলের জন্য চাষ করা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম লিচু থেকে ৬৬ কিলোক্যালরি শক্তি, ১৬.৫ গ্রাম শর্করা, ১.৩ গ্রাম আঁশ, ০.৪ গ্রাম চর্বি, ০.৮ গ্রাম আমিষ, ৭২ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায় (সূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/Lychee)। উপরের খোসাটি ফেলে দিয়ে লিচু বীজের উপরের ঘোলাটে সাদা বর্ণের রসালো যে অংশটি আমরা খেয়ে থাকি তা হল এরিল বা বীজত্বক অংশ। লিচু বাদেও ডালিম, কাউ, লটকন ফলেরও এরিল অংশই আমরা খেয়ে থাকি। ফল বাদেও লিচুর গাঢ় খয়েরি বর্ণের বীজ অর্ধেক করে নারিকেল পাতার শলা গেঁথে গ্রাম-বাংলার শিশুরা খেলনা লাটিম বানায়। লিচুর কচি পাতা ও গাছের বাকল গ্রামীণ কবিরাজি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। লিচুগাছে পিঁপড়া, মৌমাছি, ফড়িং, ভিমরুল, মাকড়সাসহ নানান জাতের পতঙ্গ বাসা বানায়। লিচু মৌসুমে মৌমাছিদের মাধ্যমে ব্যাপক পরাগায়ণ ঘটে এবং লিচুর ফলন ও আকার বেড়ে যায়। পাশাপাশি লিচুফুল থেকে সংগৃহীত মৌচাকের মধুতে লিচুর মতোই স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। বাদুড়, চামচিকা ও ছোট পাখিরা লিচুফুলের রস ও ফল খেতে আসে বলে গ্রামে লিচু মৌসুমে পুরো গাছ মশারি বা মাছধরার জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে দেখা যায়। অনেকে লিচুগাছে টিন ও ঘণ্টা বেঁধে রাখে আর তার সাথে থাকে একটা লম্বা পাটের দড়ি। ঘরের ভেতর থেকেই এই দড়ি ধরে টান দিলে শব্দ হয় বলে বাদুড় কি পাখিরা ভয়ে চলে যায়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'লিচুচোর' কবিতাটি হয়তো অনেকেরই মুখস্থ। লিচু চুরি করতে গিয়ে ডানপিটে শিশুদের দল কী কাণ্ডটাই না করেছিল! কিন্তু নিদারুণভাবে বাংলাদেশের শিশুরা সেই 'লিচুময় শৈশব' হারিয়ে ফেলছে। কবি নজরুলের বাবুদের তালপুকুরের লিচুবাগানে কুকুর আর মালী ছাড়া ভয়ের কেউ ছিল না। কিন্তু এখনকার লিচুবাগানগুলো সয়লাব হয়ে আছে বিষাক্ত সব রাসায়নিকে। বিষমাখানো লাল টসটসে লিচু চলে আসছে আমাদের শিশু কি প্রবীণের হাতে।

বিষময় শৈশব ও চব্বিশখান নিথর শরীর

লিচু নিয়ে উপরের ভূমিকাটুকু টানা হয়েছে, আবারো এটি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য, যে, লিচু একটি খাওয়ারযোগ্য সুস্বাদু মৌসুমি ফল। লিচুর মধ্যে এমন কোনো রাসায়নিক উপাদান নেই যা মানুষ বা কোনো প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে বা কাউকে ভয়ংকরভাবে অসুস্থ করে তুলতে পারে। কিন্তু নির্দয়ভাবে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ২০১২ সালের জুন মাসে কীটনাশক প্রয়োগ করা লিচু খেয়ে মারা গেছে ১৪ জন শিশু (সূত্র : *দ্য ডেইলি স্টার*, ২৮ জুন ২০১২)। *দৈনিক প্রথম আলো* জানিয়েছে, কীটনাশক ব্যবহার করা লিচু খেয়ে দিনাজপুরে ১৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন (২৯ জুন ২০১২)। বিষয়টি নিয়ে *দৈনিক সমকাল* ২৯ জুন ২০১২ তারিখে তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেছে, জুন মাসের প্রথম ২০

দিনে দিনাজপুরের বিভিন্ন উপজেলায় আকস্মিকভাবে মারা যাওয়া ১৪ শিশু লিচুতে ছিটানো বিষক্রিয়ার শিকার—স্বাস্থ্য অধিদফতরের এই নিশ্চয়তা আমাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতেরই অশনিসংকেত। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সিভিল সার্জন ডা. মো. মউদুদ হোসেন স্বাক্ষরিত 'অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত মৃত শিশুর' একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত তালিকায় ১ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট ১২ জন শিশুর নাম-ঠিকানা-বয়স উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ২৭ জুন ২০১২ তারিখে আরো একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। কলেজের পরিচালকের স্বাক্ষরিত ওই তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, ১ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের শিশু ওয়ার্ডে মোট ১৫ জন শিশু ভর্তি হয় এবং ১৩ জন মারা যায়। বাকি দুজন চিকিৎসার পর বাড়ি চলে যায়। নিহতের পরিবার, হাসপাতাল, গ্রামবাসী ও সাংবাদিকদের ভাষ্য অনুযায়ী দিনাজপুরের বিরল উপজেলার মহেশপুর গ্রামের ৪ বছর ৬ মাস বয়সী শিশু নিভাকে অসুস্থ অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় ১ জুন ২০১২ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে। ওইদিনই নিভা বিকাল ৭.১৫ মিনিটে মারা যায়। নিভাকে ভর্তি করানোর পরপরই দুপুরের দিকে ভর্তি হয় দিনাজপুরের বিরল উপজেলার মহেশপুর গ্রামের ৪ বছরের সায়লা। সায়লাও ওইদিনই রাতেই মারা যায়। ৬ জুন মারা যায় দিনাজপুরের বিরলের মাধববাটির ২ বছরের শিশু বোরহান। ৮ জুন মারা যায় দিনাজপুরের বিরলের রুনিয়া গ্রামের নূর কিবরিয়া (৪) এবং বিরলের যশরাল গ্রামের সাগর (৪)। ৯ জুন মারা যায় দিনাজপুর সদরের সুন্দরবন গ্রামের নার্গিস (৬)। ১৪ জুন মারা যায় ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জের বইরচুনা গ্রামের আড়াই বছরের তাপসী। দিনাজপুর সদরের পারগাঁও গ্রামের ২ বছরের নয়ন সরেন মারা যায় ১৬ জুন। দিনাজপুর সদরের আকবারপুর গ্রামের ধনঞ্জয় (৫) এবং খানসামা উপজেলার রেজাউল (৬) মারা যায় ১৭ জুন। দিনাজপুর সদরের বড়ইল গ্রামের সুবর্ণা (৫) এবং দিনাজপুরের চিরিরবন্দরের কিষাণবাজার এলাকার তাজমীর (১০) মারা যায় ২০ জুন। যদিও তাজমীরকে ১৫ জুন ২০১২ তারিখে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সর্বশেষ ২৫ জুন তারিখে দিনাজপুরের চিরিরবন্দরের নান্দেড়াই গ্রামের আড়াই বছরের শিশু ফরহাদকে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয় ২৪ জুন ২০১২ তারিখে। ওইদিনই ফরহাদ মারা যায়। ১৫ জুন দিনাজপুরের বিরলের যশরাল গ্রামের সুজনকে (৪) হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং ২৬ জুন সে মোটামুটি সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যায়। মূলত ১ জুনই সবচে' বেশি আক্রান্ত শিশু ভর্তি হয় শিশু ওয়ার্ডে। ওইদিন ভর্তি হওয়া নিভা ও সায়লা মারা গেলেও দিনাজপুরের বীরগঞ্জের ভবানীপুর গ্রামের ২ বছরের ছোট্ট আলামিন সুস্থ হয়ে ১০ জুন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। দেখা যাচ্ছে, দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ৫ জন, সদরের ৪ জন, চিরিরবন্দরের ২ জন, খানসামার ১ জন শিশু নিহত হয়েছে এবং ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জের একটি শিশু নিহত হয়েছে।

ঘটনার পরপরই রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) এশটি প্রতিনিধিদল দিনাজপুর আসে। আইইডিসিআরের পরিচালক মাহমুদুর রহমান জানান, আক্রান্তদের রক্ত, মলমূত্র ও লালার নমুনা পরীক্ষা এবং অভিভাবক ও এলাকাবাসীর দেওয়া তথ্য পর্যালোচনার পর প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, কীটনাশকের বিষক্রিয়াই শিশুমৃত্যুর কারণ। পাশাপাশি তিনি এ-ও জানান, বিষয়টি নিশ্চিত হতে আক্রান্তদের রক্তের নমুনা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টার 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন বা সিডিসিতে' পাঠানো হচ্ছে। পরীক্ষার ফল জানতে আড়াই থেকে তিন মাস সময় লাগবে (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ জুন ২০১২)। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁওয়ের নিহত শিশুদের সকলেরই আবাস লিচুপ্রধান অঞ্চলে। এরা আক্রান্ত হওয়ার আগে কুড়িয়ে ও এলাকার বাগান থেকে লিচু খেয়েছিল। এদের সকলেরই বয়স মাত্র দুই থেকে দশ বছরের ভেতর। নিহতদের পরিবারসমূহ কৃষিজীবী ও দিনমজুরির উপরে নির্ভরশীল। নিহত শিশুরা এমনিতেই অপুষ্টিতে ভুগছিল, কারোর স্বাস্থ্যই তেমন একটা সবল ও সুস্থ ছিল না। নিহত শিশুদের অঞ্চলে লিচু মৌসুমে লিচুগাছ ও বাগানে ব্যাপক পরিমাণে নানান ধরণের বিষ ছিটানো ও স্প্রে করা হয়। সকালে স্প্রে করে দুপুরেই গাছ থেকে ফল পেড়ে বিভিন্ন জায়গায় চালান দেয়া হয়। স্প্রে দেয়ার সময় কি ফলপাড়ার সময় কিছু লিচু ঝরে পড়ে যায় মাটিতে। আশেপাশের গরিব শিশুরা বাগানমালিকের পাহারা ফাঁকি দিয়ে এসব বিষমাখানো ফল কুড়িয়ে খায়। অনেক সময় দেখা যায় মাত্র বিষ স্প্রে করা বিষের ঝাঁঝালো গন্ধলাগা ভেজা লিচুও অবোধ শিশুরা কুড়িয়ে নেয়। লিচুর খোসা থেকে বিষ তাদের চোখে-মুখে যায় এবং চোখমুখ-শরীর জ্বালাপোড়া করে এবং লিচু খাওয়ার পর অনেকেরই পেটব্যথা করে। কখনো কখনো ছোট বাচ্চাদের বমি ও পাতলা পায়খানা করতে দেখা যায়। ২০১২ সনে বিষ প্রয়োগ করা লিচু খেয়ে ২৪ জুনের ভেতর নিহত ১৩ শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা অধিকাংশই লিচুবাগানে খেলতে খেলতে কুড়িয়ে লিচু খাওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। কেউ কেউ ঘুম থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড পেটব্যথায় চিৎকার দিয়ে ওঠে। অধিকাংশেরই শরীরে ভয়ংকর খিঁচুনি ছিল। প্রত্যেকেই বারবার শরীর এলিয়ে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল। অনেকেরই কথা জড়িয়ে গেছে। প্রায় সকলেরই মুখ দিয়ে লালা ও শ্লেষ্মা ঝরেছে। বমি বমি ভাব ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে নিহত শিশুরা নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে বলে যে ধারণা করা হয়েছিল পরীক্ষণে তা ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ আক্রান্ত ও নিহত কারোর শরীরে জ্বর ছিল না। না জেনে না বুঝে অবোধ শিশুরা বিষপ্রয়োগ করা লিচু খেয়ে আক্রান্ত হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার ভেতরেই মারা গেছে। দুজন সুস্থ হয়েছে হাসপাতালে প্রায় দশদিন জীবনমরণ লড়াই করে।

নয়াউদারবাদী ব্যবস্থা ও লিচুভর্তি রিপকর্ড

বাংলাদেশের এক এক অঞ্চল এক এক ভৌগোলিক নির্দেশনার জন্য খ্যাত। দেশের দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও লিচু অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দেশে নানান জাতের লিচুর ধরন থাকলেও

বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় বারি লিচু-১, চায়না-১, চায়না-৩, বোম্বাই, মঙ্গলবাড়ি ও মোজাফ্ফরি জাতের লিচু। দিনাজপুর জেলায় মোট ৩৭০৬ একর জমিতে বাণিজ্যিক লিচুবাগান গড়ে উঠেছে। এর ভেতর বিরল উপজেলাতেই আছে ১৬০৬ একর লিচুবাগান। বিরল উপজেলাই দেশের লিচুঘন অঞ্চল। লিচু মৌসুমে লিচুতে ফুল আসার সাথে সাথে দিনাজপুরের সকল লিচুবাগান বাৎসরিক হিসেবে কিনে ফেলে ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফল ব্যবসায়ীরা। ফুল আসা থেকে শুরু করে মুকুল পর্যায়, ফল পাকানো থেকে শুরু করে পরিবহন ও বিক্রি পর্যন্ত লিচুতে প্রয়োগ করা হয় নানান মাত্রার রাসায়নিক বিষ। কখনো এগুলো কীটনাশক, কখনো উদ্ভিদ হরমোন এবং কখনো কার্বাইড ও ফরমালিন জাতীয় রাসায়নিক। দেখা গেছে বাগানমালিকের কাছ থেকে কিনে নেয়া লিচুগাছের ফলগুলো বাঁচাতে ব্যবসায়ীরা হন্যে হয়ে পড়েন। কোন বিষে কে বাঁচল আর কে মরল এসব তারা কখনোই তোয়াক্কা করেন না। অনেক বাগানমালিক ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের খাওয়ানোর জন্য আলাদা কিছু গাছ রেখে দেন যেসব গাছে কোনো বিষ প্রয়োগ করা হয় না। দিনাজপুর অঞ্চলের লিচুবাগানগুলোতে সবচে বেশি ব্যবহৃত হয় বায়ার ক্রপ সায়েন্স, সিনজেনটা, ইনতেফা নামের কর্পোরেট কৃষি কোম্পানির সাইপারম্রেথ্রিন গ্রুপের বিষ ও হরমোন। বিরলের লিচুবাগানগুলোতে ব্যাপকহারে বায়ার ক্রপ সায়েন্স কোম্পানির রিপকর্ড নামের সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের এ রাসায়নিকটি ব্যবহৃত হয়। সাইপারমেথ্রিন রাসায়নিকটি ১৯৭৪ সালে প্রথম আলাদা করা হয় এবং কর্পোরেট শেল কোম্পানি ১৯৭৭ সালে এটি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি শুরু করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সাইপারমেথ্রিনকে একটি মাঝারি ঝুঁকির কীটনাশক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রিপকর্ডের ব্যবহার মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব তৈরি করে। মুখ দিয়ে লালা ঝরা, পেটব্যথা, খিঁচুনি, শরীর অবশ হয়ে যাওয়া ও মূর্ছা যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে রিপকর্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে। দিনাজপুরে বিষমাখা লিচু খেয়ে লাগাতার শিশুর করুণ মৃত্যুর জন্য সাইপারমেথ্রিন কি লিচুবাগানে ব্যবহৃত সকল ধরনের কর্পোরেট রাসায়নিক বিষ-বাণিজ্যই দায়ী।

সাইপারমেথ্রিন শুধু মানুষেরই ক্ষতি করে না, সাইপারমেথ্রিন যেখানে প্রয়োগ করা হয় সেখানকার মৌমাছি, প্রজাপতিসহ সকল পতঙ্গ মরে যায়। লিচুর পরাগায়ণের জন্য মৌমাছির বিকল্প নেই, তাই কোনোভাবেই লিচুগাছে সাইপারমেথ্রিন ব্যবহার করা উচিত নয়। সাইপারমেথ্রিন ছোট মাছসহ জলাভূমির জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি মাটির বাস্তুসংস্থানকে নষ্ট করে ফেলে, মাটিস্থ অনুজীবের বসতি বিনাশ করে। সাইপারমেথ্রিন ব্যবহারের পর এর অবশেষ মাটিতে গিয়ে জমা হয় যা মাটির এমোনিয়া-সংশ্লেষ ও নাইট্রেট-সংশ্লেষ বাড়িয়ে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। গাছের বাকল ও মাটিতে সাইপারমেথ্রিনের রাসায়নিক অবশেষের ক্রিয়া প্রায় সাত মাস পর্যন্ত স্থায়ী থাকতে পারে (সূত্রঃ http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/cypermet.htm)। বিষপ্রয়োগ করা লিচু খেয়ে তরতাজা ১৩ শিশুর করুণ মৃত্যু হল। অথচ এ ঘটনায় মামলা কি বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হল না। কোনো রাজনৈতিক দল এমন করুণ মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াল না। কারণ

এ মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানে বিষবাণিজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। নয়াউদারবাদী কর্পোরেট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। এমন হিম্মত ও শিরদাঁড়া লীগ কি দল কার আছে? তা-ও মরেছে রোগাপটকা গরিব চাষামজুরের বাচ্চা। ধনীর আলালের ঘরের দুলালেরা মারা গেলে হয়তো শহরের রাস্তায় কিছু ভ্রাম্যমাণ আদালতের গাড়ি ছুটত, কিছু ধড়পাকড় হত। নির্মম এ ঘটনায় আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখলাম মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কি মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নির্লজ্জের মতো কোনো রা করলেন না। নাকি অতিশোকে থ হয়ে রইলেন? আশ্চর্যরকমভাবে ১ জুন হতে একটার পর একটা বাচ্চা মরতে থাকল সরকারি হাসপাতালে, অথচ গণমাধ্যমও বিষয়টি প্রচার করল শেষ বাচ্চাটি মরার পর। পয়লা জুনের মৃত্যুর পরপরই সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা উচিত ছিল। লিচুবাগান অঞ্চলে মাইকিং করে বিষ বন্ধের ঘোষণা দেয়া যেত বা প্রচারণার ভেতর দিয়ে শিশুদের সাবধান করা যেত। তাহলে হয়তো চোখের সামনে প্রশ্নহীনভাবে ২৪ জন অবুঝ লাশ দেখতে হত না।

রাষ্ট্র কার? বিষ কোম্পানির না শিশুদের?

বিষাক্ত লিচু খেয়ে মরতে হবে এমন কোনো তথ্য নিহত শিশুদের জানা ছিল না। জানা ছিল না মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন। লিচুতে ব্যবহৃত বিষগুলো নিহত শিশুদের পরিবার উৎপাদন করেনি। এমনকি বাংলাদেশ সরকারও নয়। এসব উৎপাদন ও বাণিজ্য করছে মূলত কিছু করপোরেট কোম্পানি। লিচুবাগানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবহৃত এসব সর্বনাশা বিষ ব্যবহারের বৈধতা রাষ্ট্র দিয়েছে কোম্পানিগুলোকে। আর তাই লাগাতার ব্যবহৃত হচ্ছে বিষ, বাড়ছে কোম্পানির মুনাফা, মরছে গরিব শিশু। দিনাজপুর অঞ্চলের লিচুবাগানগুলোতে সবচে বেশি ব্যবহৃত হয় বায়ার ক্রপ সায়েন্স, সিনজেনটা, বিএএসএফ, করবেল কেমিকেল ইন্টারন্যাশনাল, ইনতেফা নামের কর্পোরেট কৃষি কোম্পানির সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক। বিএসএফ কোম্পানির রিপকর্ড ১০ ইসি ও বাসাথ্রিন ১০ ইসি এবং সিনজেনটা কোম্পানির সিম্বুস ১০ ইসি। লিচুগাছে মুকুল গুটি আসার পরপরই ফাইটোনল ও এ্যাগ্রোমিন জাতীয় কীটনাশক স্প্রে করা হয়। গাছে মুকুল ধরার পর স্প্রে করা হয় এন্ডাসালফেন, এক্ষেত্রে বায়ার ক্রপ সায়েন্সের থায়োডিন ৩৫ ইসি ব্যবহৃত হয়। ম্যালাথিয়ন গ্রুপের কট, টিভো, ফাইটার ব্যবহৃত হয়। কার্বেন্ডাজিন গ্রুপের নইন পাউডার, এন্টাকল, ইন্টারফল, ব্যাভিস্টিন এবং ম্যানকোজেব গ্রুপের ভায়াথিন, করোজেব ডাব্লিউ পি ও ডায়াথেন এম ৪৫ ব্যবহৃত হয়। বায়ার ক্রপ সায়েন্স কোম্পানির থায়োডান ৩৫ ইসি, এসিআই ফর্মুলেশন লিমিটেডের কট, টিভো ও ফাইটার। বিএএসএফের ব্যাভিস্টিন ডিএফ, করবেল কোম্পনির করোজেব ৮০ ডাব্লিউপি, বায়ার ক্রপ সায়েন্সের ডায়াথেন এম ৪৫। লিচুর ফল মোটা ও আকারে বড় করার জন্য ব্যবহৃত হয় নাফা, ওকোজিম, ফ্লোরা, ট্রমিস্ট্রিন, জিংক, প্রাস, জাদা নামক বৃদ্ধিকারক রাসায়নিক হরমোন। লিচুবাগান পরিচর্যার জন্য বাগানে বায়ার ক্রপ সায়েন্সের ডেসিস ও বেল্ট, ইনতেফার জুবাস ব্যবহৃত হয়। গাছের মুকুল ও ফল ধরে রাখবার জন্য সেমকো

কোম্পানির রিটোসেন, এসিআই'র ফ্লোরা, ম্যাকডোনাল্ডের মেগনোল ব্যবহৃত হয়। লিচুতে সিনজেনটা কোম্পানির ক্যারাটে ও ফোর্স ২০ সিএস-এর মতো সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের বিষও স্প্রে করা হয়। লিচু পাকানো ও একধরনের উজ্জ্বল লালরঙের জন্য ব্যবহৃত হয় কার্বাইড এবং সর্বশেষ লিচু বিক্রির আগে চুবানো হয় ফরমালিনে। বাজারে এভাবেই রসালো লিচু আর তার নিজস্ব প্রাকৃতিক রস নিয়ে বিক্রি হয় না, টইটুম্বুর হয়ে থাকে করপোরেট কোম্পানির নানা বিষের উপাদানে। একবার স্মরণ করা জরুরি, কেবলমাত্র নিহত শিশুরাই নয়, পুরো বাংলাদেশ গিলে চলেছে এই সর্বনাশা বিষমাখা লিচু। বিষমাখা লিচু খেয়ে যারা মরেছে তারা হয়তো দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে 'রেহাই' পেয়েছে. কিন্তু বিষমাখা লিচু জীবিতদের শরীরে কী ধরনের প্রতিকারহীন প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তার হিসাব কে করছে?

নিহত শৈশবের রাজনৈতিক সুরক্ষা

জাতীয় কৃষিনীতিতে (১৯৯৯) উল্লেখ আছে, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন ফসলের বিরাজমান জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা। খাদ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা (সূত্র : উদ্দেশাবলি ও খাদ্য পুষ্টি উন্নয়ন, অনুচ্ছেদ-২,১৬, জাতীয় কৃষি নীতি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ১৯৯৯)। জাতীয় খাদ্য
নীতি (২০০৬) -এর লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, দেশের সকল জনগণের ক্ষেত্রে সকল সময়ের জন্যই স্বনির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করা (সূত্র : লক্ষ্য, জাতীয় খাদ্য নীতি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ২০০৬)। ১৩ অক্টোবর ২০০৮ সন থেকে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' কার্যকর হয়। মোট ৭টি অধ্যায়ে ৮২টি মূল ধারাসহ গৃহীত এই জনগুরুত্বপূর্ণ আইনের ২৭ নং ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয়েছে, *কোনো দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরি, কারখানা বা গুদামে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোনো পণ্য বিক্রয় বা উৎপাদিত হইতেছে কিংবা গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হইলে, মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্ত দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরি, কারখানা বা গুদাম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।* হাইকোর্ট ২০১২-এর ফেব্রুয়ারিতে ফলে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানোর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলাসহ চার দফা নির্দেশনা জারি করেছিল। ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক মেশানো বন্ধের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতের কিছু নড়াচড়া মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে। কিন্তু এসব ফল কি শাকসব্জি যখন বাগান কি ক্ষেতে থাকছে তখনই সেখানে ব্যবহৃত হয় সবচে বেশি সর্বনাশা বিষ। জমি কি বাগানে রাসায়নিক প্রয়োগ বন্ধের বিরুদ্ধে এখন থেকেই রাষ্ট্রকে কঠোর হতে হবে। প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দোষীদের বিচার করতে হবে। দিনাজপুরের নিহত শিশুদের এক পরিবারে আমি উজবুকের মতো প্রশ্ন করেছিলাম,

আপনারা কি কোনো ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? নিহত শিশুর মা-বাবা রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, এত ছোট বাচ্চার জন্য কি সরকার কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়? যার জিনিস সে নিয়া গেছে, এখন আর কানলি হবে? যার যায় সে জানে সে কী হারিয়েছে। বিষমাখা লিচু খেয়ে প্রশ্নহীনভাবে নিহত ২৪ শিশুর হারানো শৈশবের দোহাই থেকেই দেশব্যাপী শুরু হোক কর্পোরেট বিষবাণিজ্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম। জানি না, বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশন, কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিশু একাডেমি এই শিশুসুরক্ষার এ সংগ্রামে সামিল হবে কিনা!

ঋণস্বীকার

- নিহত শিশুদের পরিবার ও স্বজন, দিনাজপুর। ফলের দোকানদার ও লিচুবাগানের সাথে সংশ্লিষ্টজন।
- আসাদুল্লাহ্ সরকার, *দৈনিক প্রথম আলো*, দিনাজপুর।
- রবীন্দ্রনাথ সরেন, সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ। মইনুদ্দীন চিশতী, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠক, দিনাজপুর।
- *http://en.wikipedia.org/wiki/Lychee*
- লিচু চোর, কাজী নজরুল ইসলাম
- *দ্য ডেইলি স্টার*, ২৮ জুন ২০১২
- *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ জুন ২০১২
- *দৈনিক সমকাল*, ২৯ জুন ২০১২
- *প্রথম আলো*, ২৩ জুন ২০১৫

- সিভিল সার্জন ডা. মো. মউদুদ হোসেন স্বাক্ষরিত 'অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত মৃত শিশুর' তালিকা, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর। ১৭ জুন ২০১২
- পরিচালক স্বাক্ষরিত Report of encephalitis patient June 2012 তালিকা, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর। ২৭ জুন ২০১২
- *http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/cypermet.htm)*
- জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯
- জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯

দ্রষ্টব্য: ২০১২ সনের জুনে লেখা *'বিষমাখা লিচু ও নিহত শৈশব'* এবং ২০১৫ সনের জুনে লেখা *'মানবাধিকার কমিশন সমীপে ১১ শিশুর শরীর'* লেখা দুটি চলতি আলাপের মূল।

[লেখক: গবেষক ও লেখক। animistbangla@gmail.com]

স্বাধীন রাষ্ট্রে ‘বিজয়শিশু’

সা ব্বি র খা ন

যুদ্ধ পৃথিবীর প্রাচীনতম বিবাদের মধ্যে একটি। এতে ক্ষয় হয় ‘সভ্যতা আর মানবতা’। মানুষ জন্ম নেয়, সেই সঙ্গে অবধারিত হয় তার মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যুকে মেনে নেয় সবাই। অস্বাভাবিক মৃত্যু কষ্ট দেয় আজীবন, দগ্ধ করে মনের অচিন গহিনে, নিভৃতে; এটাই রীতি। যুদ্ধের মৃত্যু অথবা ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকা হয় অত্যন্ত অস্বাভাবিক মাত্রার পীড়াদায়ক। যারা যুদ্ধে মারা যান, তাঁরা শহিদ হন। আর যাঁরা যুদ্ধের ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকেন, তাঁরা হাজারবার ‘শহিদ’ হন প্রতিদিন—প্রতিনিয়ত!

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সামরিক জান্তার চাপিয়ে দেওয়া দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশে শহিদ হয়েছিলেন ৩০ লাখ নিরীহ বাঙালি, ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন প্রায় পাঁচ লাখ অসহায় নারী। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিলেন নিরপরাধ হাজার হাজার শিশু, যাঁরা ‘যুদ্ধশিশু’ নামেই পরিচিত। তাঁদের অনেককে দত্তক হিসেবে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন। অনেকে রয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের এখানে-সেখানে। তাঁদের যুদ্ধ আজও থামেনি; জীবনের যুদ্ধ, বেঁচে থাকার যুদ্ধ, একাত্তরের অধিকারের যুদ্ধ!

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের একজন বিজ্ঞ প্রসিকিউটর। অত্যন্ত মেধাবী ও তুখোড় প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এক সন্ধ্যায়। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পথ ধরেই বলছিলেন ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিভিন্ন কাজকর্মের কথা যে খুব সহজ নয়, তা আগেই জেনেছিলাম। কিন্তু তা কতটা কঠিন, বোঝা গেল তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। পৃথিবীতে যত যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়েছে, তার বেশির ভাগ হয়েছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার খুব কাছাকাছি সময়ে। সে কারণে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাপরাধের সাক্ষ্য, তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেলেও কোনো যুদ্ধশিশুকে আজ অবধি কোনো বিচারের সাক্ষী হতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হয়েছে যুদ্ধের প্রায় ৪০ বছর পরে। সময়ের এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এই প্রথমবারের মতো প্রসিকিউটর তুরিন চেয়েছিলেন অন্তত একজন যুদ্ধশিশু খুঁজে বের করে তাঁর

সাক্ষ্য গ্রহণ করতে। ঠিক এমন সময়েই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারের মামলায় বাদীপক্ষের একজন কৌঁসুলি হিসেবে। তুরিন বলেন, সৈয়দ কায়সারের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের আনা ১৪টি প্রমাণিত অভিযোগের মধ্যে দুজন নারীকে ধর্ষণের ঘটনাও ছিল। তাঁদের একজন মাজেদা এবং তাঁর গর্ভে জন্ম নেওয়া 'যুদ্ধশিশু' সামছুন নাহার, যিনি এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। অনেক খোঁজ করে, যোগাযোগ করে, নানাভাবে বুঝিয়ে ব্যারিস্টার তুরিন এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। সেই সঙ্গে প্রথমবারের মতো পৃথিবীও শুনেছিল একজন যুদ্ধশিশুর ভাষ্য!

যুদ্ধাপরাধী কায়সারের মামলায় ক্যামেরা ট্রায়ালের পিনপতন নিস্তব্ধতায় সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়ানো ৪২ বছর বয়সী এক সামছুন নাহার। সংকুচিত, মলিন, বিবর্ণ, ক্লান্ত একজন মানুষ, সবার অগোচরেই একটু একটু করে বেড়ে উঠেছিলেন অনাদরে আর অবহেলায়, আমাদের এই সমাজেই। পারিবারিক, সামাজিক আর মানসিক বৈষম্যের শিকার এই মানুষটি চোখ তুলে তাকাতে পারেননি সেদিন। যেন অদৃশ্য শৃঙ্খলের শাসনাবদ্ধ প্রতীকী এক মানবসন্তান! মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে তুরিন বলেছিলেন, '১৯৭২ সালে যুদ্ধশিশু সামছুন নাহারের জন্ম হয়েছিল। অথচ ঠিক একই সময়ে জন্ম নেওয়া অন্য শিশুরা পরিবারবদ্ধ হয়ে মাথা উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায় আজ, গর্ব করে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে। যুদ্ধশিশু সামছুন নাহার তা কখনোই পারেননি। যেন জন্মই তাঁর আজন্ম পাপ!'

বাহাত্তরে মাজেদার বাবার বাড়িতে যুদ্ধশিশু সামছুন নাহার জন্ম নেন। এরপর শিশু সামছুন নাহারকে বাবার বাড়িতে রেখেই মাজেদা তাঁর স্বামী আঁতাই মিয়ার বাড়িতে চলে যান। সেখানে তাঁদের আরো সন্তানের জন্ম হয়। মাঝে প্রায় পাঁচ বছর তাঁর সন্তানের সঙ্গে মাজেদার কোনো যোগাযোগ ছিল না। যুদ্ধশিশু সামছুন নাহার তাঁর নানাবাড়িতেই বড় হতে থাকেন। আঁতাই মিয়া সামছুন নাহারের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন। নানাবাড়িতে বড় হওয়ার পর সামছুন নাহারের বিয়ে হয়েছিল। সেই সংসারও টেকেনি তাঁর। তিনি বীরাঙ্গনা মাজেদার সন্তান জানতে পেরে তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তাঁর স্বামী আরেকটি বিয়ে করেছিল। সামছুন নাহার সেই থেকে একাই থাকেন, অনেকটা নিভৃতে। যুদ্ধাপরাধের মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার পর থেকে তিনি এখন আর নিজের বাসস্থানেও থাকতে পারেন না। জীবননাশের হুমকি পেয়ে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। যে মানুষটির কোনো ঘর নেই, দেশ নেই, দেওয়ার মতো কোনো পরিচয়ও নেই, তাঁর পালানোরও কোনো পথ থাকে কি! একাত্তরে পুরুষ-নারী উভয়েই যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা দেশরক্ষার পাশাপাশি প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। একজন পুরুষ যখন দেশ ও প্রাণরক্ষায়

যুদ্ধরত থেকেছেন, ঠিক একই সময় একজন নারীকে দেশ ও প্রাণের পাশাপাশি সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টাও যুদ্ধের শামিল! সহায়-সম্পদের পাশাপাশি যুদ্ধে প্রাণের হানি হয়, দেহের হানি ঘটে; এমনকি সম্ভ্রমেরও হানি হয়। যুদ্ধশেষে বিজয়ের মূল্য নির্ধারণে প্রাণহানির হিসাব হয়, সম্পদহানির হিসাব হয়, সম্ভ্রমহানিরও হিসাব হয়। অথচ সম্ভ্রমহানির পরিণতিতে জন্ম নেওয়া অগণিত শিশুর হিসাব আমাদের এই ঘুনেধরা সমাজে আজও হয়নি।

হয়নি তাঁদের মূল্যায়ন! যে শিশুর জন্ম হয়েছিল শত্রুর বর্বরোচিত প্রতিহিংসা থেকে, পিতৃহীন বলে তাঁদের আমরা লজ্জায় গ্রহণ করি না! যুদ্ধজয়ের পর সবকিছুরই হিসাব হয়েছে। কিন্তু যে শিশু বেদনার্ত জন্মের বিনিময়ে ১৭ কোটি মানুষের আত্মপরিচয় ও আজন্ম ঠিকানার হদিস এনে দিয়েছিলেন, তার হিসাব এ দেশে হয়নি।

অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের মতো 'যুদ্ধশিশু' বলে সমাজের চোখে তাঁকে 'অবাঞ্ছিত শিশু', 'শত্রুসন্তান', 'অবৈধ সন্তান', এমনকি 'জারজ সন্তান' নামের অমানবিক পরিচয় লেপ্টে দিতেও কুণ্ঠাবোধ হয়নি। ৩০ লাখ বাঙালির জীবন ও পাঁচ লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা, হাজার হাজার বিজয়শিশুর জন্মের বিনিময়েও কি সেই একই স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি! সামছুন নাহার একজন বিজয়শিশু, যাঁর জন্মের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতাকে ধারণ করি, লালন করি, বুক ভরে আগলে রাখি প্রতিটি নিশ্বাসে। 'ওরা যুদ্ধশিশু নয়; ওরা আমাদের বিজয়শিশু' ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজের এই অনুভূতিই হোক বাঙালি জাতির অনুভূতি! এভাবেই পূর্ণতা পাক 'বিজয় আর স্বাধীনতা'!

[লেখক: আইনজীবি।]

অনুবাদ

ঢাকায় শিশু গৃহভৃত্য

তেরেস ব্লঁশে/সৈয়দ আজিজুল হক

ক্রমবর্ধমান সংখ্যা

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে প্রবণতা লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের অবস্থা তা থেকে ভিন্নতর। বাংলাদেশে গৃহস্থকর্ম কোনো অদৃশ্য পেশা নয়। যদিও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা প্রায়শই 'ভালো' গৃহভৃত্য পাওয়ার সমস্যা নিয়ে দুঃখ করেন, তবু ঘরে ঘরে গৃহভৃত্য নিয়োগের কোনো কম্‌তি নেই, এমনকি তারা যদিও ছোট শিশুও হয় তবুও। ঢাকার চাকর হিসেবে ছোট শিশুদের ক্রমবর্ধমান নিয়োগের বিষয়টি সাংবাদিকের লেখায় উল্লেখিত হয়েছে।[১] আমরা শহুরে যেসব নিয়োগকর্তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের বক্তব্য থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাছাড়া আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণেও তা ধরা পড়েছে। শিশুদের নিয়োগের কারণে শিশুশ্রমের দায়ে ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত হচ্ছে গার্মেন্টস কারখানাগুলো। তবে সেখানে সাধারণত ১৩/১৪ বছরের মেয়েদের নিয়োগ করা হয়, অথচ গৃহকর্মে যাদের নিয়োগ করা হয় তাদের বয়স এদের চেয়ে অনেক কম। গৃহকর্মে যারা নিযুক্ত হয় তাদের অনেকেরই বয়স থাকে ৭/৮ বছরের মধ্যে। এ ধরনের বয়সের শিশুরা গৃহকর্মে নিয়োগের যোগ্য বলেই ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয়।

১৯৮৫ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকাল গভর্নমেন্ট ঢাকায় ৩ লাখ ১৫ হাজার বাড়ির ওপর একটি বড় ধরনের জরিপের কাজ পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, ৪৪ শতাংশ পরিবারেই সার্বক্ষণিক গৃহভৃত্য নিযুক্ত এবং ২৯ শতাংশ গৃহে রয়েছে খণ্ডকালীন চাকর (সিদ্দিকী ও অন্যান্য, ১৯৯০ : ২৫৮)।

সার্বক্ষণিক গৃহভৃত্যদের অধিকাংশই শিশু, যারা কর্মস্থলেই বসবাস করে। এ ধরনের কাজের নাম 'বাঁধা কাজ' যার প্রকৃত অর্থ 'বাধ্যবাধকতাপূর্ণ কাজ'। এর সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে 'ছুটা কাজ'-এর, যেটা খণ্ডকালীন কাজ। 'ছুটা কাজে'র ক্ষেত্রে দায়িত্ব সীমিত, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, নির্ধারিত কাজ শেষ হলেই ভৃত্যরা কর্মস্থল ত্যাগ করে। বয়স্ক মহিলারা, যাদের নিজস্ব পরিবার আছে, তারা

শেষোক্ত ধরনের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়। এ ধরনের কাজের পারিশ্রমিকও তুলনামূলকভাবে বেশি।

মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান থেকে আবিষ্কৃত তথ্যাবলি এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে। মাঠ পর্যায়ের এই অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করেন আনিসা জামান। এ ক্ষেত্রে ৮০টি শিশু গৃহভৃত্যের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় এবং তাদের গৃহকর্তাদের বাড়ি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেয়া হয়। এর মধ্যে সকল শিশুই সার্বক্ষণিক গৃহভৃত্য হিসেবে নিয়োজিত এবং সকলেই কর্মস্থলে বসবাস করে। একটিমাত্র ব্যতিক্রম পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, এর মধ্যে ৭১টি মেয়ে ও ৯টি ছেলে। শিশু গৃহভৃত্যদের ২জন পিতা ও ১১ জন মাতার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য পাওয়া গেছে ২৯ জন গৃহকর্তা ও ৬ জন দালালের কাছ থেকে। দালালেরা গৃহকর্তাদের জন্য এসব ভৃত্য সংগ্রহ করে। এই মূল অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খিলগাঁও বস্তি থেকে সংগৃহীত কিছু কেস-হিস্ট্রি। ১৯৯২-৯৩ সালে আমাদের একটি টিম খিলগাঁও বস্তির ৭৫টি ঘরে সমীক্ষা চালায়। এতে দেখা যায়, ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী কর্মজীবী মেয়েদের ১৯ শতাংশই গৃহপরিচারিকা হিসেবে নিযুক্ত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহে প্রবেশের ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়। আমাদের বাঙালি গবেষকেরা এ কাজ করতে গিয়ে আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবেশীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্কসূত্রকে ব্যবহার করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গৃহে প্রবেশ ও অপরিচিত হিসেবে বিশ্বাস অর্জন সম্ভব ছিল না। কাউকে না কাউকে কোনো না কোনোভাবে পরিচয়ের একটি যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আত্মীয় বা পরিচিত লোকের যোগসূত্রের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। আর তা না হলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে শুধু গৃহকর্তার কাছ থেকেই নয়, গৃহভৃত্যের কাছ থেকেও।[২]

অল্প কিংবা বেশি কোনো সময়ের জন্যই গৃহভৃত্যরা কাজ থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা পায় না। প্রত্যেক শিশুর সঙ্গেই অনেকবার সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। তাছাড়া গৃহকর্তাদের অনুপস্থিতিতে গৃহভৃত্যদের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমদিনের সাক্ষাতের সময় যে সুযোগ পাওয়া যায়নি।

কেন শিশুদের নিয়োগ করা হয়?

সার্বক্ষণিক 'বাধ্যতামূলক' গৃহকর্মে শিশুদের যে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করা হয়, বিশেষত মেয়েদের, তার মূল কারণ হতে পারে পাঁচটি।

- মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংসারের কাজকর্ম সামলানোর জন্য গৃহভৃত্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে বয়স্কদের যদি না পাওয়া যায় কিংবা বয়স্করা যদি সমস্যাপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের পরিবর্তে শিশুদের নিয়োগ করা হয়।
- অনেক গৃহকর্তাই গৃহভৃত্য হিসেবে শিশুদের, বিশেষত বালিকাদের নিয়োগ করাকে সুবিধাজনক বলে মনে করেন। "তাদের চোখ খোলার আগে" অর্থাৎ ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এ ধরনের অপরিপক্ব শিশুরা দ্রুত নির্দেশ পালন করবে এবং

সহজেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। সম্ভবত তারা কম চুরি করে। তারপরেও তারা প্রচুর পরিমাণে কাজ করে।

- গ্রামের দরিদ্র পিতামাতারাই মূলত নিজেদের শিশুসন্তানদের গৃহভৃত্য হিসেবে নিয়োগের জন্য পাঠায়। এসব পিতামাতা আশা করে যে, শিশুদের এভাবে নিয়োগের মাধ্যমে ওই পরিবারটির সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তা ওই শিশুর জন্য, তাদের পরিবারের জন্য লাভজনক হবে।
- গৃহপরিচারিকাদের বহু বাবা-মা-ই এইরূপ গৃহস্থকর্মকে এক ভবিষ্যৎ গৃহবধূর জন্য একটি ভালো প্রস্তুতিমূলক শিক্ষাকাল হিসেবে মনে করে। আগে হোক বা পরে হোক, সকল মেয়ের কাছ থেকেই এই ভূমিকা পালনের বিষয়টি প্রত্যাশা করা হয়। অন্যের সেবা করা এবং নিজের প্রয়োজনের কথা ভুলে থাকাই গৃহবধূর ধর্ম বলে মনে করা হয়। গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকা এবং বাইরে যাওয়া ও বিশ্বকে দেখার স্বল্প সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারটিকে মেয়েদের চরিত্র ও সুনামের ক্ষেত্রে ভালো বলে বিবেচনা করা হয়। সবশেষে, যদিও গুরুত্বের দিক থেকে নয়, গৃহপরিচারিকাদের বাবা-মা আশা করে যে, তাদের মেয়েদের বিয়ে দেয়ার সময় গৃহকর্তারা সাহায্য করে যৌতুকের বোঝা অনেকটা লাঘব করবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহভৃত্যরা নবাগত হিসেবে শহরে আসে। অন্য কাজের বিকল্প সম্পর্কেও তারা থাকে অজ্ঞ। গ্রামে দারিদ্র্যের অব্যাহত যাত্রার ফলে শহরে শিশু গৃহভৃত্যদের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিতভাবে বজায় থাকছে। সেখানেই কারখানা গড়ে উঠুক না কেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে থাকে যে, শিশু গৃহভৃত্য পাওয়ার সুযোগ কমে যাচ্ছে। ঢাকায় ১৪ বছর বা তারা বেশি বয়সের মেয়েদের গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ার পর এই বয়সের বহু মেয়েই গৃহপরিচারিকার কাজ ত্যাগ করে। এর ফলে শিশু গৃহপরিচারিকাদের গড় বয়সও কমে আসে। শুধু এক ধরনের শিল্প-কারখানায় (যেমন, গার্মেন্টস কারখানা) শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করলে সামগ্রিকভাবে শিশুশ্রমের ঘটনা হ্রাস পাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এতে শুধু খাত বদল হতে পারে অর্থাৎ এক খাতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে শিশুরা অন্যত্র গিয়ে কাজে নিযুক্ত হবে।

মধ্যবিত্ত নিয়োগকর্তা

আয়, আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-পদ্ধতি প্রভৃতি দিক বিবেচনা করলে ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিধি বেশ ব্যাপক। গৃহভৃত্য আছে এমন সব পরিবারের গৃহকর্তাদের আমরা যে সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের মাসিক আয় রেকর্ড করার চেষ্টা আমরা করিনি। এটা খুবই কঠিন কাজ, বিশেষত উচ্চবিত্ত পর্যায়ে। গৃহকর্তারাও আবার নানা পেশায় নিয়োজিত। এঁদের মধ্যে আছেন ক্ষুদ্র সরকারি কর্মকর্তা হতে শুরু করে যুগ্ম সচিব, আছেন ব্যবসায়ী, ব্যারিস্টার ও শিক্ষক।

আমরা যেসব নমুনা ব্যবহার করেছি তাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরি করে এমন পরিবারের সংখ্যা মাত্র ১৩ শতাংশ। গৃহভৃত্যকে বাদ দিয়ে এসব পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা ৪.৪৬। নয়টি পরিবারে দেখা গেছে, ১৬ বছরের নিচে কোনো শিশু নেই। বাকি ক'টি পরিবারে গড়ে শিশু আছে ২.২৮ জন করে। অধিকাংশ পরিবারেই বসবাস ভাড়া বাসায়।

গ্রামের মহিলাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূরা তাদের শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় অধিক সময় ব্যয় করে না। স্বামীর যদি নিয়মিত আয় থাকে তাহলে মধ্যবিত্ত পরিবারের দম্পতিরা সাধারণত বিয়ের কিছুদিন পরই ভিন্ন বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে। শহরের বধূরা যেহেতু গ্রামের মহিলাদের চেয়ে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা ভোগ করে সেহেতু তারা চাকর-বাকরের সাহায্য ছাড়াই চলুক, সেরকমটাই তাদের কাছ থেকে কেউ কেউ প্রত্যাশা করতে পারেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির আদর্শ অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য রক্ষা, খাদ্য গ্রহণ ও কাপড়-চোপড় পরা এই সবকিছু মহিলাদের কাছ থেকে আরেক ধরনের 'কাজ' দাবি করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, শিশুর যত্ন নেয়া ও শিক্ষাদানের বিষয়ে খুবই জোর দেয়া হয়। শিশুদের খাওয়ানো, যত্নের সঙ্গে লালন-পালন, তাদের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেয়া, স্কুলে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা, শিশুদের জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি অনেক কাজ এবং এতে শিশুর মা ও গৃহভৃত্যদের অনেক সময় ব্যয় করতে হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে গৃহভৃত্য নিয়োগের বিষয়টি কাজের পরিমাণ অর্থাৎ কী কাজ তাদের করতে হবে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে ফ্রিজ, টেলিভিশন ও অন্যান্য মানসম্পন্ন আসবাবপত্র (ধনী গৃহে তালিকা আরও লম্বা) থাকার বিষয়টিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হয় তেমনি গৃহভৃত্যের উপস্থিতিও একইরূপে মর্যাদার অংশ, এমনকি সেই গৃহভৃত্য যদিও ছোট শিশুও হয় তবুও। মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারে গৃহভৃত্যদের উপস্থিতি নিজ শ্রেণির মধ্যে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বাড়ায়। এখানে প্রভু ও ভৃত্যরা নিত্যদিনকার আন্তরিকতার ভেতর দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এসব শ্রেণির কিছু কিছু প্রতিনিধি আবার শিশুও হয়ে থাকে। এসব শিশু অতি অল্প বয়সেই প্রভু ও ভৃত্যের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে ওঠে। শ্রেণিগত কর্তৃত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে শিশুরাও কম যায় না। এর কারণ, শিশুরা কোন্ সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সেটা পদে পদে তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। কেননা তারা শিশু তার চেয়েও তারা কোন্ শ্রেণির সেটাই আরও গভীরভাবে তাদের পরিচয় ও ভূমিকা নির্ধারণ করে।

গ্রামাঞ্চল থেকে আগত শিশু গৃহভৃত্যরা সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই তাদের গৃহপ্রভুর কর্তৃত্বকে মেনে নেয়। কিন্তু তাদের সমবয়সীরা বা কমবয়সীরা যদি তাদের নির্দেশ দেয় বা শাস্তি দেয় সেটাই তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। গ্রামীণ সমাজের মতো বয়সগত জ্যেষ্ঠত্বকে এখানে একই গুরুত্ব দেয়া হয় না। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গৃহে যেসব ভৃত্য বসবাস করে তাদের দিনের ২৪ ঘণ্টা জুড়ে সকল ক্ষেত্রে হীন হয়ে থাকে।

মালিকের সন্তানের সঙ্গ দেয়াই ৭/৮ বছর বয়সী যেসব গৃহভৃত্যের প্রধান কাজ, তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তারা কখনও ঘরে খেলনা নিয়ে খেলে কিনা। ৮ বছর বয়সী এক বালিকা এর উত্তরে বলে, "খেলনাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার জন্য শুধু আমাকে ধরতে দেয়া হয়।" আরেকটি মেয়ের উত্তর : পুতুল নিয়ে আমি যদি খেলা করি তাহলে তীব্র গালমন্দ শুনতে হয় আমাকে। আরেকজনের বক্তব্য : আমি যখন মালিকের সন্তানের সঙ্গে খেলা করি তখন সব সময়ই তাকে জিতিয়ে দিতে হয়।

যেসব শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের বয়স ৭ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে, গড়ে ১১ বছর। এসব শিশু গৃহভৃত্য হিসেবে যখন কাজ শুরু করে তখন তাদের বয়স ছিল ৬ থেকে ১২ বছরের মধ্যে, গড়ে ৮.৭৬ বছর। বালকদের তুলনায় বালিকারা গড়পড়তা ২ বছর আগেই এ কাজ শুরু করে। পিতামাতা ও নিয়োগকর্তা উভয়েরই ধারণা, বালকদের চেয়ে আগেই বালিকাদের 'বুঝ' হয় এবং তারা পরিপক্ব হয়ে ওঠে। তাছাড়া বালিকাদের অধিকতর সুরক্ষিত পরিবেশে রাখার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করা হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারেই এমন পরিবেশ আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

কাজকর্মের ধরন ও পরিমাণ

'বাঁধা কাজে'র মেয়েদের দিয়ে যে কাজ করানো হয় তা তাদের বয়স, তাদের নিয়োগকর্তাদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, নিয়োগকর্তার পরিবারের সদস্যসংখ্যা ও কম্পোজিশন এবং ওই বাড়িতে আর কোনো চাকর আছে কি নেই—এই সবকিছুর ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবেই ভিন্নতা অর্জন করে।

কাজের অবস্থার এই ভিন্নতা সত্ত্বেও বাঁধা কাজের মেয়েদের সাধারণত সারা বছরই প্রতিদিন পনের থেকে ষোল ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। তাদের কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক ছুটি নেই। মোটামুটি ভোর ৬টা বা ৭টার দিকে তারা কাজ শুরু করে এবং টেলিভিশনের রাতের প্রোগ্রাম শেষ (অর্থাৎ রাত সাড়ে ১১টা) হওয়ার পরে তাদের কাজ থেকে অবসর দেয়া হয়।

হয় রান্নাঘরে নয়ত বেডরুমের মেঝেতে তারা ঘুমায়। তাদের থাকার নিজস্ব কোনো জায়গা নেই। সাধারণত তারা সস্তা-খাদ্য আরও সস্তা বাসনে খায়। মেঝেতে বসেই তাদের খেতে হয়। গৃহকর্তার পরিবারের সদস্যরা টেবিলে খাবার রেখে চেয়ারে বসে যেভাবে খায় তারা সেভাবে খেতে পারে না। সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর তারা খায় এবং তাদের খাওয়ার ব্যাপারে অন্য কেউ তাদের সাহায্য করবে সেটা অনুমোদিত নয়। প্রকৃত ঘটনা হল, চাকরেরা কেবল একটি শিশুই যারা তাদের হীনতর অবস্থাকে প্রতিফলিত করে যে সামাজিক প্রথা, তার পরিবর্তন সাধন করতে পারে অল্পই। গৃহভৃত্যদের হীন অবস্থার বিষয়টি অসংখ্যভাবেই প্রকাশিত হয়। চুলের স্টাইল, সস্তা কাপড়-চোপড়, ক্রীতদাসতুল্য দেহভাষা এবং সর্বোপরি তারা যে স্কুলে যায় না—এই সবকিছুই

তাদের হীন অবস্থানকে তুলে ধরে। ঢাকার গৃহপরিচারিকাদের কাজের ও বসবাসের এই পরিস্থিতির কথা একইভাবে তুলে ধরেছেন রহমান (১৯৯১)।

বেশির ভাগ শিশুভৃত্যই বেতন পায় না

আমরা যেসব শিশু গৃহভৃত্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের মধ্যে ৭৬ শতাংশই কাজ করে সুনির্দিষ্ট অর্থপ্রাপ্তি ছাড়াই। এসব শিশুকে যাঁরা নিয়োগ করেন সেসব গৃহকর্তার মধ্যে ৭০ শতাংশ আছেন যাঁরা মাঝে মধ্যে গৃহভৃত্যের বাবা-মা বা অভিভাবকদের কাপড়-চোপড় দেন এবং ভৃত্যের পরিবার অসুস্থ হলে বা বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়লে যদি অনুরোধ করা হয় তাহলে নগদ সাহায্যও করেন। ২৪ শতাংশ শিশু সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পায়, এর মধ্যে আবার মাত্র ২.৫ শতাংশ নিজেরা বেতনের টাকা হাতে পায়। বাকিদের ক্ষেত্রে বেতন দেয়া হয় ওই গৃহভৃত্যের বাবা-মা'র হাতে। যারা বেতন পায় তাদের গড় বেতনের পরিমাণ মাসে ১৪৫ টাকা।

এই বেতনের ক্ষেত্রেও বালক ও বালিকাদের মধ্যে বৈষম্য আছে। যেমন বালকেরা বালিকাদের চেয়ে সম্ভবত চার গুণ বেশি বেতন পায়। যদিও আমরা খুব অল্পসংখ্যক গৃহভৃত্যের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করেছি, তবু বাংলাদেশে সর্বত্র নারী-পুরুষে যে বৈষম্য বিদ্যমান, এক্ষেত্রেও তা ভালোভাবে লক্ষ করা গেছে।

শিশুদের এই গৃহস্থকর্মকে কি শিশুশ্রমের মধ্যে শ্রেণিভুক্ত করা উচিত? এটা করা যেমন উপকারী তেমনি বিভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়কও বটে। একে শিশুশ্রম হিসেবে গণ্য করা হলে তাতে গৃহস্থকর্মের অর্থনৈতিক মূল্যকে যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়। একই সঙ্গে, তা এ ধরনের কাজ সম্পর্কে বাংলাদেশে যে ধারণা বিদ্যমান সেই ধারণাকেও অস্পষ্ট করে তোলে।

শিশুদের গৃহস্থকর্মকে সাধারণত 'সাহায্য দেয়া' বা 'ছোট কাজ, ফুটফরমাশ করা' বলে অভিহিত করা হয়। শিশুদের গৃহস্থকর্মকে শুধু মূল্যবান অর্থনৈতিক তৎপরতা হিসেবে অস্বীকারই করা হয় না, বরং গৃহকর্তারা সাধারণত শিশুদের ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেদের মনে করে। মনে করে, শিশুদের যে আশ্রয় ও খাদ্য তারা দেয় তা না দিলে তারা মারা পড়বে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঈদ উপলক্ষে গৃহভৃত্যদের পরিবার-পরিজনকে যে উপহারসামগ্রী দেয়া হয়, তা যাকাতেরই অংশ। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, আয়ের উদ্বৃত্তের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ গরিবদের দান করা হয়। গরিব শিশুদের বেতন দেয়া হয় না। তারা পায় দয়া ও বদান্যতা।

নিয়োগকর্তাকে নীতিগত অভিভাবক হিসেবে মান্য করার জন্য শিশু গৃহভৃত্যদের শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলা শেখানোর অধিকার রয়েছে নিয়োগকর্তার। "শিশু যতটা সহ্য করতে পারে", একটি শিশুকে ততটা প্রহার করা গ্রহণযোগ্য—এক পিতামাতারই মন্তব্য এটি। যেসব শিশু গৃহভৃত্যের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একটি বালিকা ছাড়া আর সকলেরই ধর্ম আর গৃহকর্তার ধর্ম এক। শিশুদের সাধারণত কিছু ধর্মীয় নির্দেশও দেয়া হয়। অভিভাবকদের একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই একে দেখা হয়। তবে শিশু গৃহভৃত্যদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারটি খুবই ব্যতিক্রমধর্মী

ঘটনা। স্কুলে পাঠানোর কথা বলা হলে তাতে বেশ কিছু নিয়োগকর্তার মধ্যে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা বলে যে, এনজিওগুলো 'গৃহভৃত্যদের নষ্ট করতে' চাইছে।

গৃহকর্তাদের মালিক/অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করার জন্য শিশু গৃহভৃত্যদের শেখানো হয়। নীতিগত দিক থেকে একজন অভিভাবকের থাকে অপরিসীম কর্তৃত্ব এবং একটি শিশুর পক্ষে অভিভাবকের নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয় কিংবা কাজের অবস্থা নিয়ে কোনো আপস-আলোচনায় যাওয়াও সম্ভব নয়। যে অভিভাবক তার সন্তানকে কোনো গৃহকর্তার হাতে সঁপে 'দেয়' এবং যে গৃহকর্তা ওই শিশুটিকে 'গ্রহণ করে'—এই দুজন একটি চুক্তিতে আসে। তবে এই দুজনের সম্পর্ককে যেহেতু সাধারণভাবে পৃষ্ঠপোষক-পোষ্য সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয় সেহেতু বহু বাবা-মা-ই নিয়োগদাতা গৃহকর্তার সঙ্গে আপস-আলোচনার ক্ষেত্রে নিজেকে স্বাধীন ভাবেন না। অন্য পিতামাতারা, তাঁদের নিজেদের কারণে, সন্তানের কাজের জন্য কোনো বেতনের ব্যাপারে চাপ দেন না এবং সন্তানের শ্রমকে 'সাহায্য' বলে মেনে নেন। তাছাড়া এটা বিশেষভাবে ঘটে মেয়েদের ক্ষেত্রে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শহরের বস্তিতে বসবাসকারী মায়েরা সম্ভবত গ্রামের পিতাদের তুলনায় তাদের কন্যাদের জন্য বেতনের ব্যাপারে বেশি চাপাচাপি করে। এটা দেখা গেছে খিলগাঁও বস্তিতে, সেখানে বহু মহিলা আছে যারা নিজেরাই গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করে এবং অস্বাভাবিক মাত্রায় নিজেদের সুযোগ-সুবিধার কথা ব্যক্ত করে।

একটি শিশুকে গৃহভৃত্য হিসেবে 'রাখা' আর পোষ্য গ্রহণ কিংবা একটি গরিব শিশুকে 'পালক' সন্তান হিসেবে লালন-পালনের মধ্যে অনেক মিল আছে। বাংলাদেশে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এটা প্রায়ই ঘটে থাকে। একটি গরিব শিশুকে অপেক্ষাকৃত ধনী আত্মীয়-স্বজন যাদের 'সাহায্যে'র প্রয়োজন হয় তাদের কাছে বিশ্বাসভরে অর্পণ করা হয়। একটি শিশুকে দূরবর্তী কোনো নগরীতে অনাত্মীয় (এবং কখনও কখনও অপরিচিত) অভিভাবকের কাছে রাখার বিষয়টিও প্রায়শ একই ভাষায় শিশুর পিতামাতাদের দ্বারা বর্ণিত হয়। নিয়োগকর্তারা এসব শিশু কর্মীদের 'নিজের সন্তানের মতো' আদব কায়দা শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তবে গৃহকর্তার সন্তান ও গৃহভৃত্যকে একই দৃষ্টিতে দেখার বিষয়টি আমরা কোথাও লক্ষ করিনি, এমনকি যেসব শিশু গৃহভৃত্যের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয় তাদেরও এক বা একাধিক উপায়ে হীন অবস্থার কথা সব সময় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। আমরা সাক্ষাৎকার নিয়েছি এমন একজন মধ্যবিত্ত গৃহিণীর ভাষ্য: "আমাদের গৃহভৃত্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা উচিত। আমি বলছি না যে, তাদের পুরো ডিমটাই দিতে হবে (যেটা আমাদের নিজেদের সন্তানদের বেলায় দিয়ে থাকি), তবে অর্ধেকটা তো দেয়া যেতে পারে।"

যেসব শিশু গৃহভৃত্য, বিশেষভাবে গরিব পরিবার থেকে আসে তারা স্বীকার করেছে যে, তারা তাদের গৃহকর্তার বাড়িতে ভালো খাবার পাচ্ছে। তবে তাদের অনেকে প্রতিদিন ভৃত্য হিসেবে যে অপমানকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে সেটা নিজের বাড়িতে বস্তুগত বঞ্চনা লাভের চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণাকর। মজার ব্যাপার হল, ধনাঢ্য গৃহকর্তাদের চেয়ে তুলনামূলক গরিব গৃহকর্তা তাদের

গৃহভৃত্যদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভালো ব্যবহার করে থাকে। এর কারণ হল, তারা সাধারণত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে এদের এনে থাকে এবং গৃহকর্তা ও গৃহভৃত্যের মধ্যে সামাজিক অবস্থানগত ব্যবধানটি অত ব্যাপক নয়।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের অবস্থা হতে পারে তুলনামূলকভাবে দীনতা-আক্রান্ত, কিন্তু গৃহভৃত্যরা এসব পরিবারে যে পরিবেশে কাজ করে সে পরিবেশটি তাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে কেউ হয়তো বাঙালি সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত একটি ধারণার কথা তুলে ধরতে পারেন। ধারণাটি হল, উচ্চশিক্ষিত পরিবারের লোকজন সম্ভবত কম গালাগালি বা প্রহার করে থাকে। কেননা ওগুলো 'অজ্ঞতা' ও 'দারিদ্র্যে'রই ফল, অথচ আমরা যে সমীক্ষা পরিচালনা করেছি তাতে দেখা গেছে, যথেষ্ট ধনী পরিবারগুলোতেই গৃহভৃত্যরা ব্যাপক হয়রানির শিকার হয় অর্থাৎ হয়রানিমূলক ঘটনাগুলো ঘটে ওইসব গৃহেই, যেসব গৃহে বন্ধ দরজার ভেতরে তা সম্পাদন করা যায় এবং ভেতরে কী ঘটেছে প্রতিবেশীরা সহজে যাতে তা টের না পায়। ধনাঢ্য গৃহকর্তাদের বাড়িতে আমরা দেখেছি গৃহভৃত্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ও নীরব থাকে। গৃহকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষিত হলে গৃহভৃত্যরা শারীরিক বা যৌন হয়রানির শিকার হবে না এমন কোনো কথা নেই (নিম্নে উল্লেখিত বাস্তব ঘটনার বিবরণসমূহ দেখুন)।

নিয়োগের ধরন-ধারণ

আশিটি কেস স্টাডির মধ্যে মাত্র দুটি ঘটনায় দেখা গেছে, শিশুরা নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহভৃত্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের অভিভাবকেরাই গৃহভৃত্য হিসেবে তাদের নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় অর্থাৎ নিয়োগকর্তার কাছে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত করে। এটা করা হয় সরাসরি কিংবা কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে। মধ্যস্থতাকারী এসব লোক অভিভাবকের পক্ষ হয়ে কাজটি করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, গৃহকর্তারা এতিম বা পথশিশুদের গৃহভৃত্য হিসেবে নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে গৃহকর্তারা তাদের স্বনির্বাচিত অভিভাবক হয়ে ওঠে।

গৃহভৃত্যদের অভিভাবক

আমরা যে আশিজনের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছি, তাদের মধ্যে সাতটি (৮.৭৫ শতাংশ) শিশুর গৃহকর্তা ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই। এদের মধ্যে চারটি শিশুর বাপ-মা কেউ নেই এবং তিনটি শিশুর বাবা আছে কিন্তু মা নেই। মজার ব্যাপার হল, যেসব শিশুর বাপ নেই, অথচ মা জীবিত আছে তারা কেউই নিজেদের অভিভাবকহীন বলে ঘোষণা করেনি। এতে মায়ের সঙ্গে সন্তানদের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রকাশিত হয়, দারিদ্র্যের মধ্যেও যা বজায় থাকে।

শিশু গৃহভৃত্যদের অভিভাবক

	অভিভাবক						
	সর্বমোট	বাবা	মা	বড়ভাই	চাচা	দাদী/নানা	অভিভাবকহীন
বাবা-মা আছে	৩৩	২৯	০১	০৩	-	-	-
বাবা-মা নেই	০৮	-	-	০১	০২	০১	০৪
বাবা নেই	৩৪	-	৩০	০২	০১	০১	-
মা নেই	০৫	০২	-	-	-	-	০৩
সর্বমোট	৮০	৩১	৩১	০৬	০৩	০২	০৭

বাবা-মা কেন তাদের সন্তানদের গৃহভৃত্য হতে দেয়?

বাবা-মায়েরা কেন তাদের সন্তানদের, বিশেষত কন্যাদের গৃহভৃত্য হিসেবে নিয়োগের জন্য 'পাঠায়'? ইতঃপূর্বে বিড়ি-শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিড়ি শ্রমিকদের যে বেতন দেয়া হয় গৃহভৃত্যদের তা-ও দেয়া হয় না। তাছাড়া মর্যাদাগত দিক চিন্তা করলে গৃহভৃত্যদের অবস্থা খুবই হীন।

শিশু গৃহভৃত্যদের অধিকাংশ বাবা-মা-ই গরিব, এ ব্যাপারে তেমন সন্দেহ নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা স্বীকার করে যে, সন্তানদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব তাদের পক্ষে পালন করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে, অনাত্মীয়দের দ্বারা আরোপিত কঠোর শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের কাজ শিশুদের জন্য ভালো। মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের খাওয়ানো-পরানোর সমস্যাটি বাবা-মা-র জন্য বড় সমস্যা না-ও হতে পারে, বরং তাদের সুনাম রক্ষা, যুৎসই স্বামীর হাতে তাদের তুলে দেয়া এবং সর্বোপরি যৌতুক প্রদান—এগুলোই বাবা-মা-র জন্য বড় সমস্যা। কন্যাকে গৃহপরিচারিকা হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাবা-মা-র মনে এসব দায়িত্ববোধ জাগ্রত থাকে।

গৃহপরিচারিকা হিসেবে মেয়েদের নিয়োগ করার সঙ্গে বিবাহপ্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। বাবা-মা তাদের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গড়ে তোলে এবং বিয়ের মাধ্যমে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠায়। গৃহস্থকর্মকে এই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছার লক্ষ্যে একটি সহায়ক প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে দেখা হয়। একটি গৃহসীমার মধ্যে অবস্থান করা, কঠোর পরিশ্রম, তিরস্কার হজম করা এবং মাঝে মধ্যে শাস্তি ভোগ, অথচ সেজন্য কারো কাছে অভিযোগ করার কিছু নেই—এরূপ পরিস্থিতিই সম্ভবত একটি বালিকাকে তার শ্বশুরবাড়িতে মোকাবেলা করতে হয়। এই শিক্ষা তাকে কষ্ট সইতে প্রস্তুত করে তোলে।

বহু বাবা-মা একটি প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাদের মেয়েদের বেতনহীন কাজের শর্তটি মেনে নেয়। নিয়োগকর্তারা গৃহপরিচারিকার বিয়ের ব্যবস্থা করবে কিংবা অন্তত বিয়ের খরচের সিংহভাগ বহন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। একটি মেয়ে যখন গৃহপরিচারিকা হিসেবে নিযুক্ত হয় তখন যদি তার বয়স থাকে ৯/১০ বছর তাহলে প্রতিশ্রুতির ওই তথাকথিত সাহায্যের প্রসঙ্গটি আসে এর বহু বছর পরে। বালিকাটি ইতোমধ্যে দারুণ বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে যায়। টাকা যা দিতে পারে সেই স্বাধীনতার স্বাদ সে কখনওই পায় না। তার বাবা-মা অবশ্যই এই পরিস্থিতিকেই একটি বালিকার জন্য যথাযথ বলে মনে করেন।

কন্যা ও ভগিনীকে কখনও কখনও পরিবারের অন্য সদস্যদের স্বার্থ নিশ্চিত করার উপায় হিসেবেও নিয়োগকর্তার কাছে দেয়া হয়। পরিবারসমূহের মধ্যে তা রক্ষক-পোষ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আর সবশেষে বলা যায়, বাধ্যবাধকতামূলক এই গৃহস্থকর্ম একটি শিশুর জন্য নিরাপদে একটি বাড়িতে থাকার উপায়ও বটে। ওই শিশুর পিতামাতা তাকে যথাযথভাবে নিরাপত্তা দিতে পারে না। কারণ তারা বাস করে খোলামেলা জায়গায়, যেসব প্রতিবেশী তাদের থাকে তারা নির্ভরযোগ্য নয় কিংবা কর্মসূত্রে তারা সারা দিন ঘরের বাইরে থাকে বলে শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য কেউ থাকে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০/১১ বছর বয়স থেকেই তাদের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনটি ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। ৬/৭ বছর বয়সে মেয়েরা দিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা তত্ত্বাবধান ছাড়া থাকার ব্যাপারে মোটামুটি প্রস্তুত থাকে। মেয়েদের ব্যাপারে বড় বিপদের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই তাদের যৌনতার সঙ্গে জড়িত। বালকেরা যৌন হয়রানির শিকার হবে এমনটা ভাবা হয় না, তাদের জন্য অপেক্ষা করে অন্যতর বিপদ।

পোষক-পোষ্য সম্পর্কের উৎস হল গ্রাম

শহরে কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার আছে, গ্রামে যাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি থাকে। এসব জমি বর্গাপ্রথার মাধ্যমে চাষাবাদ হয়। ভূমিমালিক ও বর্গাচাষির মধ্যে বিদ্যমান এই পোষক-পোষ্য সম্পর্কের থাকতে পারে কয়েক প্রজন্মব্যাপী এক দীর্ঘ ইতিহাস। ভূমিমালিকেরা তাদের শহরের বাড়িতে কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য বর্গাচাষিদের সন্তানদের নিয়োগ করতে পারে। এভাবে যেসব শিশুকে নিয়োগ করা হয় সেসব শিশু এ কাজ পছন্দ করুক না না করুক, তা প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মস্থল থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকে অল্পই। নির্ভরশীলতামূলক এক সম্পর্কের পাকে বাঁধা থাকে তারা, যে সম্পর্ক তারা সৃষ্টি করেনি এবং যে সম্পর্ককে ছিন্ন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রসঙ্গত এখানে ষোড়শী বালিকা রোকেয়ার ইতিহাস তুলে ধরা যায়। রোকেয়া তার পরিবারের ছয় ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। তার পিতা একজন বর্গাচাষি। যে ব্যক্তির জমি তার পিতা চাষ করে সেই ব্যক্তির ঢাকাস্থ

বাড়িতে রোকেয়া কাজ করে। বহু বছর যাবৎ সে ওই গৃহে কর্মরত আছে। রোকেয়ার পিতাও তার শিশুকালে এই একই বাড়িতে গৃহভৃত্য হিসেবে কর্মরত ছিল।

রোকেয়া যখন ঢাকায় আসে তখন তার বয়স আট বছর। তাকে আনা হয় বর্তমান গৃহকর্তার মায়ের বাড়িতে কাজ করার জন্য। সেখানে সে চার বছর কাজ করে। বারো বছর বয়সে তার পিতা তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বিয়ে দেয়ার জন্য। নিয়োগকর্তার কাছ থেকেই আসে বিয়ের খরচ। চৌদ্দ বছর বয়সে রোকেয়া একটি শিশুর জন্ম দেয়। সে একটি মৃত শিশু প্রসব করে। ফলে রোকেয়া নিজেকে চিরকালের জন্য অপয়া 'মহিলা' বলে মনে করে। তার স্বামী তাকে তালাক দেয়। ফলে রোকেয়া আবার পিতৃগৃহে ফিরে আসে। পিতৃগৃহে তাকে অনাহূত বাড়তি বোঝা হিসেবে মনে করা হয়। চৌদ্দ বছর বয়সী একটি তালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে নিয়ে একজন গরিব পিতা কী করতে পারে? ফলে রোকেয়াকে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজের জন্য আবার ঢাকায় পাঠানো হয়। এবার তাকে রাখা হয় সাবেক গৃহকর্ত্রীর পুত্রের পরিবারে। ওই পুত্র সদ্যবিবাহিত।

নতুন গৃহকর্তার পরিবারে অর্থাৎ শিশুহীন এক নবদম্পতির পরিবারে রোকেয়ার জীবন কাটে খুবই অসুখী অবস্থায়। যে খাদ্য তাকে দেয়া হয় তা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই অনুৎকৃষ্ট। ওই পরিবারের নববিবাহিতা বধূ যখন প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘরের বাইরে থাকে তখন রোকেয়াকে ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়। একবার এই দম্পতি সাতদিনের জন্য তাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে ঢাকার বাইরে বেড়াতে যায়। রোকেয়াকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়া হয় না কিংবা কারো সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয় না। তাকে টেলিভিশন দেখতে দেয়া হয় না, এমনকি তাকে রোকেয়া বলে ডাকাও হয় না। তার নতুন নাম দেওয়া হয় হামিদা। রোকেয়া রান্না করে, ঘরবাড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, কাপড়-চোপড় ধোয় এবং ওই পরিবারের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে। একটি কাজ সে বিশেষভাবে অপছন্দ করে; প্রতি রাতে তাকে তার গৃহকর্ত্রী নববধূর শরীর টিপে দিতে হয়।

এক অতিথি একবার রোকেয়াকে একটি সুন্দর শাড়ি কিনে দেয়। তার গৃহকর্ত্রী তাকে ওই শাড়ি পরতে নিষেধ করে। কারণ শাড়িটি পরলে রোকেয়া খুবই আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে। রোকেয়া একদিন নিষেধ অমান্য করে শাড়িটি পরলে গৃহকর্ত্রী কাঁচি দিয়ে নির্মমভাবে শাড়িটি টুকরো টুকরো করে ফেলে।

এর দু' তিন মাস আগে গৃহকর্তা রোকেয়াকে বলাৎকারের চেষ্টা করে। কিন্তু রোকেয়া তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করলে গৃহকর্তা তাকে ছেড়ে দেয়।

রোকেয়া গৃহকর্ত্রীকে যখন এই ঘটনার কথা জানায় তখন গৃহকর্ত্রী খুবই ভেঙে পড়ে এবং স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে, কিন্তু সে রোকেয়ার পক্ষ নেয় না। পরদিন বরং উল্টো সে রোকেয়াকে প্রলুব্ধকারী হিসেবে অভিযোগ করে। ফলে দুই মহিলার মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। এরপর থেকে গৃহকর্ত্রী রোকেয়াকে প্রায়ই প্রহার করে। মাঝে মাঝে এই প্রহার এমন চরমে পৌঁছে

যে, রোকেয়ার পক্ষে হাঁটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের গবেষকগণ একবার তার সঙ্গে দেখা করার সময় তার গায়ে প্রহারের দাগ দেখতে পান।

ঈদোৎসবের আগে রোকেয়ার বাবা ঢাকায় আসে। গৃহকর্তা তাকে ২০০ টাকা ও দুটি শাড়ি দেয় (রোকেয়াকে কোনো বেতন দেয়া হয় না)। রোকেয়া কাঁদে এবং তার বাবাকে বলে যে, এ বাড়িতে কাজ করে সে খুবই অসুখী, সে এ কাজ ছেড়ে দিতে চায়। গৃহকর্ত্রী পৃথকভাবে রোকেয়ার পিতাকে রোকেয়ার তথাকথিত অসদাচরণের (বলাৎকারের চেষ্টার কথা উল্লেখ করে) কথা জানায়। রোকেয়ার পিতা গৃহকর্ত্রীর পক্ষ নেয়, এমনকি গৃহকর্ত্রীর সামনেই তার মেয়ের গালে চড় মারে এবং বলে যে, এই পরিবারের সম্মান নষ্ট হয় এমন কিছু যদি করে তাহলে রোকেয়াকে সে মেরে ফেলবে।

এই শেষের ঘটনার আগে রোকেয়ার পিতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সে বলে যে, গৃহকর্তার পরিবার যদি তার ওপর বিরূপ হয় তাহলে তা মোকাবেলা করার সাধ্য তার নেই। কারণ বেঁচে থাকার জন্য তাদের জমির ওপর সে পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া গ্রামে রোকেয়াকে নিয়ে সে কী করতে পারে? এই একই পরিবারে শিশুকালে সে যেমনটা ভোগ করত রোকেয়াকেও তারই মতো তেমনি মার সহ্য করতে হবে। এছাড়া উপায় কী?

রোকেয়ার গৃহকর্ত্রী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেনি, তবে তার স্বামীর রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। রোকেয়ার স্বামীর একটি নিয়মিত চাকরি আছে এবং দম্পতি বেশ স্বচ্ছন্দভাবে জীবন যাপন করছে।

বাবা-মা'র নৈকট্য হারানো শিশুদের কথা

অধিকাংশ গৃহভৃত্যকেই তাদের নিজ পরিবারে খুব কমই দেখা যায়। বছর বড়জোর একবার তাদের বাড়ি যেতে দেয়া হয়। কিছু কিছু শিশু আছে যারা একেবারেই বাবা-মা'র সাহচর্য থেকে দূরে চলে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি একটি শিশুর জন্য প্রায় নিশ্চিতভাবে ব্যাপক হয়রানির নামান্তর হয়ে ওঠে। এর ফলে ওই শিশুর সাহায্যে তার পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকে না। পিতামাতারা, বিশেষত গ্রামের অশিক্ষিত মায়েরা তাদের মেয়েদের নিরাপত্তা দানে অসমর্থ হতে পারে।

এ ধরনের একটি ঘটনার কথা শোনা গেছে খিলগাঁও বস্তিতে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে রিনা নামে ত্রিশের কাছকাছি বয়সের গ্রামের এক অশিক্ষিত মহিলা, তার স্বামী মারা গেলে, তিন সন্তানকে নিয়ে ঢাকা আসে। এই বিরাট শহরে নতুন আসায় সে বসবাসের জন্য এমন একটি এলাকা বেছে নেয় যেখানে তার এলাকার পরিচিত লোকজন আছে। সে নিজে একটি হোটেলে কাজ খুঁজে পায় এবং তার ১১ বছর বয়সী মেয়ে জ্যোৎস্নাকে নিকটবর্তী এক বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজে নিয়োগ করে।

কাজ শুরুর দুই মাস পরে জ্যোৎস্না তার গৃহকর্তাকে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেদিন কোরবানির ঈদ এবং ওই গৃহকর্তা রিনাকে একটি শাড়ি ও কিছু কোরবানির মাংস দেয়। জ্যোৎস্নার গৃহকর্তা রিনাকে জানায় যে, তারা শীঘ্রই বাসাবদল করে শহরের আরেক প্রান্ত মিরপুরে যাবে। রিনাকে বলা হয় যে, রিনা যেহেতু অশিক্ষিতা এবং কোনোক্রমেই পড়তে পারবে না সেহেতু তাকে নতুন ঠিকানা দিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহকর্তা তাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, নতুন বাসায় ওঠার পরপরই জ্যোৎস্নাকে তা মা'র সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে আসা হবে।

রিনা কয়েক মাস অপেক্ষা করে। প্রতিদিনই সে পথ চেয়ে থাকে যে, জ্যোৎস্নার গৃহকর্তা তার মেয়েকে নিয়ে আসবে কিংবা অন্তত মেয়ের খবর তাকে জানাবে। জ্যোৎস্নার গৃহকর্তা আগে যেখানে ছিল সেখানকার প্রতিবেশীদের কাছে রিনা খোঁজ-খবর নেয়, তার মেয়েকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কিন্তু তারা কোনো খোঁজ দিতে পারে না। তারপর একদিন সে অনেক টাকা খরচ করে একটি স্কুটার ভাড়া করে মিরপুরে যায়, সেখানকার বাজারের স্থানসমূহে তার মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ করে। কোনো খোঁজ না পেয়ে সে থানায় যায় এবং ঘটনার কথা বলে। রিনা এক বছর আশা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে। তার বিশ্বাস, তার মেয়ে যদি বেঁচে থাকে এবং মুক্ত থাকে তাহলে পরবর্তী ঈদের দিনে অবশ্যই তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু রিনার অপেক্ষা বৃথা যায়; জ্যোৎস্না আর কখনও ফিরে আসে না। শেষ পর্যন্ত রিনা পীর-ফকিরদের কাছে ধরনা দেয়। সে মাদুলি ধারণ করে, ধর্মীয় বিধি-বিধান মান্য করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ যেন তার মেয়েকে ফিরিয়ে আসেন! কিন্তু তার কোনো প্রচেষ্টাই কোনো কাজে আসে না।

১৯৯৫ সনের অক্টোবর মাসে আমাদের গবেষকদলের এক সদস্য রিনার সঙ্গে আবার দেখা করেন এবং এই কাহিনীর দুঃখজনক পরিণতির কথা শোনেন। দুই বছরের অধিককাল পরে রিনা তার কন্যার গৃহকর্তাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারে। গৃহকর্তা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বলে, "তোমার মেয়ে হারিয়ে গেছে। তোমার যা ইচ্ছা তাই ভাবতে পার, তুমি ভাবতে পার যে, আমরা তাকে মেরে ফেলেছি বা আমরা তাকে বিক্রি করে দিয়েছি, কিন্তু সে কোনোদিন আর ফিরে আসবে না। পুলিসের কাছে যাওয়ারও কোনো যুক্তি নেই, বরং তার চেয়ে তুমি তার দাম নাও। আমরা তোমাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছি।" রিনাকে তারা ১০ হাজার টাকা দিতে চায়। রিনার মেয়ে যদি ওই গৃহকর্তার কোনো ভুলের কারণে হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তারা এত বড় অঙ্কের অর্থ দেয়ার প্রস্তাব করত না। একটি বালিকাকে পতিতালয়ে বিক্রি করার মাধ্যমেও এত বেশি টাকা পাওয়া যায় না। তাহলে জ্যোৎস্নার ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? শিশু হারিয়ে যাওয়ার এমন কত ঘটনা ঘটে, যা এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দানের মাধ্যমে সুরাহা করা হয়। একাদশ অধ্যায়ের বর্ণিত হোসনে আরার ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার তুলনা করা যায়।

খিলগাঁও বস্তি থেকে আমরা আরেকটি ঘটনার কথা শুনেছি। সেখানে আর এক মা-ও অসহায়ত্বের কারণে নিজ কন্যাকে রক্ষা করতে পারেনি। এই মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এবং তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে না জানিয়ে তার আগের পক্ষের ১১ বছর বয়সী কন্যাকে অন্য কারো হাতে সঁপে দেয়। ওই স্বামীর যুক্তি হল, এখন সে যেহেতু পরিবারের কর্তা সেহেতু এ কাজ করার অধিকার তার আছে। আমরা যখন এই ঘটনা শুনি তার দু-মাস আগেই মেয়েটিকে বিলিয়ে দেয়া হয়। মেয়েটি সম্পর্কে কোনো খবরই তার মা জানত না। কোথায় মেয়েটি আছে তা-ও জানত না। স্বামীর কাছে সে বারবার জানতে চেয়েছে, অনুনয়-বিনয় করেছে কিন্তু তার স্বামী মেয়েটিকে কোথায় পাঠিয়েছে তা স্ত্রীর কাছে বলতে অস্বীকার করে। ওই স্বামীটি ছিল আলসে এবং ষণ্ডা প্রকৃতির। স্ত্রীর আয়ে সে জীবন নির্বাহ করত এবং তার স্ত্রী যাতে তাকে ছেড়ে চলে যেতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই সে এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করত।

আগেই বলা হয়েছে, শিশু গৃহপরিচারিকা যাদের সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা অরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং ব্যাপক হয়রানির শিকার হয়। ডালিম এ রকমই এক মেয়ে। এই মেয়ে কয়েকজন মধ্যস্থতাকারীর হাত হয়ে গৃহপরিচারিকা নিযুক্ত হয়। আর এভাবে দুই বছরেরও অধিককাল যাবৎ তার সঙ্গে পরিবারের কোনো যোগাযোগ থাকে না।

ডালিমের বয়স ১২ বছর। সে এসেছে বরিশাল থেকে। বাবা-মা'র ৬ সন্তানের মধ্যে সে দ্বিতীয়। তার পরিবার খুবই গরিব। ডালিম যখন বাড়ি থেকে আসে তখন তার বয়স ছিল ১০ বছর। তাদের গ্রামে শ্বশুরবাড়ি এমন এক মহিলা ওই গ্রামে গেলে ডালিমের মা গৃহপরিচারিকা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তাকে অনুরোধ জানায়। আর তারই ফলে ডালিমের ঢাকায় আসা হয়। ওই মহিলা থাকে বরিশালে। সে ডালিমকে সঙ্গে আনতে সম্মত হয়। কিন্তু যেহেতু তার নিজের আগে থেকেই গৃহপরিচারিকা ছিল এবং অতিরিক্ত একজনের প্রয়োজন ছিল না সেহেতু ডালিমকে সে ঢাকায় তার বোনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ওই বোন আবার তার দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় ডালিমকে কাজ দেয় এবং সেখানেই ডালিম থাকে।

দু' বছর যাবৎ ডালিমের সঙ্গে তার পরিবারের দেখা-সাক্ষাৎ নেই, এমনকি সে নিজ পরিবারের কোনো খবরও জানে না। কেউ তার খোঁজও করে না। এসব কারণে সে অসুখী এবং তার মায়ের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে মরিয়া হয়ে ওঠে। রোকেয়ার মতোই তার সঙ্গে দাসের মতো ব্যবহার করা হয়। গৃহকর্তার পরিবার বাইরে গেলে তাকে তালাবদ্ধ করে রেখে যায়, তাকে খেতে দেয় নিম্নমানের খাবার এবং মাঝেমধ্যে প্রহারও করা হয়। তাকে কখনও বাসার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না কিংবা টেলিভিশনও দেখতে দেয়া হয় না। নিজের বাড়িতে যা খেতে পারত বা যে পরিবেশে বাস করত তার চেয়ে গৃহকর্তার বাড়িতে সে যা পাচ্ছে তা হয়তো উন্নত, কিন্তু গৃহকর্তার পুরো পরিবারের সঙ্গে তার সে সম্পর্ক তাতে সে খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং মনমরা হয়ে থাকে। সে কেবল একটি চাকরানী। তাকে যত্ন বা দেখাশোনা করার কেউ নেই। আমাদের গবেষকরা তার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা করেন তার এক মাস আগে সে গৃহকর্তা কর্তৃক ধর্ষিত হয়। তখন গৃহকর্ত্রী

বাসায় ছিল না। সে এ কথা কাউকে বলেনি। কেননা সে জানে, যদি সে এ কথা বলে দেয় সে কোনো সহানুভূতি পাবে না এবং এতে তার অবস্থার কোনো উন্নতিও হবে না। ডালিমকে সাহায্য করার তো কেউ নেই।

ডালিম বলে, "কখনও যদি দরজা খোলা পাই তো দৌড়ে পালিয়ে যাব।" দু' বছর আগে সে লঞ্চে করে ঢাকা এসেছিল, সুতরাং তার বিশ্বাস, কেউ না কেউ তাকে নদীতীরের লঞ্চঘাটের পথ দেখিয়ে দেবে এবং লঞ্চে চড়ে সে আবার বরিশাল যেতে পারবে।

এতিমদের অবস্থা

বাংলাদেশে বাপ-মা-হারা গরিব শিশুদের এতিমখানায় বসবাসের পরিবর্তে গৃহভৃত্য হিসেবেই নিযুক্ত থাকতে বেশি দেখা যায়। এতিমখানায় ভর্তি হতে গেলে সাধারণত বয়স্ক লোকদের সহায়তা, ঘুষ ও সুপারিশের প্রয়োজন হয়। হক (১৯৯১:৯) কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, তিনি যেসব শিশুর ওপর জরিপ চালিয়েছেন তার ৮৫ ভাগেরই মা বর্তমান। ওই লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের এতিমখানাগুলো দেশের ৫ ভাগের বেশি এতিমের যত্ন নিতে পারে না।

এখানে আমরা সীমা নামে ৮ বয়সী একটি বালিকার কাহিনী তুলে ধরব। ১৯৯১-এর ঝড়ে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল আক্রান্ত হলে সীমা তার বাবা-মা উভয়কে হারায়। সীমা তার গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে যখন ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সেই অবস্থায় আমাদের একজন গবেষকের সঙ্গে তার দেখা হয়। পরবর্তীকালে তার গৃহকর্তা ও তিন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের গবেষকের কথা হয়।

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পরে চট্টগ্রামে নিযুক্ত নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তার ড্রাইভার সীমাকে একটি রিলিফ ক্যাম্পে দেখতে পায়। ওই সময় তার বয়স মাত্র ৫ বছর। ড্রাইভার বলে যে, সে সীমার বাবা-মাকে চিনত এবং সে এ-ও জানে যে, সীমার বাবা-মা দুজনেই মারা গেছে। সুতাং সে তার প্রভু কর্মকর্তার কাছে শিশুটিকে সোপর্দ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। ওই নৌ কর্মকর্তার স্ত্রী সীমাকে ঢাকায় তার বোনের বাসায় পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তী তিন বছর সীমা এদের দু' বোনের গৃহেই কাজ করে আসছে। বর্তমানে সীমা যে বাসায় কাজ করছে তার গৃহস্বামী একজন প্রকৌশলী। গৃহকর্ত্রীর বয়স ২৭ বছর, তিনি সংগীতশিল্পী এবং মাঝে মাঝে রেডিওতেও তাঁর প্রোগ্রাম থাকে। এঁদের দুটি কন্যা, একটির বয়স ৪ বছর, আরেকটির ৬ বছর।

সীমা দেখতে ছোটখাট একটি বালিকা। কখনও মুখে তার হাসি নেই। তার বর্তমান গৃহকর্ত্রী তাকে নিয়মিতভাবে প্রহার করে। প্রহারের ঘটনাগুলো ঘটে এত বেশি মাত্রায় যে, প্রতিবেশীরা সকলেই এ সম্পর্কে জানে। নানাভাবে সীমার ওপর নির্যাতন চলে। কখনও হাত দিয়ে তাকে মারা হয়, কখনও গরম খুন্তি দিয়ে পোড়ানো হয় তার শরীর, কখনও আঘাত করা হয় জুতো দিয়ে অর্থাৎ যখন হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে মারা হয়। পোড়ানো ও প্রহারের দাগে ভরা

তার পিঠ। পানি ঘাঁটতে ঘাঁটতে ক্ষতে ভরে গেছে তার দুই হাত। একবার এক ঘটনায় সীমাকে বাথরুমে আটকে রাখা হয় এবং না খাইয়ে রাখা হয়। সীমাকে কখনও বাইরে যেতে দেয়া হয় না, এমনকি ময়লা ফেলার জন্যও বাইরে পাঠানো হয় না। গৃহকর্তার পরিবারের লোকজন যখন বাইরে যায়, তখন তাকে তালাবদ্ধ করে রেখে যাওয়া হয়। তার গৃহকর্ত্রীর ভাষায়, সে একটি ক্ষুদে শয়তান! তাকে যদি তালাবদ্ধ করে রাখা না হয়, তাহলে সে চুরি করে পালাবে।

সীমাকে প্রহারের বিষয়টি একবার কথায় কথায় উঠে পড়লে গৃহকর্ত্রীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, তিনি খুবই রাগী প্রকৃতির এবং একবার রাগলে নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তিনি আরও বলেন, সীমা খাবার "চুরি করে" খায়। সীমার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী দেখা যায়, সে প্রায়ই ক্ষুধার্ত থাকে এবং সেজন্য মাঝে মাঝে চুরি করে খায়। সীমা এই পরিবারের একমাত্র কাজের মেয়ে এবং অধিকাংশ কাজ তাকেই করতে হয়।

সীমার ওপর যে নিপীড়ন চালানো হয়, গৃহকর্তার দুই মেয়ের ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। ছ বছর বয়সী বড় মেয়েটি মায়ের পক্ষ নেয় এবং সে-ও সীমাকে মারে। যদিও বয়সে সে ওই মেয়েটির চেয়ে দু'বছরের বড়, কিন্তু যেহেতু সে চাকর সেহেতু সে কখনও এর প্রতিশোধ নিতে পারে না। অন্যদিকে চার বছর বয়সী ছোট মেয়েটি সীমার প্রতি সহানভূতিপরায়ণ। নির্যাতনের ঘটনায় সে কষ্ট পায় এবং সীমাকে যখন মারা হয় তখন সে কাঁদে।

একদিন সীমাকে এমনভাবে প্রহার করা হচ্ছিল এবং তার আর্তনাদ ছিল এমনই তীক্ষ্ণ যে, বাইরে অপেক্ষমাণ গাড়ির এক ড্রাইভার এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। এর পরের সপ্তাহে একই ঘটনায় একদল রিকশাওয়ালা প্রতিবাদে এগিয়ে আসে এবং এই মর্মে হুমকি দেয় যে, এভাবে প্রহার চলতে থাকলে তারা পুলিস ডাকবে।

সীমার ওপর এই নির্যাতনের বিষয়টি প্রতিবেশীদের মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিণত হয়। বাড়িওয়ালী প্রথমে একে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করতেন, কিন্তু তিনিও মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবাদ করা শুরু করেন, বলেন যে, এতে তার বিল্ডিংয়ের সুনামহানি হচ্ছে। এসব প্রতিবাদের পরও প্রহার চলতেই থাকে, তবে প্রহার করা হয় ঘরের দরজা বন্ধ করে, বিশেষভাবে বাথরুমের মধ্যে নিয়ে। প্রহার করা হয় সীমার মুখ বেঁধে যাতে কোনো শব্দ শোনা না যায়। ১৯৯৪ সালের ২৪ আগস্ট তারিখে সীমাকে বেদম প্রহার করা হয়। পরদিন তার গৃহকর্ত্রী টেলিফোন ধরতে গেলে দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায় এবং সেই সুযোগে সীমা পালিয়ে যায়।

সীমার কাহিনী বহু প্রশ্নের জন্ম দেয়। একটি শিশু গৃহপরিচারিকাকে নির্যাতনের বিষয়টি কখন সামাজিক ইস্যু হয়ে ওঠে? সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সীমার আর্তনাদ শুনেছে প্রতিবেশীরা, কিন্তু কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। কারণ তাদের ধারণা, মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহমধ্যে যা ঘটে তা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কেবল ওই পরিবারেরই ব্যাপার। মজার ব্যাপার হল, প্রথম প্রতিবাদটি কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আসেনি, এসেছে গাড়িচালক ও রিকশাওয়ালাদের মধ্যে

থেকে অর্থাৎ এমন সব লোক প্রতিবাদ করেছে যাদের সঙ্গে একটি গৃহভৃত্যের সামাজিক শ্রেণিগত দূরত্ব বেশি নয়।

গৃহভৃত্যদের যৌন হয়রানি করার ব্যাপারে পুরুষেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। অন্যদিকে গৃহকর্ত্রীরা ভিন্নরূপ নিপীড়নের মাধ্যমে নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করে। এ ধরনের নিপীড়ন কেন শিশু গৃহপরিচারিকাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়? এক্ষেত্রে সামাজিক নিন্দা কি নিয়োগকর্তাদের সংযত রাখতে সক্ষম হয়?

এখন সীমা কেথায়? তার পালানোর পূর্ব পর্যন্ত সীমার গৃহকর্তা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, সে এমন কোনো সম্পর্কে গড়ে তোলেনি যাতে তার কিছু বিকল্প সমর্থন পাওয়ার সুযোগ ঘটে। সীমা ঢাকা শহরের কিছু চেনে না। তার বয়স মাত্র ৮ বছর। সে কি রাস্তায় নিজেই নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করছে, নাকি, অন্য কারো অধিকারভুক্ত হয়েছে? পুলিশ যদি তাকে দেখে থাকে তাহলে কোনো ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠানো হতে পারে। তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে এমন কোনো সুন্দর লালন-পালনের ব্যবস্থা নেই, যাতে সীমার শৈশব ও ব্যক্তিবোধ (Personhood) সযত্নে রক্ষিত হতে পারে।

গৃহপরিচারিকা মায়েদের কাছ থেকে তাদের শিশুর সন্তানদের পৃথক করে রাখা হয়

যেসব মহিলা সার্বক্ষণিকভাবে 'বাঁধা কাজের মেয়ে' হিসেবে নিযুক্ত হতে রাজি হয় তাদের অনেকেই শহরে নবাগত। এ ধরনের মহিলাদের কোনো টাকা-পয়সা সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই এবং তারা নিজেদের জন্য আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করতেও সমর্থ নয়। তারা হতে পারে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা কিংবা পরিত্যক্তা। এ ধরনের মহিলাদের যদি সন্তানাদি থাকে তাহলে তাদের পরিত্যাগ করতে মোটামুটি বাধ্য করা হয়। 'বাঁধা কাজের মেয়ে' হিসেবে কর্মরত গৃহপরিচারিকার বয়স ও পারিবারিক দায়িত্ব যা-ই থাক না কেন, তার নিজস্ব কোনো জীবন মেনে নেয়া হয় না। এখানে সাত বছর বয়সী বালক বাচ্চু ও তার মায়ের কাহিনী তুলে ধরা হল।

বাচ্চুর বয়স যখন ৬ বছর তখন তার বাবা মারা যায়। গ্রামে জীবন নির্বাহের কোনো উপায় ছিল না তার মা'র। ফলে তার মা গ্রামের আরেক বয়স্কা মহিলার সঙ্গে ঢাকা চলে আসে। এই বয়স্কা মহিলা এর আগেই একটি বস্তিতে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। তার মা'র সঙ্গে বাচ্চুও ঢাকা আসে। ঢাকায় আসার দু' সপ্তাহ পরে বাচ্চুর মা 'বাঁধা কাজের মেয়ে' হিসেবে একটি কাজ পায়।

বাচ্চুর মায়ের গৃহকর্তা প্রথমে বাচ্চুকে রাখতে সম্মত হয়। কিন্তু কয়েক দিন পরে গৃহকর্ত্রী অন্যরকম সিদ্ধান্ত নেন। তার ছেলেমেয়েরা গ্রামের এই বালকের কাছ থেকে 'খারাপ' ভাষা শিখবে বলে তিনি ভয় পান এবং তিনি মনে করেন যে, এই বালক তার ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট প্রভাবিত করতে সক্ষম। গ্রামের গল্প শুনিয়ে বাচ্চু ওই গৃহের দুটি বালকের মন জয় করে ফেলেছে বলে গৃহকর্ত্রীর বিশ্বাস এবং তিনি সেটি মোটেই পছন্দ করেননি। তাছাড়া গৃহকর্তার আরেকটি বড় অসন্তোষের কারণ ছিল যে, বাচ্চু তখন পর্যন্ত চাকরের যথাযথ আচরণ শিখতে পারেনি। সে

সম্বোধনের যথার্থ ভাষা ব্যবহার করত না, চাকর-বাকরের জন্য অবশ্য-পালনীয় নিয়ম-নীতির সে ধার ধারত না এবং ওই গৃহে তার অবস্থান কোথায় তা সে জানত না। এ কথা ঠিক যে, এসব জ্ঞান নিয়ে কেউ জন্মায় না এবং গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণির শিশুরা অনেক বেশি খোলামেলাভাবে একত্রে মিলেমিশে খেলাধুলা করে। বাচ্চুর দিক থেকে এটুকু অন্তত তার আচরণের যুক্তি হতে পারে।

গৃহকর্তা যখন বাচ্চুকে তার বাসায় রাখতে চাইল না, তখন তার মা যে মহিলার সঙ্গে ঢাকায় এসেছিল তাকে অনুরোধ করে বাচ্চুকে দেখাশোনা করার জন্য। বিনিময়ে মাসে মাসে তাকে ৫০০ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে। এটি বাচ্চুর মায়ের বেতনের অর্ধেক। ওই মহিলা এতে রাজি হল। কিন্তু সে-ও খণ্ডকালীন ভিত্তিতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করে এবং দিনের অধিকাংশ সময়ই ঘরের বাইরে থাকে। তার নিজের ছেলেমেয়েরাও নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করে এবং দুপুরের খাবারের জন্য ভিক্ষা করে। ওই মহিলা চাইছিল যে, বাচ্চুও তার ছেলেমেয়েদের মতো একইভাবে দুপুরের খাবার সংগ্রহ করুক।

কিন্তু এ ধরনের জীবনে অভ্যস্ত ছিল না বাচ্চু। খাবার ভিক্ষা চাইতে তার ছিল ভীষণ লজ্জা। কিভাবে এ কাজে অভ্যস্ত হবে সেটা সে জানত না। সে চাইত তার মায়ের সঙ্গে থাকতে। প্রতিদিন সে তার মা যে বাড়িতে কাজ করত সেই বাড়ির দরজার বাইরে বসে কাঁদত। ঘরের ভেতরে তার মা থাকত অসহায় অবস্থায়। গৃহকর্তা দরজা বন্ধ করে রাখত।

ওই বাড়িতে যে লোকটি দুধ দিত সে প্রতিদিন বাচ্চুকে কাঁদতে দেখত। একদিন সে বাচ্চুর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হয়। বাচ্চুর মা তার সাহায্য কামনা করে। গৃহপরিচারকের একটি কাজ খুঁজে দেখার জন্য দুধওয়ালাকে অনুরোধ জানায়। আর এভাবেই দুধওয়ালার মাধ্যমে বাচ্চু ৭ বছর বয়সে গৃহপরিচারক নিযুক্ত হয়।

বাচ্চু আট মাস যাবৎ একটি বাড়িতে কাজ করছে। তার মা যে বাড়িতে কাজ করে সেই বাড়ি থেকে এই বাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটারের কিছু কম। কিন্তু এই আট মাসে তাকে একবারের জন্যও তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে দেয়া হয়নি। দুধওয়ালা একবার মায়ের খবর ছেলেকে দেয়, একবার ছেলের খবর মাকে দেয়।

বাচ্চুর সঙ্গে তার গৃহকর্তা খুব খারাপ ব্যবহার করে না। কিন্তু সে তার মাকে দেখার জন্য ভেতরে ভেতরে মরিয়া হয়ে ওঠে। গত মাসে তার জ্বর হয়েছিল এবং সে প্রলাপ বকেছে। বিকারের ঘোরে সে শুধু মা মা করেছে। বাচ্চুর গৃহকর্তা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও তার সঙ্গে মায়ের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়নি।

বাচ্চুর মা তার গৃহকর্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চায়, কিন্তু না খেয়ে থাকতে হবে এই ভয়ে সে তা পারে না। তার জীবনে তার ছেলেই সব কিছু, অথচ সেই ছেলেকেই সে দেখাশোনা করতে পারছে না।[৩]

বাচ্চুর মা যে অসহায়ত্বের শিকার হয়েছে, তা কল্পনাতীত। বাচ্চুর এই কাহিনী মহিলাদের অবরুদ্ধ অবস্থার পরিণতি, তাদের সীমিত সংকীর্ণ বিশ্ব (মাঝে মাঝে আদর্শ হিসেবে যাকে দেখা হয়), তাদের নিরক্ষরতাজনিত অসুবিধা এবং প্রথম ঢাকায় আসার পর তারা যে ধরনের শোষণের শিকার হতে পারে এ সবকিছুরই উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

দাসদের নিজস্ব কোনো পারিবারিক জীবন থাকুক সেটা স্বীকার করা হয় না। আর সে কারণে বাচ্চুর মা এবং আরও অনেক মহিলা যারা সামর্থ্যহীন (disempowered) তারা তাদের নিজেদের সন্তানকে দেখাশোনা করতে সক্ষম হয় না।

বাচ্চুর এই কাহিনীতে দুজন নিয়োগকর্তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যাঁরা পিতামাতা হিসেবে তাঁদের নিজের সন্তানদের লালন-পালন করে থাকেন। কিভাবে তাঁরা বাচ্চুর প্রয়োজন সম্পর্কে এমন নির্দয় হতে পারলেন? গৃহকর্তারা আসলে ৭/৮ বছরের এই বালককে একটি শিশু হিসেবে না দেখে দেখেছেন একটি ভৃত্য হিসেবে। এ ঘটনাটি অনান্য নয়। ছোট শিশুর নিয়োগকর্তারা তাদের ভৃত্যকে তার মায়ের সংস্পর্শে রাখতে অপছন্দ করেন। কারণ তাদের ভয়, এতে শিশুর মন নরম হয়ে যাবে, সে কাঁদবে এবং মায়ের সঙ্গে সে এঁটে থাকতে চাইবে। মাঝে মাঝে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মা ও তার সন্তানকে পৃথক করে রাখা হয়। শিশুদের 'বোঝানো' হয় যে, মাতৃসুলভ যত্ন ও স্নেহ অবশ্যই পরিহার করা উচিত, কেননা তারা ভৃত্য। স্নেহ ও ব্যক্তিগত পরিচিতি নিয়ে তাদের মধ্যে যে আকুলতা থাকে তা অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত কিংবা অন্তত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা উচিত। যারা ঈদের ছুটি উপলক্ষে কয়েক দিনের জন্য তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যায় তাদেরকে ওই ধরনের সাক্ষাতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়। পরিবারের সদস্যদের জন্য তাদের হাত দিয়ে নতুন কাপড়-চোপড় ও উপহারসামগ্রী পাঠানো হয়। বছরের এই কয়দিনের জন্য তারা নিজের গুরুত্ব ও কাজের সার্থকতা উপলব্ধি করে।

চোখ-মুখ ফুটতে না দেবার জন্য নজর রাখা

আমরা দেখেছি, গৃহকর্তারা যখন বাড়িতে থাকে না তখন বহু গৃহভৃত্যকেই তালাবদ্ধ করে রেখে যাওয়া হয়। তাদের প্রতি ব্যবহার করা হয় ঠিক বাড়ির প্রহরায় নিযুক্ত কুকুরের মতো। যাতে তারা না খেয়ে না থাকে সেজন্য তাদের কিছু খাবার দিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তারা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার সব শিশুই সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে তাদের অপছন্দের কথা বলেছে। অনেকেই এ অবস্থাকে বন্দিশালার মতো মনে করে।

বিদ্যমান সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী একজন গৃহপরিচারিকাকে তালাবদ্ধ করে রাখার বিষয়টিকে পর্দাপ্রথার সঙ্গে মিলিয়ে সহজেই যুক্তিযুক্ত করা যায়। তবে এই যুক্তি বালকদের অবরুদ্ধ করার ক্ষেত্রে খাটে না, অথচ বালক গৃহভৃত্যদেরও হরহামেশা তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। বাচ্চুর মায়ের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে, এ ধরনের অবরোধের বিষয়টি কেবল শিশুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকছে

না, তা আরোপিত হচ্ছে শহরে নবাগত বয়স্কা মহিলাদের ওপরও। এর কারণ, ওই সব মহিলা খারাপ লোক চিনতে এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি অনুধাবনে অক্ষম বলে মনে করা হয়।

গৃহভৃত্যদের তালাবদ্ধ করে রাখার দুটি প্রধান কারণ হল, চুরি ঠেকানো এবং গৃহকর্তা কর্তৃক আরোপিত নিয়ম-নীতি ও তার কর্তৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য বজায় রাখা। গৃহভৃত্যদের কখনওই পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করা হয় না। যেদিন তারা ঘরের বাইরে থাকে, বহু গৃহেই সেদিন তাদের জামা-কাপড় বিছানা-বাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয় ছোটখাট কিছু লুকিয়ে রেখেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। এটি খুবই অবমাননাকর আচরণ, যা গৃহভৃত্যদের অনির্ভরযোগ্য বহিরাগত হিসেবে তুলে ধরে।

অল্পবয়সী গৃহপরিচারিকা ও শহুরে নবাগত গ্রামীণ মহিলাদের পরিকল্পিতভাবেই অবরুদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাদের 'চোখ ফোটানো' ঠেকানোর জন্য বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। গৃহকর্তারা তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য যাতে বজায় থাকে সেজন্য সবকিছু করে থাকেন। গৃহকর্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ ভৃত্য হবে সে-ই যে কাজ বোঝার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিপক্ব এবং যথেষ্ট সহজ-সরল; কোনো আদেশ, তিরস্কার বা শাস্তির যে প্রতিবাদ করে না।

বহু শিশুকে অন্য ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয় না। তারা অন্যদের কাজের অবস্থার সঙ্গে যাতে নিজের অবস্থার তুলনা করার সুযোগ না পায় এবং অন্যদের তুলনায় অসুবিধার মধ্যে আছে এমন মনোভাব যাতে তাদের মধ্যে জাগতে না পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভৃত্যরা যাতে পুরোপুরিভাবে গৃহকর্তার ওপর নির্ভরশীল থাকে সেজন্য বিকল্প কোনো সহায়ক উৎস গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের বাধা দেয়া হয়। বাড়ির চার দেয়ালের ভেতরে কী ঘটছে সে কাহিনী ভৃত্যদের সূত্রে বাইরে যাক এটা গৃহকর্তারা চান না। এক্ষেত্রে গৃহকর্তাদের জীবনযাপন প্রণালীর কম মর্যাদাকর দিকগুলোর বাইরে প্রচার হওয়া সম্পর্কে যেমন উদ্বেগ থাকে তেমনি গৃহভৃত্যদের হয়রানি করায় বিষয়টি জানাজানি হওয়ার ভয়ও থাকে। যুক্তিসংগত কারণেই দেখা গেছে, আমরা সমীক্ষার সময় যেসব গৃহভৃত্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের মধ্যে যারা সবচে খারাপ আচরণের শিকার তাদের অবরুদ্ধ ও তালাবদ্ধ করে রাখা হয়।

গৃহকর্তারা একটি বিষয়ের ওপর এই বলে জোর দেন যে, তারা শিশু ভৃত্যদের বিকল্প অভিভাবক। শিশু গৃহভৃত্যদের অধিকাংশ বাবা-মা-ই যেহেতু দূরে গ্রামে থাকেন এবং কদাচিৎ তাঁদের সন্তানদের দেখতে আসেন সেহেতু গৃহকর্তারা বিপুল ক্ষমতা এক্ষেত্রে খাটান। একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ১৪ বছর বয়সী একটি বালিকা তার গৃহকর্তার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে নিজেই চাকরির ক্ষেত্র পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে। প্রথম নিয়োগকর্তা তাকে পুলিস দিয়ে গ্রেপ্তার করায় এই যুক্তিতে যে, এই বালিকার সমস্ত দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত এবং তারা তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না।

এরকম বহুবিধ উপায়ে গৃহকর্তারা গৃহভৃত্যদের জন্য একটি মুক্ত শ্রমবাজারের বিকাশ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এর কারণ হল, এমন একটি মুক্ত ব্যবস্থা গড়ে উঠলে গৃহস্থকর্মের ক্ষেত্রে উচ্চ চাহিদা সৃষ্টি হবে এবং কাজের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টির দাবি তীব্র হয়ে উঠবে। বয়স্ক গৃহপরিচারিকাদের পরিবর্তে গৃহকর্তারা যে শিশু গৃহভৃত্যদের বেশি পছন্দ করেন তারও কারণ হল, বয়স্কা মহিলারা ক্রমেই তাদের দাবি বাড়াতে থাকে। তারা কাজের বিনিময়ে তাদের স্বার্থের অনুকূল দাবিগুলোর জন্য চাপ দিতে থাকে। গৃহকর্তারা এসব দাবির যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে শিশু গৃহভৃত্যদের দিকে দৃষ্টি ফেরান। গৃহভৃত্যদের নিজস্ব জীবন এবং যথার্থ বেতনের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারে গৃহকর্তারা শিশুদের সহজেই এড়িয়ে যেতে পারেন কিংবা বিষয়টিকে বিলম্বিত করতে পারেন। এটা বিশেষভাবে ঘটে এ কারণে যে, গৃহভৃত্যদের পিতামাতা মনে করেন কষ্টকর কাজ তার সন্তানের যথাযথভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন এবং এসব গৃহস্থকর্ম মেয়েদের বিয়ে দেয়ার পূর্বে একটি ভালো প্রস্তুতিমূলক পর্ব।

চোখ-মুখ ফোটা এবং চালাক-চতুর হওয়া

বহু শিশু গৃহভৃত্যই, আজ হোক কাল হোক, তাদের ওপর গৃহকর্তাদের কর্তৃত্ব ও নৈতিক অধিকার খাটানো নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাদের অবস্থানকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে। তারা তাদের 'সাহায্য'-কে 'কাজ' হিসেবে মূল্যায়নের দাবি করে এবং সেজন্য বেতনও দাবি করে।

আলেয়া, ১৬ বছর বয়সী এক মেয়ে; সে মনে করে, ব্যবহৃত হওয়ার, হয়রানির শিকার হওয়ার এবং প্রতিবাদ করতে ভয় পাওয়ার স্তর সে পেরিয়ে এসেছে। তার ভাষায়, "আমি এখন 'চালাক' হয়েছি। আমাকে এখন আর কেউ নির্যাতন করতে পারবে না।" সে নিজেই একটি পরিবারে তুলনামূলকভাবে ভালো একটি চাকরি খুঁজে বের করেছে। ওই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে, তাদের দিক থেকে কড়াকড়ি নিয়ম নেই, তারা সংসার চালানোর দায়িত্ব তার ওপর বিশ্বাসভরে ছেড়ে দিয়েছে এবং তারা যখন কাজের জন্য বাইরে থাকে তখন তাদের দুই শিশুসন্তানকে দেখাশোনার ভারও তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। তাকে মাসে মাসে ২০০ টাকা করে বেতন দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হয়েছে, এটা আরও বাড়ানো হবে। তবে 'চালাক হওয়া'র এই স্তরে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে আলেয়াকে এক দীর্ঘ ও কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

আলেয়ার পাঁচ বছর বয়সে তার মা মারা যায়। তার পিতা দ্রুত পুনর্বিয়ে করে এবং আলেয়াকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ধনীগৃহে কাজে রাখে। সাত বছর যাবৎ আলেয়া ওই বাড়িতে কাজ করে। তার বাবা মাঝেমধ্যে যেখানে যেত, কিন্তু আলেয়া কেমন আছে তার তত্ত্ব-তালাশ জানতে যেত না, যেত আলেয়ার গৃহপ্রভুর কাছ থেকে কাপড়-চোপড় বা টাকা-পয়সা আনার দাবি নিয়ে। আলেয়া তার বাবার বাড়িতে আর কখনও ফিরে যায়নি। এগার বছর বয়সে সে তার মনিবের সতের বছর বয়সী পুত্র কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। এ কথা সে কাউকে বলেনি। কারণ সে জানত, একথা বললে 'নষ্ট' মেয়ে বলে সে আখ্যায়িত হবে এবং কেউ তাকে সাহায্য করবে না। এর ৬ মাস পরে সে তার

আসল মনিব (প্রথম ধর্ষণকারীর পিতা) কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। এই শেষোক্ত অভিজ্ঞতা আলেয়াকে গভীরভাবে মানসিক দিক থেকে আহত করে। সে পাঁচ বছর বয়স থেকে ওই বাড়িতে আছে এবং এই লোকটিকে 'পিতা' সম্বোধন করে আসছে। ওই লোকটির সঙ্গে পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক তার। এমন একটি যন্ত্রণাকর ও চরম বিরূপ অভিজ্ঞতার পর আলেয়া অনুভব করে যে, সে একা এবং বলে যে, সে কখনও আর কাউকে বিশ্বাস করবে না।

মনিব কর্তৃক ধর্ষিতা হওয়ার পরবর্তী সকালে সে কাউকে কিছু না বলে বড় শহর ঢাকায় চলে আসে। ঢাকায় সে নিজেই একটি চাকরি খুঁজে বের করে। কিন্তু আবারও সে, ১৪ বছর বয়সে, আরেক গৃহপ্রভৃ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয় এবং আবারও সে কাউকে কিছু না বলে ওই গৃহ ত্যাগ করে।

এ ধরনের যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠে আলেয়া এবং 'চালাক' হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে, তাকে একাই তার স্বার্থ দেখতে হবে। বিয়ে নয়, বরং একটি ভালো চাকরি-ই তার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সারা জীবনই সে গৃহপরিচারিকা থাকবে তা-ও সে চায় না। সে গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিক কিংবা কোনো হাসপাতালের সেবা-সহকারী হতে চায়। আলেয়া তার বাবার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেনি। কেননা এই বাবা তাকে অতি অল্পবয়সে পরিত্যাগ করেছিল। প্রকৃত অবস্থা হল, সে বাবা-মা'র কোনো কর্তৃত্বাধীনে নেই। ফলে সে আত্মনির্ভরতার এক অবাধ সুযোগ লাভ করেছে। তবে এর মানে এ-ও নয় যে, তার কোনো নিরাপত্তা নেই। তবে কথাকথিত সভ্য সমাজ গরিব মেয়েদের যে নিরাপত্তা দেয় তা নিয়ে আলেয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। এ সম্পর্কে তার ভালো অভিজ্ঞতা আছে। সে এই সমাজের ভেতর ও বাইরে দুটো সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এ কারণে সে এই সমাজ ছাড়াই চলতে চায়।

পূর্বতন চার মনিব সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলেয়া বলে যে, প্রতিদিনই সে এদের সকলের কাছ থেকে মৌখিকভাবে তিরস্কারের সম্মুখীন হত এবং সে যে হীন ও তুচ্ছ সেই উপলব্ধির সম্মুখীন হত। প্রথম ও দ্বিতীয় মনিব তাকে নিয়মিতভাবে প্রহার করত। প্রথম ও তৃতীয় মনিবের গৃহে সে ধর্ষিতা হয়। আলেয়ার বিশ্বাস, অন্য অধিকাংশ গৃহপরিচারিকার চেয়ে অতি দ্রুত সে 'চালাক' হতে পেরেছে, তার কারণ সে কখনওই পুরোপুরিভাবে অবরুদ্ধ ছিল না, এমনকি তার ধারণা, একটি কিশোরী গৃহপরিচারিকার 'চালাকে'র স্তরে পৌঁছতে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগে।

যে যন্ত্রণাকার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আলেয়া অগ্রসর হয়েছে তার সঙ্গে দৌলতদিয়ার পতিতালয়ে আমরা যেসব অল্পবয়সী বারবনিতার দেখা পেয়েছি তাদের বহু মিল আছে। এ ধরনের কষ্টকর জীবনসংগ্রাম ও সম্ভ্রমহানির মধ্য দিয়ে যারা বেঁচে থাকে, তারা বয়স অনুযায়ী খুবই পরিপক্ব হয়, মনের দিক থেকেও তারা বেশ শক্তির অধিকারী হয়। আমরা যদি এসব অল্পবয়সী মেয়েদের অনুসরণ করি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবন পর্যন্ত, তাহলে অনেক চমকপ্রদ বিষয়ই আমাদের চোখে পড়বে। আমরা দেখতে পাব, ক্ষতবিক্ষত শৈশব তাদের জীবনের ওপর কী গভীর ছাপ রেখে

গেছে! কিন্তু পাশ্চাত্যে যেমনটা হয়, বাংলাদেশে এ ধরনের বিষয়ের ওপর তেমন গবেষণা পরিচালিত হতে দেখা যায় না।

আলেয়ার কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায় রোকেয়ার কাহিনীর। দুজনে একই বয়সের অধিকারী। তবে রোকেয়া 'চালাক হয়ে ওঠা'র স্তরে উপনীত হয়নি। তার চোখ ফুটেছে আংশিকভাবে। অন্যদিকে সে পীড়নের শিকার হচ্ছে দু'দিক থেকে। যেমন তার মনিব তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং তার বাবা তার এই ভোগান্তিকে কোনো গুরুত্বই দেয় না। রোকেয়ার বাবা চায় যে, পরিবারের উপার্জনের স্বার্থে সে নির্যাতন সয়েও ওই গৃহে কাজ করুক। আলেয়ার মতো বুদ্ধি ও আভ্যন্তর শক্তি রোকেয়ার নেই, অন্তত তখন পর্যন্ত ছিল না। সে তখনও তার নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য তার বাবার ওপর নির্ভরশীল এবং ওই দরিদ্র লোকটি তা করতে আগ্রহী নয়।

গৃহভৃত্যরা যে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়, তা কি বাড়ানো কথা?

যতগুলো ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে তার মাত্র কয়েকটির বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, হয়রানির যে চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে তা ঢাকা শহরের শিশু গৃহভৃত্যদের গড়পড়তা পরিস্থিতির এক অতিরঞ্জিত চিত্র। এটা সত্য যে, অতিমাত্রায় হয়রানির শিকার হয়েছে এমন কিছু শিশু গৃহভৃত্যের বিবরণই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পিতভাবেই তা করা হয়েছে মূলত এটা দেখানোর জন্য যে, এ ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটছে 'স্বাভাবিকভাবে' এবং সম্মানিত মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহে। গৃহকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন ও বিচিত্র মাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি আছে এ কথা যখন স্বীকার করা হয় তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, শিশু গৃহভৃত্যরা নিঃসন্দেহে শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত শ্রেণির অন্যতম। এ কেবল গবেষকদের কথা নয়, শিশুরাও তাই মনে করে। সার্বিক নমুনায় দেখা গেছে, মেয়েদের অর্ধেক এবং ছেলেদের এক-তৃতীয়াংশ বলেছে, তারা তাদের গৃহকর্তাদের দ্বারা শারীরিকভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে। তাদের চড়-চাপড় মারা হয়, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কিংবা লোহার রড় দিয়ে পেটানো হয়। শিশুরা মনে করে, তারা যেটুকু 'ভুল' করে তার চেয়ে অনেক বেশি তাদের মারা হয়। এ ব্যাপারে তারা তুলনা করে বাবা-মায়েরা তাদের নিজ সন্তানদের প্রতি কিরূপ আচরণ করে তার সঙ্গে। এবং এ ক্ষেত্রে তারা শ্রেণিগত একটি বৈষম্য দেখতে পায়। তারা মন্তব্য করেছে যে, তাদের ক্ষেত্রে যে শাস্তি দেয়া হয় তাতে কখনও স্নেহের কোনো পরশ থাকে না। বাবা-মা'র দিক থেকে তাদের নিজেদের সন্তানদের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যেটা দেখা যায়।

যৌন হয়রানির বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে ৭১টি বালিকার। এর মধ্যে আঠারোটির (২৫.৩৫ শতাংশ) মতে তারা যৌনপীড়নের শিকার হয়েছে। এই আঠারোটির মধ্যে সাতটি (৯.৮৫ শতাংশ) বালিকা স্বীকার করেছে যে, তারা তাদের মনিবের বাড়িতে পুরোপুরিভাবে ধর্ষিতা হয়েছে (এবং একাধিক পুরুষ কর্তৃক)। যেসব শিশুর সাক্ষাৎকার

নেয়া হয়েছে তাদের গড়পড়তা বয়স ১১ বছর, এ তথ্যটি বিবেচনায় নিলে এটি যে কত মারাত্মক সমস্যা তা বোঝা যাবে।

গৃহকর্তাদের বিশ্বাস, নাবালক মেয়েদের কাজে নিয়োগ করলে 'যৌন অপরাধে' তাদের জড়িত হওয়ার বিষয়টি এড়ানো যায়। নাবালক মেয়েদের যৌন হয়রানি ও ধর্ষণকেও যদি অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা হয় (আমরাও মনে করি, তা হওয়া উচিত), তাহলে গৃহকর্তাদের বিচারটি ভুল। আমাদের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে এমন বালিকাদের পড়পড়তা বয়স ১১.৩ বছর। এ ধরনের অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে পুরোমাত্রায় যৌনসঙ্গম করলেও সম্ভবত তাতে গর্ভধারণের সূত্রপাত হয় না। সুতরাং এর ফলে কেলেঙ্কারি এড়ানোর সমস্যাটির হয়তো সহজেই সমাধান করা যায়। অন্তত অভিভাবকদের দিক থেকে বিষয়টিকে এভাবেই ভাবা হয়। আমরা সর্বত্রই দেখেছি, সন্দেহ যাতে না ওঠে এবং কেলেঙ্কারি যাতে না ঘটে তা এড়ানোর জন্য পুরুষেরা যৌনসঙ্গী হিসেবে বয়স্ক মেয়েদের চেয়ে ছোট মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়। দশ বছর বয়সী এক পথবালিকা যাকে প্রায়ই যৌনকর্মের জন্য পুরুষদের আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সে ভালোভাবে ব্যক্ত করেছে এই অনুভূতির কথা, 'সম্মানজনক এলাকায় আমাকে বেশি পছন্দ করে। কারণ আমি এত ছোট যে, কেউ ভাববে না আমি এখনই 'নষ্ট' হয়ে গেছি।'

মধ্যবিত্তদের বিবেকবোধে ঘাটতি

গৃহভৃত্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে খুবই অস্বস্তি বোধ করে তার বহু প্রমাণ আছে। বেশ কিছু কারণে এই সম্পর্ককে ঝামেলার বিষয় হিসেবে দেখা হয় এবং বহু গৃহকর্তাই গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, বর্তমান পরিস্থিতির উদারীকরণ ও আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য অবশ্যই কিছু একটা করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিককালে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, রোমেনা নামের ত্রিশোর্ধ্ব এক গৃহপরিচারিকা তার কলেজশিক্ষিকা গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্ত্রীর ২০ বছর বয়সী মেডিকেল ছাত্রী মেয়েকে খুন করেছে। এই ঘটনায় মধ্যবিত্ত সমাজে সাংঘাতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মাসাধিককাল জুড়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পত্রিকায় অসংখ্য প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও মতামত জরিপ প্রকাশিত হয়। মজার ব্যাপার হল, আইনজীবীদের একটি গ্রুপ উপলব্ধি করে যে, গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্ত্রীর কন্যাকে খুন করার ব্যাপারে গৃহপরিচারিকার দিক থেকে নিশ্চয়ই যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। এ কারণে তারা বিনা পয়সার আসামির পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনার কথা ঘোষণা করে। এই ঘটনাসূত্রে দৈনিক পত্রিকা 'ভোরের কাগজ'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে গৃহভৃত্যদের প্রতি দাসদের চেয়ে ভালো ব্যবহার না করার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিন্দা করা হয়। তবে ভয় ও বদ্ধমূল ভ্রান্তিরই ছিল আধিক্য। মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের গৃহভৃত্যদের কাছ থেকে নিরাপদ নয় এবং অনির্ভরযোগ্য গৃহভৃত্যদের কাছ থেকে নিরাপত্তার ব্যাপারটি গৃহকর্তাদের ভাবা উচিত এমন মতই সমাজে তীব্র

হয়ে ওঠে। পরামর্শ দেয়া হয় যে, গৃহভৃত্যরা কোনো অপরাধ করলে তাদের নামঠিকানা যেন থানায় রেজিস্ট্রি করা হয়।

এই আতঙ্কজনক প্রতিক্রিয়াটি বেশ মজার। এটা সহজেই দেখানো যায় যে, গৃহকর্তা কর্তৃক গৃহভৃত্যদের নির্মম নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার বিপরীত ঘটনা ঘটার চেয়ে, অনেক বেশি। এ ধরনের কাহিনী দিয়ে ভরা থাকে পত্র-পত্রিকা। গৃহভৃত্যকে হত্যার ঘটনাটি খুব একটা স্পর্শকাতর নয়। এটি খুবই সাধারণ ঘটনা। পত্রিকায় সাধারণত কয়েকটি বাক্যে এ ধরনের ঘটনার খবর ছাপা হয়, কোনো মন্তব্য থাকে না, থাকে না কোনো ফলো-আপ খবর।

অবিশ্বস্ত ও চালাক-চতুর গৃহভৃত্যদের কাছে মধ্যবিত্ত গৃহকর্তাদের পরাস্ত হওয়ার ভয়ের ফলে বয়স্কদের বাদ দিয়ে অল্পবয়সী নিরীহ শিশুদের নিয়োগ করার দিকে আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। রোমেনার ঘটনার পরে গৃহকর্তারা ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের প্রতি তাদের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করে।

গৃহকর্তারা এমন গৃহভৃত্য চায় যারা শিশু কিংবা বয়স্ক হলেও যাদের ব্যবহার শিশুর মতো (বাচ্চুর মায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়, আগেই যার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে) অর্থাৎ অনুগত, 'সহজ-সরল', নিরীহ, সাদাসিধা এবং যাদের নিজস্ব প্রয়োজন নেই। কোনো গৃহভৃত্য যখন সিদ্ধান্তগ্রহণে সামর্থ্য ও জীবন-সচেতনতার কথা (sense of agency) প্রকাশ করে তখন বহু গৃহকর্তাই মনে করে যে, সে শয়তান হয়ে গেছে।

পতিতালয়ের অল্পবয়সী বারবনিতার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। দেখা যায় এক/দুই প্রজন্মের আগের চেয়ে এখন কড়াকড়ি অবস্থার বিরুদ্ধে অল্পবয়সী পতিতারা বিদ্রোহ করে। এর প্রতিক্রিয়ার তাদের মালিকেরা (সর্দারনীরা) এখন আগের চেয়ে, এমনকি আরও কম বয়সের মেয়েদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করে। এমন একটি বয়সকে বেছে নেয়া হয় যখন একটি শিশুর 'চোখে ফোটেনি' তখনও, তবে এই অবস্থার অবসান ঘটে দ্রুতই। আজও এটা ঘটার আগেই শিশুদের পাকড়াও করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

শিশু গৃহভৃত্যদের প্রতি মধ্যবিত্ত নিয়োগকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা সহজ নয়। প্রভু/ভৃত্য সম্পর্কটি পুরুষানুক্রমিক রীতিনীতির অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত এবং এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনন্য নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই তা বর্তমান। কারো গৃহে ভৃত্যদের অবস্থান পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ নেয়া হলে সম্ভবত তা আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা নিন্দার বিষয় হবে।

কিছুটা ভিন্নভাবে গৃহভৃত্যদের সঙ্গে আচরণ করা এবং তাদের বেশি বেশি অধিকার দেয়া হলে তা পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটির সূচনা ঘটাবে এবং বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আত্মীয়-স্বজন ও অন্য যারা বাড়িতে আসে তারা সকলেই গৃহভৃত্যদের আদেশ দিতেই অভ্যস্ত। গৃহভৃত্যদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে সেটা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনধারা ও পরিচিতিরই অংশ। এমনকি একে 'বাঙালি' জীবনধারা হিসেবেও তুলে ধরা হয়। 'ভৃত্যদের নষ্ট করার' জন্য বিদেশাগতদের সাধারণত দায়ী করা হয়। ধনাঢ্য এবং ততটা ধনাঢ্য নয় এমন বাংলাদেশী যারা বিদেশি বসবাস করে তারা ভৃত্য ছাড়া বসবাসের সমস্যার কথা বলে থাকে এবং অনেকেই শুধু এ কারণে দেশে ফিরে আসতে চায়। গৃহভৃত্যদের তাদের 'যথার্থ' অবস্থানে রাখার মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই শ্রেণিস্বার্থ রয়েছে। এই একই আচরণের দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি উচ্চতর পদমর্যাদাও দাবি করে।

শিশু গৃহভৃত্যদের একটি শ্রেণি হিসেবে ভৃত্য থেকে আলাদাভাবে দেখা হয় না। একইভাবে নিয়োগকর্তারা শিশুদের বিশেষভাবে পছন্দ করে এ কারণে যে, তাতে নিয়োগের উন্নত শর্ত অনুযায়ী ভৃত্যদের অধিকারের স্বীকৃতির বিষয়টিকে বিলম্বিত করা সম্ভব। মনে হয়, শিশুশ্রম ও অধিকারের অনুপস্থিতির মধ্যে একটি শক্তিশালী ও নিয়মিত (অনিবার্য বলব না) সম্পর্ক আছে। এই প্রবন্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা গুরুতর। 'যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের চোখ না ফোটে' ততক্ষণ শিশুদের কে রক্ষা করবে? এই প্রশ্নের মীমাংসার সঙ্গে একটি সমাজের দায়িত্ব জড়িত হয়ে পড়ে।

[অনুবাদক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

শিশু-ভাবনা, শিশুতোষ নয়

জে ব উ ন নে ছা

ফুলের মতো নিষ্পাপ হয়ে বেড়ে উঠুক

রাজধানী ঢাকার মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মূল বালক শাখার এক পাশে একচালা একটি খাবার হোটেলে বসে আছি। কারণ আমার সন্তানটি স্কুলের অভ্যন্তরে জ্ঞান অন্বেষণে রয়েছে। তাকে নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর দায়িত্ব আমার তাই এ অপেক্ষা। তবে কি দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, দেশের শীর্ষস্থানীয় স্কুল হওয়া সত্ত্বেও স্কুলটিতে অভিভাবকদের বসার কোনো স্থান নেই। তাই হোটেলে বসে আছি। যাই হোক প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হোটেলটির এক পাশ থেকে টিউবওয়েলে চাপার শব্দ পাচ্ছি। প্রায় বিশ মিনিট শব্দ পাবার পর শুনতে পাচ্ছি কেউ একজন বলছে এতক্ষণ ধরে চাপছি তবু শূন্য টিউবওয়েলে পানি নেই। বালতিটি এখনও পূর্ণ হয়নি। বুঝতে দেরি হল না একটানা গ্রীষ্মের দাবদাহে টিউবওয়েলটিও হয়ে উঠেছে পানিশূন্য। ব্যাগের ভিতর ভাঁজ করে রাখা পত্রিকাটি উল্টোতেই দেখতে পেলাম উত্তরাঞ্চলে গ্রীষ্মের দাবদাহে পুড়ছে জনপদ। তীব্র লোডশেডিং, টিউবওয়েলে পানি নেই।

পত্রিকার অপর পাশে দেখতে পেলাম শতকরা ৪০ ভাগ ফলমূলে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক। খবরটি পড়া শেষ হতে না হতেই চোখে পড়ল দিনেদুপুরে নারায়ণগঞ্জ থেকে সাতজনকে অপহরণ। অপরদিকে, ১০৬ কেজি স্বর্ণের চোরাচালানের খবর। এরকম আরো কত সংবাদ চোখে পড়ল। মনে মনে ভাবলাম ফলমূলে শতকরা ৪০ ভাগ রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকজন তরমুজ খেয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে। কী হচ্ছে ? কী খেয়ে বেঁচে থাকবে মানুষ? শুধু কি ফল? মাছে ফরমালিন, পানীয়তে সিএমসির দ্রবণ, সরবিটল, ম্যানিটল, কৃত্রিম মিষ্টিকারক, প্রিজারভেটিভ বা কমলার কৃত্রিম সুগন্ধ, মাছ-মুরগির খাবারে ক্রোমিয়াম, শাকসবজিতে পচনরোধক ওষুধ, চকোলেটে বিভিন্ন কৃত্রিম রং, জিলাপি মচমচে করতে, মুড়ি বেশি ফোলাতে এবং রং ভালো করতে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থ, ডিডিটি ও টেক্সটাইল রং ব্যবহৃত হচ্ছে। শুটকি মাছ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, মশলা ও আইসক্রিমে মাছ-মুরগির খাবারে একশ্রেণির কারখানার

ট্যানারিতে ব্যবহৃত চামড়ার অব্যবহৃত ঝুট চামড়া কুড়িয়ে এনে গুঁড়া করে মাছ-মুরগির খাবারে মেশানো হচ্ছে। তাছাড়া ফুটপাতে তৈরি করা বিভিন্ন পানীয়তে রং করার জন্য টক্সিক ব্যবহার, ওষুধে বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার, স্যালাইনে ক্ষতিকর পাউডার মেশানো হচ্ছে। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। একতরফাভাবে ব্যবসায়ীরা প্রতারণার জাল বিছিয়ে ফাঁদে ফেলছে সাধারণ ক্রেতাদের। শুধু কি খাদ্যে প্রতারণা? প্রতারণা এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের মতো মিশে গেছে।

কয়েকদিন পূর্বে ভারতে উচ্চশিক্ষার্থে যাবার উদ্দেশ্যে ভিসার জন্য বাসায় বসে অনলাইনে আবেদন করছিলাম। আবেদনের শেষ পর্যায়ে যখন কাগজপত্র জমা দেবার তারিখ খুঁজছিলাম। তখন বারে বারে একটি বার্তা আসছে 'নো এপয়েনটমেন্ট ডেট আর এভেইলেবল'। মুহূর্তেই হতাশ হয়ে পড়লাম। বাসা থেকে বের হয়ে স্থানীয় দু'একটি সাইবার ক্যাফেতে বিষয়টি জানতে চাইলে তারা বলল, যদি আমাদেরকে ১,৫০০ টাকা দেন তাহলে তারিখটা নিয়ে দিতে পারি। বিষয়টি তখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। পরিচিত একজন রাজধানীর গুলশানের ট্রাভেল এজেন্সির মালিককে ফোন করলাম সে বলল, তারিখ পেতে হলে তাকে ২,০০০ টাকা দিতে হবে। বুঝতে দেরি হল না, সিন্ডিকেট হয়ে গেছে ভিসা পাবার তারিখ। নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ১,৫০০ টাকা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ভিসার তারিখ পেলাম।

নিজেদের ছোট একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আছে যেটি আমার স্বামী পরিচালনা করে থাকে। বাগানবাড়ি বিক্রয়ের জন্য পত্রিকায় মুঠোফোনের নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিলে অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন করে একজন জানাল তার মালিক বাগানবাড়িটি কিনবে। সে তার মালিকের অফিস সহকারী। যেহেতু ফোনের ওপাশ থেকে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না, সেহেতু তার মুখের কথা বিশ্বাস করতে হল আমাদের। লোকটি দু'একদিন পর ফোন করে জানাল তার বাড়ির কাজের ছেলে বাড়ির পাশ থেকে কিছু স্বর্ণ পেয়েছে। এখন আমাদের তার বাড়িতে গিয়ে কাজের ছেলেকে বোঝাতে হবে স্বর্ণগুলোর মূল্য তেমন বেশি না। এরপরে তার কাছ থেকে নগদমূল্যে কিছু স্বর্ণ কিনে নিয়ে আসতে হবে। বুঝতে দেরি হল না, প্রতারকের পাল্লায় পড়ে গেছি। বিষয়টি অনুধাবন করে গোয়েন্দা বিভাগকে অবহিত করলাম। জানা যায়, গোয়েন্দা বিভাগ বিষয়টিকে অনুসন্ধানে রেখেছে।

তাছাড়া, সাইবার ক্রাইম নকল স্বর্ণ, জাল টাকা, জাল ডলারের ব্যবসা তো একেবারে রমরমা। ওদিকে ইয়াবা ব্যবসায়ীরা বহাল তবিয়তে নিজেদেরকে গডফাদার করে ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছে। ঢাকার যে স্থানে আমি বাস করি সেখানে প্রায়ই মাইকের মাধ্যমে শুনতে পাই ১০-১২ বছর বয়সী শিশু হারিয়ে গেছে। ওদিকে পত্রিকার পাতা ওল্টোলেই দেখতে পাওয়া যায় বয়স্করাও হারিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, একদল জ্ঞানপাপী সৎ, যোগ্য মেধাবীদের বাদ দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের পছন্দসই নিয়োগ প্রদান করছে। অপরদিকে, আর একদল নিয়োগের নামে ভালো রকমের বাণিজ্য

করে যাচ্ছে। তাছাড়া রাজধানী ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের দেয়ালে জরুরি নিয়োগের লিফলেটে চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। শুধু কি তাই! চাকরি দেবার নয়া কৌশল হিসেবে প্রতারণার সারিতে যোগ হয়েছে আর এক রকমের ডিজিটাল প্রতারণা। ই-মেইলে বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ভুয়া চাকরির প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে এভাবে, 'আপনাকে কানাডার নাগরিক করে দেয়া হবে। আপনার কোনো খরচ লাগবে না। শুধুমাত্র আপনি অমুক (তাদের পছন্দমতো) ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন।' অর্থাৎ সে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। অপরদিকে, কো-অপারেটিভ সোসাইটিরা গ্রামের সাধারণ মানুষকে বেশি মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে আত্মসাৎ করছে লক্ষ লক্ষ টাকা। গ্রামের জোতদাররা গরিব মানুষকে ঋণ দিয়ে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে শোষণ করে চলেছে।

অপরদিকে, ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে শত শত চালক গাড়ি চালাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে, সড়ক দুর্ঘটনার হার বেড়েই চলেছে। ভূয়া চিকিৎসকরা চিকিৎসা করছে এবং রোগীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ভূয়া সার্টিফিকেট, ভূয়া জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবসা তো চলছেই। এদিকে, অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে অবৈধ জিনিসের আদানপ্রদান চলছে। দিনেদুপুরে বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালংকার লুট হচ্ছে প্রায়শই। নাবালিকা ও কিশোরী ধর্ষণ তো নিত্যদিনের খবর।

ওদিকে নগরবাসী ভয়াবহ যানজটের সাথে কবলে পড়ছে ছিনতাইকারীদের। ব্যক্তিগতভাবে আমি চার বার ছিনতাইয়ের কবলে পড়ি এবং আমার স্বামীর দুইলক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে। উদ্ধারে ব্যর্থ হই আমরা।

এছাড়া রাজধানী ঢাকার মিরপুরের বেড়িবাঁধে গাড়ি ছিনতাই একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমার ব্যক্তিগত গাড়িটিও সেস্থানে দুবার ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে। এদিকে যাত্রাবাড়ীর ফ্লাইওভারের নিচ থেকে নয়া কৌশল অবলম্বন করে গাড়ি এবং সাধারণ মানুষের অর্থ ছিনতাইয়ের ঘটনা তো খুব পরিচিত। এর সাথে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অজ্ঞান পার্টিদের ছোবল তো আছেই।

এত এত প্রতারণার কথা ভাবতে ভাবতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি স্কুল ছুটির সময় হয়ে গিয়েছে। হোটেল থেকে যখন ফিরছিলাম তখনও টিউবওয়েল চাপার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। অবিরাম শীতল জলের প্রত্যাশায় জল আহরণকারী চেপেই যাচ্ছে। কিন্তু জলে ভরছে না তার বালতি।

স্কুলগেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রতীক্ষিত সকল অভিভাবকদের সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। ছুটির ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে নিষ্পাপ শিশুরা বাড়ি ফেরার জন্য শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হচ্ছে। শিশুদের দেখে মনে হচ্ছিল কতটুকু বাসযোগ্য করতে পেরেছি এই শিশুদের জন্য আমার এই দেশকে? কতটাই ব্যর্থ এই আমি এবং আমরা! ভেজাল আর নির্ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করে জীবনের অর্ধেক সময় তো পেরিয়ে গেল ভালোভাবেই। কিন্তু যারা অনাগত প্রজন্ম যাদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এই দেশ– তারা অবিরাম ভেজাল খাবার খেয়ে খেয়ে অকালেই

ঝরে পড়বে না তো? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। মনে মনে প্রার্থনা করলাম এই দেশের শিশুদের জন্য এভাবে, 'হে প্রভু! এই নিষ্পাপ শিশুগুলোকে তুমি প্রতারক, জ্ঞানপাপী, অসাধু ব্যবসায়ী, ঘুষখোর ইঞ্জিনিয়ার, অসৎ বিচারক, ভণ্ড রাজনীতিবিদ, স্বার্থপর, দুর্নীতিবাজ শাসক, নীতি নৈতিকতাহীন পুলিশ কর্মকর্তা এবং অসৎ সরকারি অফিসার হিসেবে তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর না। তাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত কর তারা যেন দেশকে বিশ্বের দরবারে সুখী সমৃদ্ধশালী দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এ দেশের প্রত্যেকটি মাটির কণাকে তারা যেন পবিত্র ভেবে সে মাটিকে রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।'

ভাবতে ভাবতে বাড়ির গেটে এসে পৌঁছলাম। পথিমধ্যে ব্যক্তিগত গাড়িচালকের কাছে জানতে চাইলাম সে কোনোদিন প্রতারণার ফাঁদে পড়েছে কিনা। প্রশ্ন করতেই সে জানতে চাইল কেন? আমি বললাম এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য তথ্যের প্রয়োজন। তোমার কাছে এমন কোনো তথ্য থাকলে দাও। সে বলল, 'ম্যাডাম, পত্রিকায় লিখলেই কি দেশের সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি ঠেকানো যাবে?' মুহূর্তেই আমি অবাক হলাম তার উত্তর শুনে। সে বলল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপেই এসকল প্রতারণার অবসান ঘটতে পারে। মনে মনে ভাবলাম সাধারণ একজন গাড়িচালক যে পঞ্চম শেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেনি সে অনুধাবন করছে কিভাবে এসকল প্রতারণার শিকড় মূলোৎপাটন করা যায় আর আমরা সচেতন শিক্ষিত যারা সেমিনার, সমাবেশে গলাবজি করে দেশকে উদ্ধারের কথা বলছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা কতটুকু কী করছি। একতরফা প্রতারণা, ভেজাল খাবার, ভেজাল বাতাসের সাথে বসবাস দেশের ফুটফুটে শিশুগুলোর। তাদের মুখের পানে তাকিয়ে দেশকে ভালোবেসে অনাগত প্রজন্মের জন্য দেশকে একটি পবিত্র ভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এখনই। সমাজের সকল সচেতন মানুষ, সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে অবসান ঘটতে পারে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির।

শখের বশে দু'এক লাইন কবিতা লেখার ব্যর্থ চেষ্টা করি। সেই ব্যর্থ চেষ্টার ফসল আমার 'আহা যদি কবুতর হতাম...!' কবিতাটি। এই কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে শেষ করব আজকের এই লেখা—

'কবুতরকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়
যদি তাদের মতো হতাম
তাহলে হাজার হাজার মাইল
উড়ে এক দেশ থেকে আর এক
দেশে উড়ে মানুষের বুকে
শান্তির আলো ছড়াতাম
শোষকের বুক চিরে ফেলতাম
গলা টিপে ধরতাম

নিঃশেষ করে দিতাম
সেই সব নিমকহারামদের
যারা দেশের আলো বাতাসে বড় হয়ে
দেশকে ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে
আহা যদি কবুতর হতাম.....!'

' ... ও আমার সন্তান নয়'

ছোটবেলায় আম্মুর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, আম্মুর প্রিয় কবিতা কী? আম্মু বলেছিলেন, 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে" । এত বছর পর আমার সন্তান আমায় জিজ্ঞেস করে আমার প্রিয় কবিতা কোনটি? আমি বলি, "পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা দেখো শতবার" । আমার সনান কবিতাখানা শুনেই বলে, আম্মু পুরো কবিতাটি আমাকে দেবে? আমি শিখব । মনে মনে ভাবি জীবনে যা শিখেছি, তা তো ওই প্রাথমিক, মাধ্যমিকের পাঠ থেকেই শিক্ষা নিয়ে । আজকাল তো পাঠ্যবইয়ের পাতা ওল্টালে দেখতে পাই না এমন শিক্ষণীয় কবিতা, "কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পা'য়, তাই বলে কি কুকুরের সাথে কামড়ানো শোভা পায়?" "যে জন দিবসে মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি, আশুগৃহে তার দেখিবে না আর নিশীথে প্রদীপ বাতি" । ভাবতেই ভালো লাগে আমরা কত ভাগ্যবান- পড়তে পড়তে শিখে গেছি জীবন গড়ার মন্ত্র । কবিতার মাঝে ভালোবেসেছি প্রিয় দেশটিকে । যেমন– "আবার আসিব ফিরে, ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়" । 'অনেক কথার গুঞ্জন শুনি, অনেক গানের সুর, সবচেয়ে ভালো লাগে যে আমার মাগো ডাক সুমধুর' । 'সার্থক জনম মোর, জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে' । 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' । 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' । কবিতার মাঝে শিখেছি মানবতা যেমন, "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি ।" "কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেরই সুরাসুর" । "আসমানীদের দেখতে যদি তোমরা সবে চাও, রহিমুদ্দির ছোট বাড়ী রসুলপুরে যাও" । "প্রভু তুমি ভুল ভেঙে দাও, হীরা ফেলে কাচ তুলে ভিখারী সেজেছি আমি, আমার সে ভুল প্রভু তুমি ভেঙে দাও" ।

খুব বেশি আগের কথা নয়, এই তো সেদিন, হাতে গোণা কয়েক দশক আগে কবিতাগুলো পড়েছি । এর মাঝখানে পরিবর্তন এসেছে বিস্তর । শিশু শিখবে খেলতে, খেলতে । যেভাবে আমরা শিখেছি । আমরা তো আমাদের বয়সে সৃজনশীল পরীক্ষা দেইনি, সৃজনশীলতার আড়ালে জিপিএ-৫ -এর আশায় মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী করে আমাদের প্রতিভাকে ধংস করে দেয়া হয়নি? আমাদের স্কুলব্যাগটিও এত ভারি ছিল না । আমাদের সময়ে বোর্ডভিত্তিক সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হত । যারা ভালো ফলাফল করত তারা তো উদ্দাম নৃত্য প্রদর্শন করেনি । আজকাল তো

পাঠ্যবইয়ের প্রবন্ধে দেখতে পাই না 'সুখী মানুষ' নামক গল্প। 'শিক্ষার লক্ষ্য' নামক প্রবন্ধের মতো, সেই পঙক্তি 'মানুষ স্বভাবতই দ্বিজ। এক– মানুষ, পশুপাখি মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে। দুই– মানুষ শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে পুনরায় জন্মলাভ করে'। একজন শিক্ষার্থী যখন এ কথাটি শিখবে, সে কখনোই মানুষরূপী পশু হতে পারে না। অপরদিকে, 'বই কেনা' প্রবন্ধের সেই উক্তি 'বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না। 'উপকূলে' গল্পের সেই সংলাপ, "তুমি অধম বলে, তাই বলে আমি উত্তম হইব না কেন?"। পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না, 'লালসালু' অথবা 'সিরাজউদ্দৌলা'। তাহলে কিভাবে শিখবে আমাদের সন্তান ভালো– মন্দের পার্থক্য ?

আধুনিকতার চর্চা করছি, সেটার প্রকাশ করছি দামি মুঠোফোন, দামি পোশাক, দামি রেস্তোরাঁয় খেয়ে। কিন্তু চিন্তাচেতনায় আধুনিক হতে পেরেছি কতটুকু? ঠিক শেখ সাদীর সেই গল্পটির মতো—ছেঁড়া পোশাকে শেখ সাদীকে কেউ চেনেনি, চিনেছে দামি পোশাকে। যুগের স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছি আমাদের সন্তানদের। না শেখাচ্ছি মানবতা, না শেখাচ্ছি একতা। না বোঝানোর চেষ্টা করছি, 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ' । 'ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি করতে হয় না' । "যে একজনকে হত্যা করল, সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল" অথবা আমাদের এই গৌরবোজ্জ্বল দেশটির ইতিহাস আর ঐতিহ্য? আমাদের সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু একবারও কি ভেবেছি বিদেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার বাংলাদেশের ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে শিক্ষাদান করে কিনা? আঠার বছর পর্যন্ত একজন মানুষ তো শিশুই থাকে। আর শিশু তো কাদামাটির মতো। তাকে যেভাবে গড়ে তোলা হবে সে সেভাবেই গড়ে উঠবে। সন্তান একদিনে বা হঠাৎ করে বখে যায় না। তার মধ্যে যে বীজ রোপিত হয় তা ধীরে ধীরে ডালপালা গজাতে থাকে। এরপর সেই গাছে যখন বিষের ফল জন্ম নেয় তখন দোষ হয় সন্তানের। আমাদের সময়ে এমন তো শুনিনি কেউ পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছে, তা-ও বিনা অপরাধে। কারণ, আমরা শিখেছিলাম, "খোদা, হাত দিয়েছেন বেহেশতি চিজ গড়ে তুলবার জন্য"।

আধুনিকতার লেবাস পড়তে গিয়ে অন্তরের শুদ্ধচর্চার কথা যেন ভুলতে বসেছি। সন্তানদের কাবাডি, হাডুডু, কানামাছি খেলায় উৎসাহিত না করে তাদের হাতে দিয়েছি দামি মুঠোফোন। যেখানে রয়েছে হাজারটা গেমসের রাজত্ব। সীমাহীন ইন্টারনেটের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছি । এরপর কোনো তত্ত্বাবধান করছি না, সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা। সন্তানকে বলছি না ঐতিহ্যবাহী গান জারি, সারি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, লালন আর মারফতির কথা। লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চাই পারে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে। আসুন, শিশুদের হাতে তুলে দেই শিক্ষামূলক গল্প এবং '৫২, '৬৯ ও গৌরবোজ্জ্বল ১৯৭১-এর ইতিহাস। তারা ইতিহাস পড়ে জেনে নিক কতটা কষ্টে অর্জিত আমাদের এই সোনার বাংলা। ফিরিয়ে দিই সবুজ খেলার মাঠ। সবার সামগ্রিক প্রচেষ্টায় সম্ভাবনার এই প্রিয় দেশটিকে এগিয়ে নেবার জন্য আমাদের

হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করি । তখন দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আপনাকে বলতে হবে না, '... ও আমার সন্তান নয়' ।

অনন্ত খেলার সুযোগ চায়

ছেলেটার অদম্য আগ্রহ ক্রিকেট খেলার প্রতি । স্কুলে সুযোগ পেলেই বন্ধুদের সাথে খেলতে নেমে যায় । কিন্ত সময় পায় কতটুকু? কয়েকদিন আগে জানতে চাইলাম তোমাকে ক্রিকেট প্রশিক্ষণে ভর্তি করতে চাই । তুমি কী বল? সে উত্তরে বলে, "আমার সময় কোথায়? সকাল ৬.০০ টায় ঘুম থেকে ওঠাও, এরপর স্কুলে পাঠাও । স্কুল থেকে ফেরার পর কোচিং-এ ৬.০০ টা পর্যন্ত দিয়ে রাখ । এরপর ৭.০০ টায় আবার শিক্ষক আসে । এবার বল সময়টা কোথায়?" ওর উত্তরটা শুনে নিজের মধ্যে অপরাধবোধ জাগ্রত হল । মনে পড়ল আমার শৈশবের কথা । পাখির মতো উড়ন্ত ছিল সেই জীবন । স্কুল থেকে ফিরে বিকেলে খেলাধুলা করে সন্ধ্যায় পড়তে বসতাম । অথচ এই আমি কতটা স্বার্থপর । নিজে শৈশবের নির্যাস নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু ছেলেটার শৈশব তছনছ করে দিচ্ছি । না, আমি শুধু এই কাজ করছি না । প্রতিযোগিতার এই যুগে কম-বেশি সবাই এভাবেই সন্তান লালন করছেন ।

ছেলেটা আমার পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে । তাই জিপিএ-৫ এর জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে । কিন্তু আমি তো জিপিএ- ৫ পাবার তত্ত্বে বিশ্বাসী নই । আমি মনে করি, প্রতিভা বিধাতাপ্রদত্ত । ঠেলেঠুলে, ধাক্কা মেরে জিপিএ-৫ পাওয়া যায় । কিন্তু সত্যিকারের প্রতিভাবান হওয়া যায় কি? যুগে যুগে যারা প্রতিভাবান ছিলেন, তাঁরা কি জিপিএ-৫ পাবার মতো এই প্রতিযোগিতা করেছেন? ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনোই আমার ছেলেকে বলিনি তোমাকে প্রথম হতেই হবে । কারণ, আমি মনে করি, যে ভালো ফলাফল করবে, সে যে একজন ভালো মানুষ হবে তা নয় । মনীষী বলেন,

'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত নয়" । ব্যক্তিজীবনে এই বাণীটার সাযুজ্য পেয়েছি বেশ । এক সময় যাদেরকে দূর থেকে ভাবতাম পূজনীয়, তাদের সাথে যখন পথ চলতে শুরু করলাম তখন দেখলাম, তারা নিজের উন্নতির জন্য লেখাপড়া করেছেন ঠিকই কিন্তু মানসিকতার পরির্বতন তাদের হয়নি । অন্যের ক্ষতিতে যেন তাদের আনন্দ । এদেরকে আমি এককথায় জ্ঞানপাপী হিসেবেই ভাবি । আমি চাই না আমার সন্তান এমন হউক । অপরদিকে, জীবনপরিক্রমায় এমন কিছু মানুষের দেখা মিলেছে, যাঁদেরকে শুধু শ্রদ্ধাই করতে ইচ্ছে করে ।

তবে কি স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের সন্তানকেই শেখাই না । নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ঝোলা কাঁধে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি শেখাই যে, "জ্ঞানী হও, কিন্তু জ্ঞানপাপী হইও না । শুধুমাত্র ভালো ফলাফল করলেই হবে না । তোমাকে ভালো মানুষ হতে হবে । তোমার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিনয়- নম্রতা এমন হবে যে, তোমাকে সবাই অনুসরণ করবে । তোমাকে পোশাকে আধুনিক হতে হবে তা নয় । মানসিকভাবে হতে হবে আধুনিক ।

তোমার মনের পোশাক হতে হবে পরিচ্ছন্ন। যুগের সাথে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলা যাবে না। মেকি বেশভূষায় নিজেকে আধুনিক করবে। অথচ গোপনে এমন কাজ করবে যে, যে কোনো পশুকে হার মেনে যায়। সেই আধুনিকতার মূল্য অন্তত আমার কাছে নেই।"

আসুন, আমরা আমাদের শৈশবের দিকে ফিরে তাকাই। সন্তানগুলোকে আমাদের সাধ্যমতো খেলার মাঠ দেই। ভেজালমুক্ত খাবার মুখে তুলে দেই। তাদের মধ্যে ছাড় দেয়ার মানসিকতা তৈরি করার সুযোগ করে দেই। কেননা, প্রতিযোগিতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে, করে তোলে স্বার্থপর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা জানি আপনি এ দেশটিকে আপনার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আপনি শিশুদের ভালোবাসেন। আপনার কছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আমাদের সন্তানগুলোকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করুন।

আমাদের দেশটিকে তো আজকের এই শিশুরাই গড়বে। আসুন সবাই মিলে ফুলের মতো এই কলিগুলোকে সুভাসিত ফুল হয়ে ফোটার সুযোগ করে দেই। প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সাহায্য করি।

এরপর ওদেরকে বলি—

'প্রিয় সন্তান
তোমার হাতে তুলে দিলাম মানচিত্র ও পতাকা।
এই দুটোকে তুমি যত্ন করে রেখো
যেন এর গায়ে ফুলের কাঁটার আঁচড়ও যেন না লাগে।
মনে রেখো, তোমাকে দেয়া মানচিত্রের প্রতিটি স্থানের
ধূলিকণার সাথে তোমার পূর্বপুরুষের নিশ্বাস, আশা-ভালোবাসা জড়িয়ে আছে।
আর পতাকায় মিশে আছে ত্রিশ লাখ শহিদের তাজা রক্ত।
যে রক্ত শুকিয়ে গেছে তবু তাদের প্রাণের স্পন্দন রয়েছে পতাকাতে।
প্রিয় সন্তান,
রক্তে ভেজা এই পতাকাকে তুমি অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা করো
দেখবে সে তোমায় সারাসময় শীতের চাদরের মতো জড়িয়ে রাখবে।
জড়িয়ে রাখবে মায়ের আঁচলের মতো।

খুব সযতনে সারাজীবন তোমার বুকের মাঝে মানচিত্র ও পতাকাকে লালন করে
তোমার উত্তরসূরিকে দিয়ে বলো,
সবুজে ঘেরা এই দেশের মানচিত্র ও পতাকা যেন অক্ষত থাকে
লক্ষ রাখবে যেন কোনো অপশক্তি এই মানচিত্রকে ছিনিয়ে নিতে না পারে।
ভালোবেসো, শুধু হৃদয় দিয়ে ভালোবেসো
আমার এই মানচিত্র ও পতাকাকে।'

[লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল: asiranjar@yahoo.com]

আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

ফে র দৌ সী সু ল তা না

বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে তাই বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু বলব, এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে গলদটি রয়েছে তা হল অধিকাংশ শিক্ষকদের মন ও মননে নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব অথবা সচেতনতার অভাব। শিক্ষকতা একটি মহতী পেশা। এখানে শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। হ্যাঁ একথা ঠিক, এই পেশায় যাঁরা আছেন তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ কম্। তাঁরা খুব কম সম্মানী পান এটা জেনেই তারা এ পেশায় আসেন। সুতরাং দায়িত্বটা তাঁদেরও। বেতন কম পাচ্ছি বলে আমি আমার দয়িত্বে অবহেলা করব, অথবা যেন- তেন ভাবে দায়িত্ব পালন করব এ মানসিকতা আমাদের বর্জন করতে হবে। নতুবা শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নেয়া যাবে না। কারণ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ার কারিগর। এই ভবিষ্যৎ নাগরিকেরাই যদি তাদের শিক্ষকদের প্রতি গোড়াতেই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে তাহলে সামগ্রিক চিত্রটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।
এ প্রসঙ্গে আমি আমার শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া দু'টো ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি:

আমার ছোট ছেলে তখন প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরে সে মনমরা হয়ে রইল। সারাদিন ঠিকমতো খেলো না, খেলা করল না, এমনকি কারো সাথে কথাও বলল না। সে শুধু ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকছে। আমি বিকেলে অফিস (দপ্তর) থেকে ফিরে এসে ছেলের এই অবস্থা দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম। কথা বলা তো দূরের কথা সে সাফ জানিয়ে দিল কাল থেকে আর বিদ্যালয়ে যাবে না। শুনে আমি ভড়কে গেলাম। ছেলেকে অনেক আদর করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তবে কথা আদায় করা গেল।

শ্রেণিশিক্ষক (নামটা ব্যবহার করলাম না কারণ আমরা এখনো শিক্ষকদের সম্মান করি, ছদ্মনাম ব্যবহার করছি) ফারজানা ম্যাডাম খেলার ঘণ্টায় সব বাচ্চাদের সাথে মজার মজার কথা বলে হাসাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমার ছেলেকে ডেকে নেন। তারপরে বলেন, এই ছেলেটা এত সুন্দর, একেবারে গোলাপি গায়ের রং. আর কেমন টুকটুকে ঠোঁট দেখেছ? একদম মেয়েদের মতো দেখতে। ওকে যদি একটি টিপ পরিয়ে দিই তাহলে পুরো মেয়ে লাগবে দেখতে, তাই না?

বলেই নিজের ব্যাগ খুলে একটি টিপ বের করে আমার ছেলের কপালে জোর করে পড়িয়ে দেন। ছেলেটা ওনার হাতের ভেতর ততক্ষণে ছটফট করছে, তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে আর শিক্ষক মহা আনন্দে অন্য বাচ্চাদের তা দেখাচ্ছেন—দেখেছ, একদম মেয়ে লাগছে তাই না? বলে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। কিছু বাচ্চা শিক্ষকের সাথে গলা মিলিয়ে হাসছে আর কয়েকজন ছেলেটির কান্না দেখে মুখ কালো করে ফেলেছে।

অবশেষে যখন ছেলে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠল তখন মাননীয় শিক্ষকের হয়তো হুঁশ ফিরল। তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে বাবা-সোনা বলে আদরও করলেন কিন্তু ছেলের কান্না থামাতে পারলেন না। তারপরে তিনি শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। অন্য বাচ্চারা এসে কপালের টিপ উঠিয়ে দিল, পুরো শ্রেণিকক্ষ তখন থমথমে।

ছেলের কাছে ঘটনার বর্ণনা শুনে আমি স্তম্ভিত। রাগে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। আমার ইচ্ছে করছিল এখুনি ওই শিক্ষককে... কিন্তু ছেলের কথায় আমি হতবাক হয়ে যাই। সে তার ছোট ছোট হাতে আমার হাতটি ধরে কাতর গলায় বলে, আম্মু তুমি ফারজানা ম্যাডামকে কিছু বল না, বললে আমাকে আরো শাস্তি দেবে। তার চাইতে আমি আর ওইখানে পড়তে যাব না, এটাই ভালো হবে।

আমি বাকরুদ্ধ। এই যদি হয় আমার ছেলের মানসিকতা, শিক্ষকভীতি, তাহলে তো ওর শিক্ষাজীবন শেষ। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। পরদিন প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে সব বলা, অন্য বাচ্চাদের সাক্ষ্য নেয়া, ওই শিক্ষককে ওই ক্লাস থেকে সরিয়ে দেয়ার পর্বটির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় নাই-বা গেলাম। কিন্তু ওই যে ছেলের মনে শিক্ষক সম্পর্কে একটা ভীতিকর কদর্য ধারণা তৈরি হয়ে গেল তা দূর করতে আমাকে কতখানি শ্রম-মেধা ব্যয় করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ছোট বাচ্চাদের কিভাবে পড়াতে হবে, তাদের সাথে কিভাবে মিশতে হবে এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ ওই শিক্ষকের ছিল না।

এবার লেখাপড়ার বিষয়টি তুলে ধরা যাক। আমার বড় ছেলে তখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে (স্ট্যান্ডারড ২)। ষান্মাসিক পরীক্ষার পরে বিজ্ঞান বিষয়ের খাতা শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের দেখতে দেয়া হল। নিয়ম হল ছাত্ররা শ্রেণিকক্ষেই খাতা দেখে আবার শিক্ষককে ফিরিয়ে দেবে, বাড়িতে নেবার কোনো নিয়ম নেই। আমার ছেলে দেখল খাতার ওপরে তার মোট নম্বর দেয়া আছে ৯৫-১০ = ৮৫। সে সাথে সাথেই প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে যে নম্বর দেয়া অছে তা যোগ করে দেখে মোট নম্বর ৯৫-ই আছে। কিন্তু এখানে লেখা ৯৫-১০ = ৮৫।

সে সাহস করে শিক্ষককে বলে, ম্যাম আমার নম্বর তো ৯৫, আমি গুণে দেখেছি, কিন্তু এখানে দেখছি আপনি দিয়েছেন ৮৫, এটা কেন?

শিক্ষক তার হাত থেকে খাতাটি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলে, তোমার দেখা শেষ হয়েছে তো? যাও সিটে বস, নম্বর ঠিকই আছে।

রাতে ওর কাছে সব শোনার পর আমি আর আনিস ঠিক করি স্কুলে গিয়ে দেখতে হবে ঘটনাটা কী? ছেলেকে আমরা কিছুই বলি না, শুধু জেনে নিই বিজ্ঞান ক্লাস কোন পিরিয়ডে হয়। যথারীতি আমরা বিদ্যালয়ে হাজির হই। প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে তাকে ঘটনা খুলে বলি।

তিনি আমাদের বিজ্ঞান ক্লাসের টিচারের সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়ে বলেন, আপনারা খাতা চেক করেন, আমিও আসছি।

আমরা ক্লাসে উপস্থিত হয়ে খাতা দেখতে চাইলে টিচার তা দেখাতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা প্রিন্সিপালের অনুমতি নিয়ে এসেছি শুনে তিনি খাতা আনতে টিচার্স রুমে যান। প্রায় পনেরো মিনিট পরে তিনি খাতা নিয়ে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে প্রিন্সিপাল ম্যাডামও চলে এসেছেন। টিচারের হাত থেকে খাতাটি নিয়ে নিজেই উল্টে পাল্টে দেখেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরপত্রে প্রদেয় নম্বরে কাটাকুটি করে নম্বর কমিয়ে দেয়া আছে।

প্রিন্সিপাল বলেন, প্রত্যেক নম্বরে এরকম কাটাকুটি কেন? টিচার নিরুত্তর। প্রিন্সিপাল আবার জিগ্যেস করেন, কাল স্টুডেন্ট যখন আপনাকে কমপ্লেন করল ভেতরে নম্বর ৯৫ আছে আর বাইরে ৯৫-১০ = ৮৫ আছে কেন, এর উত্তর না দিয়ে আপনি ওর কাছ থেকে খাতা কেড়ে নিয়েছেন, এর জবাবে আপনি কী বলবেন? টিচার নিরুত্তর। প্রিন্সিপাল আবার বলেন, আপনি এখন খাতার ভেতরের নম্বর কাটাকুটি করে মিলিয়ে নিয়ে এসেছেন, তাই না?

টিচার বলেন, না ম্যাডাম, নম্বর এরকমই ছিল।

প্রিন্সিপাল রাগত স্বরে বলেন, তাহলে খাতার ওপরে ৯৫-১০ = ৮৫ এর ব্যাখ্যা কী? মোট ৮৫-ই তো থাকার কথা তাই না? আপনি ভেবেছেন কী? ছোট বাচ্চাদের বুদ্ধি কম? তারা বোঝে না কিছু?

এরপরে ওই স্কুলে ওই শিক্ষকের কর্মজীবন শেষ।

ওই ঘটনা নিয়ে আমার ছেলের মন্তব্য, জাহানারা (ছদ্মনাম) ম্যাডামের স্টুডেন্ট হাসিবের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পেয়েছি তো তাই ম্যাডাম আমার নম্বর কেটে দিয়েছেন। কী রকম ডিসওনেস্ট উনি দেখেছ আম্মু!

ওই বয়সের বাচ্চা যদি টিচারকে ডিসওনেস্ট ভাবে, অবিশ্বাস তৈরি হয় শিক্ষকের প্রতি, তাহলে সে কিভাবে ওই সব শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে? শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবর্তে শিক্ষকরা যদি প্রাইভেট কোচিং-এর চিন্তা করেন আর যাকে পড়াচ্ছেন তাকে বেশি নম্বর পাইয়ে দেবার জন্য অন্যের নম্বর কমিয়ে দিয়ে অবিচার করেন, তাহলে পরিস্থিতি কতখানি ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।

আমি শুধু দু'টো ঘটনার বর্ণনা করলাম। আরো অনেক ঘটনা রয়েছে যা বিসদৃশ, বেমানান এবং অনৈতিক, সেগুলো মোকাবেলা করে বাচ্চাদের লেখাপড়া করতে হয়।

পরীক্ষার ফাইনাল রেজাল্ট যদি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে ঘোষণা না করে গ্রেড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এ+এ এ-, বি+ বি বি– তাহলে হয়তো নম্বর নিয়ে অনৈতিকতা কমতে পারে।

অথবা প্রাইমারি পর্যায়ের লেখাপড়া শ্রেণিকক্ষেই সম্পন্ন করা হয়, শ্রেণির কাজ বলে কিছু না থাকে তাহলে বাচ্চারা লেখাপড়ার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে না। আমি তো মনে করি আমাদের যারা এসব পাঠ্যক্রমের সাথে জড়িত—নীতিনির্ধারকসহ—তাদের বিভিন্ন উন্নত দেশের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দেখে আসা উচিত।

প্রতিদিনের উপস্থিতি, খেলাধুলা, হাতের লেখা, ক্লাসে প্রশ্নের উত্তর দেয়া, প্রশ্ন করা, সহপাঠীর সাথে ব্যবহার, শিক্ষকের সাথে ব্যবহার, সৃজনশীল কিছু লেখা, সৃজনশীল কিছু করা, প্রতিদিনের পাঠ্য পড়া ক্লাসেই শেষ করা— এগুলো যোগ করে শ্রেণিকক্ষেই চূড়ান্ত গ্রেড দেয়া হলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। ঘাড়ে বইয়ের বোঝা বইতে হয় না, বাড়ির কাজের ঝামেলাও থাকে না। প্রথম-দ্বিতীয় হওয়ার সমস্যাও থাকে না।

কিন্তু এখানে আমরা তো চলছি উল্টো পথে। প্রাথমিক শিক্ষাকে করে ফেলেছি প্রতিযোগিতামূলক, সার্টিফিকেটভিত্তিক যা মোটেই অভিপ্রেত নয়। আমরা শিশুর বাল্যকালকে হত্যা করছি।

যতদিন ভিন্ন ব্যবস্থা না হবে, বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকলে, আমার মনে হয় অন্তত সৎ সংবেদনশীল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষকরাই প্রাথমিক শ্রেণির বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য নিয়োগ পাবেন এটা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য একটা মাপকাঠি অবশ্যই তৈরি করতে হবে। ভালো শিক্ষকই পারেন ভালো ছাত্র তৈরি করতে। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বাচ্চাদের সুকুমার প্রবৃত্তি বোঝার মানসিকতা তাদের থাকতে হবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিকে খাটো করে দেখলে চলবে না।

বলছি না কোচিং-এর প্রয়োজন নেই। বলছি বাণিজ্যিক কোচিং-এর প্রয়োজনীয়তা যত কম হবে ততই ভালো। এটা অনস্বীকার্য যে, সব বাবা-মা সন্তানদের শিক্ষিত করার ভার বহন করতে

পারেন না। চাকরিজীবী বাবা-মা'র জন্য স্কুলের পর বাড়িতে পাঠদানে সময় দেয়া সম্ভব হয় না। আবার অনেক পরিবারে বাবা-মা হয়তো মানবিক বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন, সন্তান বিজ্ঞান বা বাণিজ্যে পড়ছে। পাঠ্যপুস্তক ও পাঠপদ্ধতিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই বাড়িতে পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যালয় যদি দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়েই অতিরিক্ত কোচিং-এর ব্যবস্থা করে, সে যে বিষয় বা বিষয়গুলোতে দুর্বল সেটা বা সেগুলোতে কোচিং দেয় তবে প্রাইভেট কোচিং-এর দৌরাত্ম্য কমে যাবে বলেই মনে হয়।

এ তো গেল প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা। সন্তান যখন মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে তখন তদের পরিসর বড় হয়ে যায়। হঠাৎ করে পরিবার বা বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে তারা বেরিয়ে আসে। এসময় সে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পা দেয়। তার আচার-আচরণে পরিবর্তন আসে। সে নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক ভাবতে শুরু করে। তার মনোজগতে এবং শরীরেও পরিবর্তন দেখা দেয়। বক্তব্য প্রকাশে এবং ভাবভঙ্গিতে সে হয়ে ওঠে স্বাধীনচেতা। অনেক পিতামাতাই মনে করেন এখন আর সন্তানের দিকে খেয়াল করার দরকার নেই। সে যথেষ্ট বড় হয়েছে। এই সুযোগে সন্তান পারিপার্শ্বিক ভালো-মন্দের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলতেই পারে। এই নজির বর্তমানে বেশ প্রকট। স্বাধীন মুক্তবিহঙ্গ কিছু সন্তান উত্তেজনার বশে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে নিষিদ্ধ পথের হাতছানিতে সাড়া দেয়। নেশা, মাদক তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় নৈতিকতা থেকে বহুদূরে। নেশার যোগান দিতে সে পকেট কাটে, ছিনতাই করে এবং কখনো কখনো সে ভয়ংকর সন্ত্রাসীদের পাল্লায় পড়ে নিজের সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ করে।

সুতরাং সন্তানকে পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করতে দেয়া যাবে না। তার নিয়ন্ত্রণ বাবা-মা'র হাতেই থাকবে। এক্ষেত্রে অনেক বাবা-মা-ই নিয়ন্ত্রণের রশিটা একটু জোরে-শোরেই টেনে ধরেন। ফলে সন্তানের মনোজগতের পরিবর্তিত মানুষটি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে নিয়ন্ত্রণকে বন্ধন মনে করে এবং রাগী ও দুর্বিনীত হতে থাকে। একসময় বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় এবং পরিবারের প্রতি বিতৃষ্ণা তাকে আর ঘরমুখী হতে দেয় না।

এ সময়টা বাবা-মা'র জন্য উভয়সংকট। না করা যায় শাসন–না দেয়া যায় ছাড়। এ সময় হতে হবে কৌশলী। তার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হতে হবে এবং নিজের বয়ঃসন্ধির গল্প করতে হবে। তখন বন্ধুরা মিলে কত সব মজা করা হত, কোন বন্ধুটা কত দস্যি ছিল এবং নিজেরও দস্যিপনার কিছু গল্প ছেলে বা মেয়ের সাথে শেয়ার করতে হবে। এটি আরোপিত হলে চলবে না, বিশ্বস্ততার সাথেই মিশতে হবে সন্তানের সাথে। তবেই তার মনোজগতের হদিস পাওয়া যাবে, তার চিন্তাচেতনার সন্ধান পাওয়া যাবে। কাদের সাথে মিশছে, কী করছে সারাদিন, পড়ালেখার বাইরে তার জগতে কারা প্রভাব বিস্তার করছে এটা বুঝতে পারা যাবে। যদি সব সঠিক পথে এগোয় তাহলে তো নিশ্চিত হওয়া গেল। আর সামান্যতম কিন্তু যদি থাকে তবে আরো গভীরে যেতে হবে,

সন্তানের মনের মধ্যে বুনে দিতে হবে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বীজ। সে অবচেতন মনেই বুঝে যাবে কী তার করণীয় আর কী নয়।

এ তো গেল পারিবারিক বলয়ের কথা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের কথা এড়িয়ে গেলে হবে না। মহাবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিদ্যাপীঠগুলো কেবল নির্ধারিত সিলেবাস যথাসময়ে পড়িয়ে দিয়ে তার দায়িত্ব শেষ করে দেবে এটা কাম্য নয়। তাদেরকেও এই প্রজন্মের দায়িত্ব নিতে হবে, তৈরি করে দিতে হবে এসব ভবিষ্যৎ নাগরিকদের। এ জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য আরো কর্মসূচিও নিতে হবে যাতে তারা যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

আমার দুই ছেলে এখন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডাতে (USF) স্নাতক পড়ছে। ওদের পড়ালেখার পদ্ধতি এবং অন্যান্য কর্মসূচি আমি খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি। মেজর এবং মাইনর সাবজেক্ট ছাড়াও অন্যান্য বিষয়গুলো যেমন ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, ফরেন ল্যাংগুয়েজ, মিউজিক আরো আরো অনেক সাধারণ বিষয় পাঠ্যক্রমের আওতায় রয়েছে—এটাকে ওরা বলে (FKL-foundation knowledge learning), যেন শিক্ষার্থীরা মোটামুটি সর্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠে। সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে অনলাইন কোর্স, হোমওয়ার্ক জমা দেবার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার, কিছু কিছু পরীক্ষাও অনলাইনে নেয়া হয়। পরীক্ষার ফলাফল, প্রতিমাসের মূল্যায়ন সবকিছুই অনলাইনে। ফলে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকায় অনলাইনে আজেবাজে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দেখবার সময় পায় না বা বাকি সময় অনলাইনে থাকার ধৈর্যও তাদের থাকে না। ক্লাসে উপস্থিতির জন্য নম্বর, ক্লাসে প্রশ্নোত্তরপর্বে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নম্বর দেয়া হয়, যেটা ফাইনালে যোগ হয়। পড়ালেখার সাথে সাথে অন্তত পঞ্চাশ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবকেরও কাজ করতে হবে নইলে শিক্ষাসনদ আটকে যাবে। ফলে বিভিন্ন কর্মশালা, জব ফেয়ার বা চাকরিমেলা, বিজ্ঞানমেলা, আন্তর্জাতিক শিক্ষা সেমিনারে কখনোই স্বেচ্ছাসেবকের অভাব হয় না। বরং এগুলো কাজের জন্য লাইনে থাকতে হয়।

গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কিছু খণ্ডকালীন চাকরি রয়েছে, স্বেচ্ছাসেবকের কাজ রয়েছে, যেগুলোতে অংশ নিলে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হতে অতিরিক্ত পয়েন্ট যোগ হয়। নইলে ভর্তি হতে সমস্যা হতে পারে। ফলে নিজের গণ্ডির মধ্যে থেকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়েই জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও হয়তো এখন এরকম অনেক কিছুই আছে যা আমি জানি না। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত জানি, সেটা হল টিউশন পদ্ধতির ব্যাপারে আমাদের অনেক ঘাটতি রয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন পদ্ধতিটি বেশ চমৎকার। এটাকে এরা বলে সাকসেস সেন্টার। এখানে প্রতিটি মৌলিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আলাদা যত্ন নেয়া হয়। বিষয়টা আমি একটু

বিস্তারিতভাবেই বর্ণনা করতে চাই। আশা, যদি পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এদিকটা নিয়ে একটু ভাবেন। অথবা আমাদের সরকার বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক চিন্তা করেন।

চার বছরের স্নাতক কার্যক্রমকে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডাতে বলে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। প্রথম বছরের শিক্ষার্থীদের ফ্রেশম্যান. দ্বিতীয় বছরে সফোমোর, তৃতীয় বছরে জুনিয়র এবং চতুর্থ বছরে সিনিয়র বলা হয়। সাধারণত জুনিয়র এবং সিনিয়র ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে সফোমোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে টিউটর বাছাই করা হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের ডিপার্টমেন্ট থেকে টিউটর হতে আহ্বান জানানো হয় এবং আর সব শিক্ষার্থীদের দরখাস্ত অনলাইনে জমা নেয়ার পর তাদের ইন্টারভিউ করা হয়। যোগ্য বিবেচিত হলে তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। তাদের বুঝিয়ে দেয়া হয় কিভাবে সাকসেস সেন্টারে স্টুডেন্টদের পড়াতে হবে। প্রতি মৌলিক বিষয়ের জন্য পনেরো থেকে বিশ জন টিউটর নিয়োগ দেয়া হয়। শুধু তাই নয় এই টিউটররা ফেডারেল গভর্নমেন্ট কর্তৃকও স্বীকৃত। নিয়োগ পাবার পর ইউনিভার্সিটি থেকে ফেডারেল গভর্নমেন্টকে চিঠি দেওয়া হয় নিয়োগপ্রাপ্ত টিউটরদের সোসাল সিকিউরিটি নম্বর দেয়ার জন্য। এই চিঠি নিয়ে টিউটর সোসাল সিকিউরিটি অফিসে গেলে তার আইডি এবং বিদেশি হলে পাসপোর্ট, ভিসা, সিভিস, আই ২০ ইত্যাদি পরীক্ষা করে জমা নেয়া হয় এবং ইন্টারভিউ নিয়ে তাকে বলা হয় এক সপ্তাহের মধ্যে তার লোকাল ঠিকানায় সোসাল সিকিউরিটি কার্ড পাঠিয়ে দেয়া হবে। কার্ড পাওয়ার পর ইউনিভার্সিটির মানবসম্পদ বিভাগে তা জমা দিতে হয়। এরপরই চূড়ান্ত নিয়োগপত্র দেয়া হয়। নিয়োগপত্রের বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করলাম শুধুমাত্র এর গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য।

শিক্ষার্থীদের যাদের চার পয়েন্ট-এর মধ্যে তিন দশমিক আট-এর ওপরে নম্বর থাকে তারাই সাধারণত নিয়োগ পায়। সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত অবিরাম পাঠদান হয় এখানে। টিউটররা তাদের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এখানে এসে দুর্বল শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে। এটি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। শিক্ষার্থী টিউটর তার ক্লাসের ফাঁকে দু থেকে তিন ঘণ্টা পাঠদান করছে আর যাদের প্রয়োজন তারাও ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এসে পাঠগ্রহণ করে যাচ্ছে, সমস্যার সমাধান করিয়ে নিচ্ছে। ইংরেজি, অঙ্ক, পরিসংখ্যান, পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এসব সাধারণ মৌলিক বিষয়গুলো তো আছেই এর বাইরে প্রকৌশল, তড়িতকৌশল, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ তাবৎ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিষয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের ওপর পাঠদান চলছে অবিরাম। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যাচ্ছে, পড়ছে, গ্রুপ স্টাডি করছে, আটকে যাচ্ছে, সাকসেস সেন্টারে চলে আসছে, পাঠ নিচ্ছে, সমস্যার সমাধান করে ফিরে যাচ্ছে।

এই সাকসেস সেন্টারে অবিরাম পাঠদান এবং সমস্যার সমাধান ছাড়াও রয়েছে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা। কেউ যদি মনে করে তাকে অতিরিক্ত ক্লাসের সাহায্য নিতে হবে, তাহলে সে সেন্টারে এসে তার সুযোগ নিতে পারে। এছাড়া লেখনী মজবুত (রাইটিং স্কিল বাড়ানোর) করার জন্যে ব্যবস্থা। যেমন: বিভিন্ন দেশ থেকে যারা পড়তে আসে, তাদের অনেকের ইংরেজি বাক্য গঠনে দুর্বলতা থেকে যায়, তারা এখানে নিজেদের লেখা অবিরাম পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। কিভাবে

লেখা শক্তিশালী এবং ভাবমাধুর্য দিয়ে লিখতে হয় তা শেখানো হয়। ইংরেজি ছাড়াও স্প্যানিশ, ফরাসি, জার্মানি, ইত্যাদি ভাষারও টিউটরিং আছে। মোট কথা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলো পাঠ্যবিষয় রয়েছে তার প্রত্যেকটির জন্যে বিশেষ কোচিং-এরও ব্যবস্থা রয়েছে।

SAT, GRE, GMAT পরীক্ষা প্রদানের জন্যে যে বিশেষ প্রস্তুতির দরকার সে সংক্রান্ত কোচিং-এর ব্যবস্থাও এই সাকসেস সেন্টারে রয়েছে।

শুধু তাই নয়, কলেজের শিক্ষার্থীরাও যেন এখান থেকে সার্পোট পেতে পারে সে জন্যেও রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। আশেপাশের শিক্ষার্থীরাও এখানে এসে বিষয়ভিত্তিক সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবে বিনে পয়সায়।

উল্লেখ্য, এই সাকসেস সেন্টারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কোনো অংশগ্রহণ নেই। আগেই বলেছি মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে টিউটর নিয়োগ দেয়া হয় এবং এদের পারিশ্রমিকও বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে।

ফলে প্রাইভেট কোচিং-এর প্রয়োজনীয়তা এখানে নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি এরকম সাকসেস সেন্টার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তাহলে কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য অবিসংবাদিতভাবে কমে যাবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি আশেপাশের স্কুলকলেজের শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে। এ কার্যক্রম চালু হলে আমাদের শিক্ষকদের কোচিং- প্রবণতাও কমে যাবে। তাঁরা তখন তাদের নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করতে পারবেন।

এ দেশের মানুষকে সঠিক নির্দেশনা দিলে তারা যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায়।

আর দেরি না করে আমরা যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারি, আমাদের শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মানী দিতে পারি, তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে পারি তবে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মান উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। দুঃখের সাথে বলছি বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেধাশূন্য শিক্ষকই বেশি। এ জন্যে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি যেমন দায়ী তেমনি নিম্ন বেতন স্কেলও দায়ী। আর্কষণীয় বেতনকাঠামো এবং মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বচ্ছ নিয়োগপদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ দিলে প্রাথমিক বিদ্যাপীঠগুলো শক্তিশালী হবে। শিক্ষকদের শিশু মনোজগতের ওপর বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য—এই তিনটি ভাগে একই বোর্ডের অধীনে পড়ানো হয়ে থাকে। যদি আরেকটি বিভাগ যুক্ত করা হয় ইসলামি শিক্ষা বিভাগ নামে অর্থাৎ বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য এবং ইসলামি শিক্ষা তাহলে মাদ্রাসা বোর্ডের দরকার হয় না। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ইত্যাদি যে পাঠ্যসূচি কমন তা শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে পড়বে আর বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য এবং ইসলামি শিক্ষা বিষয়গুলো আলাদা আলাদা পড়বে। ইসলামি

শিক্ষাকে আলাদা গুরুত্ব দিলে বর্তমানে বিরাজিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থাৎ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আত্মীকরণ হতে পারে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে আলাদা কোনো পাঠদানের দরকার পড়বে না। মূলধারার শিক্ষার সাথে এটি একীভূত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডেও কিন্তু বাংলা, ইংরেজি, অংক, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, পরিসংখ্যান, অ্যাকাউন্টিং ইত্যাদি বিষয়গুলোই পড়ানো হয়ে থাকে বলে জানি। এর সাথে ইসলামিক শিক্ষার জন্যে যে বিষয়গুলো নেয়া দরকার তা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য বিষয়েগুলো মূলধারার শিক্ষার্থীদের সাথেই পড়বে আর ইসলামিক বিষয়গুলোর জন্যে আলাদা পাঠ নিতে পারে। বিষয়টা নিয়ে নীতিনির্ধারকগণ ভাবতে পারেন।

আরেকটি বিষয় আমি আলোচনায় আনতে চাই। সর্বস্তরে যদি বাংলাভাষার প্রচলন হয় তবে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলোর দাপটও কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র'র সহযোগিতা সবচাইতে জরুরি। আমাদের সংবিধান বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলেও এটা বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে না। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যখন দাপ্তরিক কাজে বাংলাভাষাকে ব্যবহার করবে তখনই বাংলাভাষা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর তখনই ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলোর গুরুত্বও কমে যাবে। মনে রাখতে হবে, যেসব প্রতিষ্ঠানকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে হয় তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থাকবে যেখানে ইংরেজিতে পারদর্শী ছেলেমেয়েরা কাজ করবে। সেই বিভাগেই শুধু ইংরেজিতে কাজ হবে, তাদের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ কাজ বাংলাতেই করতে হবে।

আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য সিলেবাসে দু'একটি বই অন্তর্ভুক্ত করবে কিনা অথবা পুরনো বইগুলোই আবার ঢেলে সাজাবে কিনা, সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্যে অন্য কোনো উপায় বের করবে কিনা তা ভাবার এখনই সময়। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি কঠিন নয়। শিশুতোষ জ্ঞান বিকাশের সময় থেকেই গুরুত্ব প্রদান করলে এটি সম্ভব।

আমাদের অধিকাংশ শিশুই যেমন হিন্দি কার্টুন দেখার বদৌলতে হিন্দি ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে সেরকম ইংরেজি বুঝতে ও বলতে (লিখতে তো পারেই) পারার জন্যেও তাদের বেগ পেতে হবে না যদি সেরকম পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করা যায়। মূলধারায় যখনি সমান গুরুত্বের সাথে বাংলা এবং ইংরেজি পড়ানো হবে তখনি তারা বাংলা এবং ইংরেজিতে সমান পারদর্শী হবে। আর তখনি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের গুরুত্ব কমবে।

আমাদের দেশে শুধুমাত্র ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের জন্যে যতটা উৎসাহিত করা হয়, প্রশংসা করা হয়, অনুরূপভাবে বাংলায় যারা দক্ষ এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী তাদের কখনোই কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা করা হয় না। ফলে ইংরেজি ভাষার প্রতি আকর্ষণ এবং বাংলার প্রতি বিকর্ষণ বাড়ছে। ইংরেজি কম জানার হীনমন্যতা বাংলা বেশি জানার গৌরবকে ম্লান করে দিচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন: চীন, জাপান, জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স নিজ নিজ ভাষায় জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পৃথিবীতে নিজেদের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। এর জন্যে তাদের ইংরেজিতে পারদর্শী হবার প্রয়োজন হয়নি। তারা নিজেদের ভাষাকে লালন করেছে, শক্তিশালী করেছে, যুগোপযোগী করেছে। অন্য ভাষার বই নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারকে শক্তিশালী করেছে ।

বাংলাদেশ চাইছে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেয়া হোক। নিজ দেশে পরবাসী যে ভাষা, সেখানে এই দাবি কতখানি যৌক্তিক? আমরা যখন বাংলায় শিখব, বাংলায় বলব, বাংলায় চিন্তা করব, বাংলায় জ্ঞানার্জন করব, বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ব করব, বাংলায় বিশেষজ্ঞদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করব, নিজেদের দেশে সর্বস্তরে বাংলাভাষাকে চালু করব তখনি বাংলা ভাষা সার্থক হবে। আমাদের শিশুদের মন ও মননে ভাষার মর্যাদা তখনি প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সে দেখবে বাংলায় দক্ষতা অর্জনের জন্যে সে নিন্দিত নয় নন্দিত হচ্ছে, ইংরেজি ভাষার দৌরাত্ম্য বাংলাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে না, ম্লান করছে না বরং আপন মহিমায় বাংলা ভাষা প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন, তখুনি দুর্যোগের অবসান ঘটবে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন, নীতিনির্ধারক রয়েছেন তাঁরা নিশ্চয় বিষয়টি নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন। ইদানীং প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন বক্তব্যেও দেখা যাচেছ তিনি বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণকে নিন্দা জানিয়েছেন এবং শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার আহবান জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুদ্ধ তথা প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারে।

আমরা জানি গণমাধ্যম হচ্ছে জাতির বিবেক। সরকারের ভুলত্রুটি, জনজীবনে অসঙ্গতি, অন্যায়, বঞ্চনা এবং নির্যাতনের প্রতিবাদ, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে ইতিবাচক ও কল্যাণমুখী জনমত গড়ে তোলায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের গণমাধ্যমে এখন তিনটি ধারা রয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ খবরের কাগজ দৈনিক, সাপ্তাহিক. মাসিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সংকলন এর অন্তর্ভুক্ত যা ছাপার অক্ষরে বের হয়।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া: টেলিভিশন, রেডিও, এফএম রেডিও, অনলাইন পত্রিকা।

মিডিয়ার দায়িত্ব হল; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ইতিহাসকে উপস্থাপন করার পাশাপাশি বৈশ্বিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সম্পর্ক, সমস্যা ও সমাধানের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব আরোপ করে চলমান সংবাদের সাথে সাথে প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং মতামত তুলে ধরা। নিজ দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করা ও সমুন্নত রাখার কাজটিও তাদের।

এই দায়িত্ব তারা কতখানি পালন করছে সে বিষয়টি আলোচনা করছি না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমান যুগটাই হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেটের যুগ। আমাদের তরুণ সমাজ এখন এই মিডিয়াতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

প্রশ্ন হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের দেশজ সংস্কৃতি লালনে কী ভূমিকা পালন করছে? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে শিক্ষণীয় কী ভূমিকা রাখছে?

বিশেষ দিনগুলোতে যেমন ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা ও ভাষা আন্দোলন, মার্চে স্বাধীনতা আন্দোলন, এপ্রিলে পহেলা বৈশাখের বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীতে আমাদের সাংস্কৃতিক অবস্থান তুলে ধরার গতানুগতিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

হাতে গোনা কয়েকটি চ্যানেল ছাড়া বাকি সব ক'টি চ্যানেল-এর নাম ইংরেজিতে। বাংলাদেশের বাংলা চ্যানেল, নাম ইংরেজিতে কেন? সিনেমার গান, ফ্যাশন, সংগীতানুষ্ঠান, চলমান বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের নামও ইংরেজিতে। আমাদের বাংলা ভাষা কি এতই দুর্বল? এসব অনুষ্ঠানের বাংলা নাম দেয়া যায় না? তরুণ প্রজন্মের জন্যে নির্ধারিত কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে এসব অনুষ্ঠানের উপস্থাপকেরা বিকৃত বাংলায় ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে মেকি স্বরে অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলে। এসব উচ্চারণ শুনলে বোঝা মুশকিল এটা কোন ভাষা! যখন একদিকে বাংলাভাষার বিকৃত উচ্চারণ বন্ধে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সোচ্চার, সেখানে এখনো নির্বিচারে কিম্ভূত বাংলায় টিভি চ্যানেল ও এফএম রেডিওগুলোতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে। কিন্তু এসব চ্যানেল এবং রেডিওগুলোই পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্যে কুম্ভীরাশ্রু ফেলতে থাকে।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্যে, দাপ্তরিক ভাষাকে বাংলা করার জন্যে, বাংলার সাথে সাথে ইংরেজিতে ছেলেমেয়েদের পারদর্শী করার জন্যে, শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে বাংলাদেশের শিশুকিশোরদের যোগ্য করে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব কে নেবে? দেশজ সংস্কৃতি রক্ষা করা এবং দেশপ্রেমিক আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলার কাজে এখনি হাত দিতে হবে। বাংলাদেশের শিশু যেন একইসাথে বাঙালি এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্টি সভ্যতার ইতিবাচক নিদর্শক হয়ে ওঠে এজন্যে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজ, পারিবারিক ও সামাজিক প্রচেষ্টা একযোগে অব্যাহত রাখতে হবে। তবেই আমরা বুদ্ধিদীপ্ত দেশপ্রেমিক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে পারব।

[লেখক: শিশু-কিশোর সাহিত্যিক। প্রাবন্ধিক, নিবন্ধকার। ব্যাংকার, অবসরপ্রাপ্ত।]

শিশু নিয়ে কিছু ভাবনা

আ ব দু ল আ উ য়া ল

আমার সুযোগ হয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করার। সে-সব দেশের মধ্যে যদি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশসমূহের কথা বলি, তাহলে দেখা যায়, সে-সব দেশে শিশুরাই সবদিক থেকে গুরুত্বের শীর্ষে। অর্থাৎ সব দিক থেকে শিশুরাই সব কিছুর আগে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আমার মনে হয়েছে, শিশুরাই যেন সেখানে প্রকৃত ভিআইপি। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় ঠিক তার উল্টোটা। এখানে সবচেয়ে অবহেলিত শিশুরাই। এক কথায় বলা যায়, শিশুদের জন্য এখানে কিছুই নেই। আমরা সারাদিন অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাই– সেখানে শিশুদের জন্য কোনো সময় আমাদের হাতে থাকে না। বর্তমান শিক্ষিত সমাজে মা-বাবা দুজনই যদি কর্মজীবী হন, তাহলে তো কথাই নেই– সকালে শিশু-সন্তানকে রেখে যেতে হয় দাদা-দাদী, নানা-নানী বা গৃহকর্মীর কাছে আর সারাদিন শিশুটির কাটে দুর্বিষহ নিঃসঙ্গভাবে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে মা-বাবা দুজনই ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে শিশুটিকে প্রয়োজনমাফিক আদর-যত্ন-সঙ্গ দেয়ার আর অবস্থা থাকে না। কারণ, পরের দিনে কর্মস্থলে যেতে হবে, তার প্রস্তুতির ব্যাপার থাকে। বর্তমান সময়ে তো গৃহকর্মীও পাওয়া যায় না, ফলে যে-পরিবারে দাদা-দাদী, নানা-নানীর সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয় না সে-সব পরিবারে সংকটের সীমা থাকে না। এরকম ক্ষেত্রে বিদেশে ডে-কেয়ারের সুব্যবস্থা থাকে কিন্তু আমাদের দেশে ডে-কেয়ার ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। দু'একটা ডে-কেয়ার থাকলেও সেখানে শিশু-সন্তানকে রাখার ব্যাপারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনাস্থা কাজ করে।

এখন কথা হল উন্নত দেশেও একটি শিশু তার শিশুকালে গুরুত্ব পেলেও জীবনের পরবর্তী সময়গুলো তার কিভাবে প্রবাহিত হয়– বিশেষ করে একটি নারীশিশু জন্মলাভের পর চরম সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এখানে বলে রাখা ভালো, একজন মানুষের শিশুকালকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই– কেননা শিশুকালের ওপর ভর করেই তৈরি হয় পরবর্তী পুরো জীবন– তাছাড়া একজন মানুষ শিশুকাল অতিক্রম করে বটে কিন্তু সে তো জন্মদান করে নতুন কোনো শিশুকে। তো যে কথা বলছিলাম, একটি নারীশিশু যখন জন্ম নিল বুঝলাম তখন সে অনেক যত্ন ও মর্যাদা পেল কিন্তু উন্নত দেশে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় মা-বাবা'র মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে যায়– এরকম পরিস্থিতিতে শিশুসন্তানটি এক চরম নেতিবাচক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে নারীরা শিশু-কিশোরকাল অতিক্রম করে যৌবনে পা রাখার পর বিয়ের কিছুদিন বাদে সন্তানের মা হলে

তখন স্বামীর কাছে সে গুরুত্ব হারাতে থাকে– এক পর্যায়ে স্বামী পুনরায় বিয়ে করে এবং শিশু-সন্তানকে নিয়ে মাকে কাটাতে হয় আরেক বিভীষিকাময় বাস্তবতা। একসময় সন্তান বড় হলে মা থেকে সে-ও আলাদা হয়ে যায় এমনকি মায়ের কোনো খোঁজও রাখে না। এভাবে বয়স বেড়ে যাওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মা-বাবা, স্বামী-সন্তান-বন্ধুহীন বাস্তবতায় তার নির্ধারিত জায়গা হয় বৃদ্ধাশ্রম! একদিন অনিবার্যভাবে মৃত্যু তাকে ডাক দিলে এমন কোনো আপনজনও থাকে না যে বা যারা তার সৎকারের ব্যবস্থা করবে! সুতরাং একজন শিশুকে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক যত্ন দেয়া সত্ত্বেও পারিবারিক বঞ্চনা তাকে গড়ে তোলে এক ভিন্ন মানুষ হিসেবে, যে মানুষটির জীবনে স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা প্রাপ্তির জগতে বড় ধরনের ঘাটতিবশত অপরের প্রতিও ভালোবাসা ও প্রেম প্রদানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা ও হিংস্রতা।

বাংলাদেশে ছোট শিশু-কিশোরদের পড়াশুনার জন্য যে পরিমাণ চাপের মধ্যে রাখা হয় সেটি অমানবিকই নয় বরং বলা যায় এই চাপ তার মনের বিকাশের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। ভোর না-হতেই দশ কেজি ওজনের একটি ব্যাগ কাঁধে করে ছুটতে হবে স্কুলে এবং স্কুলে পৌঁছেই একটা নিরানন্দ শৃঙ্খলের মধ্যে পড়তে হবে– এই সব ভয় ও তিক্ততা নিয়ে প্রতি রাতে ঘুমাতে যায় প্রতিটি শিশু। একবার অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ হাস্যোচ্ছলে বললেন, "আউয়াল সাব, আমাদের সময় এরকম চাপ থাকলে আপনিও আপনি হতেন না আর আমিও আমি হতাম না"!

সায়ীদ স্যার তাঁর 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' গ্রন্থে লিখেছেন, "যে-বয়সে সন্ধ্যার আকাশের একটি-দু'টি তারার মতো জীবনের আকাঙ্ক্ষারা একটু একটু করে ফুটে উঠতে থাকে, জীবনের সুকুমার স্বপ্নেরা থরে-থরে স্তবকে-স্তবকে বিকশিত হতে থাকে, সেই বয়সটাকে যদি শুধু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ আর প্রাইভেট টিউটরের দুয়ারে দুয়ারে এভাবে নিষ্পিষ্ট করে ফেলা হয় তবে সেই সন্তান তো উপভোগ-শক্তিবর্জিত একটা মূঢ়, অকর্ষিত ও অবিকশিত মানুষ হিসেবে রয়ে গেল।"

আমি বলতে চাই, পড়াশুনা নিয়ে এত চাপাচাপির পরে আমরা কি সমাজকে সত্যিকার অর্থেই কিছু দিতে পারে এমন ছেলে-মেয়ে পাচ্ছি? নাকি অতিরিক্ত চাপের ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ভয় ও মানসিক বিপর্যয়! বরং সামাজিক জ্ঞান বিপর্যিত অন্তর্মুখী জেনারেশন তৈরি হচ্ছে বছরের পর বছর। ফলে বাস্তব জীবনে সংকট মোকাবেলা করতে না-পেরে মুষড়ে পড়ে আত্মকষ্টের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে পড়ে এদের জীবন।

বিশেষ করে ঢাকায় শিশু-কিশোরদের খেলার কোনো মাঠ নেই। যে দু'চারটি মাঠ ছিল সেগুলোও দখল হয়ে গিয়েছে! একজন আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হিসেবে বলতে পারি, আমাদের কৃত সবগুলো ভবনের ছাদে শিশু-কিশোরদের খেলার জন্য সুব্যবস্থা রাখা হয় এবং প্রতিটি ভবনের ফ্ল্যাটমালিকদের উৎসাহিত করা হয় যাতে শিশু-কিশোরদের খেলার সুযোগ ধরে রাখার জন্য সবাই এগিয়ে আসেন। আমরা যদি ঢাকার অধিকাংশ পরিকল্পিত ভবনের ছাদকে এভাবে শিশু-কিশোরদের জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারি, তাহলে আমার ধারণা শিশু-

কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এক কার্যকরী ভূমিকা তৈরি হবে। এক জরিপে দেখা গেছে, নগরের শিশু-কিশোররা অতিমাত্রায় স্থূল হয়ে যাচ্ছে, যে স্থূলতা অনেকটা কমে আসতে পারে আবাসন ভবনের ছাদগুলোতে ওদের খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে।

সরকার কার স্বার্থে পঞ্চম শ্রেণিতে (পিএসসি) এবং অষ্টম শ্রেণিতে সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার আয়োজন করল ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর মা-বাবার মধ্যে প্রতিযোগিতার আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা এত ছোট বয়সে প্রায় সবকিছুতেই সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে– যে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ করে মা-কে দারুণভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়। কেউ কেউ বলেন, এত সিরিয়াস হওয়ার কী আছে, পরীক্ষাকে হালকাভাবে দেখলেই তো হয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সময় পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পয়েন্ট নিয়ে যদি স্কোর করা হয়, তাহলে অভিভাবকদের নিশ্চয়ই টেনশনের কারণ রয়েছে! কথা হল, এই টেনশনকে কেন আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হল! সরকার-ই-বা এখান থেকে কী পেতে চায়, সেটা আমার বোধগম্য নয়।

যেমন এই বছর পাঠ্যবইয়ে যে পরিমাণ ভুল দেখা যাচ্ছে তা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। এত ভুল বই পড়ে শিশু-কিশোররা বিভ্রান্ত হচ্ছে। এর চাপ বহন করতে হচ্ছে গার্জিয়ানদের। কিন্তু এই সংকটের উৎস যেখানেই হোক, এর দায় বহন করতে হচ্ছে যে শিশু-কিশোর এবং তাদের মা-বাবাদের, সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো কার্যকর উপায় তো আমরা দেখছি না। যে হতাশা গ্রাস করছে আমাদের পুরো সমাজকে!

[লেখক: প্রবন্ধ/নিবন্ধকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।]

জাদুঘরের গল্প: শিশুদের নিয়ে শিশুদের প্রতি

নীরু শামসুন্নাহার

বন্ধুরা 'জাদুঘর'– এই শব্দটির সাথে তোমাদের নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। আবার যেন ভেবে বোস না এখানে জাদু দেখানো হয়। জাদুর ইংরেজি *Magic* আর *Museum*-এর বাংলা জাদুঘর। তোমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে *Museum*-এর *বাংলা নাম কী করে জাদুঘর হল,* তাহলে শোন জাদুমণিরা– গ্রিক পুরাণের দেবরাজ জিউসের নয় কন্যা— কাব্য, সংগীত, নাচ, ইতিহাস ও অন্যান্য বিদ্যার সংরক্ষক দেবী হিসেবে একত্রে *Muse* নামে অভিহিত হন। জাদুঘরের ইংরেজি *Museum* নামটি দেবী *Muse* থেকে নেয়া হয়েছে। শোনা যায়, প্রাচীনকালে রাজাদের মধ্যে কে কত বেশি ক্ষমতাবান এবং ঐশ্বর্যশালী তার একটা প্রতিযোগিতা হত। একজন আরেকজনকে টেক্কা দেয়ার এ ধরনের প্রবণতা থেকে তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বিচিত্র সব উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলো রাজগৃহের মূল ফটকের পাশে একটা কক্ষে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে নিজ রাজ্যের প্রজাসাধারণকে—বিশেষ করে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাদের নিমন্ত্রণ করে এনে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজের শৌর্য প্রদর্শন করতেন। ধারণা করা হয়, পরবর্তীতে প্রদর্শনের এই ধারাটি শুধুমাত্র রাজ-ঐশ্বর্য প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ধীরে ধীরে আমাদের পূর্বসূরিদের জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা ও জীবন-যাপনের নানা বিচিত্র উপাদান, মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা শুরু হয়। কালে কালে এই প্রবণতাটি পশ্চিমা বিদ্বৎজনের কাছে গুরুত্ব পেতে থাকে এবং জ্ঞানচর্চার একটি বিশেষ শাখায় পরিণত হয়। উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ-বাংলাতেও জাদুঘর আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে জ্ঞানচর্চার বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অন্য কোনো সংখ্যায় অবিভক্ত বাংলায় জাদুঘরবিদ্যা চর্চার পথিকৃৎদের কথা তোমাদের জানানোর ইচ্ছে রইল।

'জাদুঘর' এই শব্দবন্ধের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গিয়ে যেন অবধারিতভাবেই জাদুখেলা এবং জাদুকরের প্রসঙ্গ আলোচনায় এসে পড়ে। দেখা গেল জাদু বা ম্যাজিক শব্দের মানে হল বিজ্ঞান, সম্মোহনী বিদ্যা ও প্রখর উপস্থিতবুদ্ধির সমন্বয়ে পরিবেশিত ভোজবাজির খেলা, যা মানুষকে একই সাথে বিস্মিত ও আনন্দিত করে। বর্তমানে আধুনিক জাদুঘর পরিদর্শনে গিয়ে যখন কোনো দর্শক—বিশেষ করে তরুণ দর্শক পূর্বসূরির রেখে যাওয়া নিদর্শন দেখেন তখন ঠিক জাদু দেখার মতোই বিস্মিত ও আনন্দিত হন। ধারণা করা যায়, একই সাথে অপার বিস্ময় ও

আনন্দিত চিত্তে জ্ঞান আহরণের জন্যই *Museum* -এর বাংলা নাম হয়েছে 'জাদুঘর'। বন্ধুরা ইংরেজি *Museum*- কী করে বাংলায় 'জাদুঘর' হল তার একটি ধারণা তোমরা পেলে।

'জাদুঘর' নিয়ে বলতে গিয়ে 'জাদুকর' আচার্য পি.সি. সরকারের নামটি আলোচনায় যেন অবধারিতভাবে চলে আসছে। এখনো বিশ্বের সবচাইতে তুখোড় জাদুকর হিসেবে তাঁর নামটি উচ্চারিত হয়। অবিভক্ত বাংলার টাংগাইলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এখনো তাঁকে বিশ্বের সকল জাদুকরদের শিক্ষাগুরু হিসেবে মান্য করা হয়। তাই তাঁর নামের আগে যুক্ত হয় 'আচার্য' পদবি। তাঁকে 'জাদুসম্রাট'ও বলা হয়। জাদুবিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ একজন বাঙালি—এই পরিচয় বিশ্বসভায় বাঙালি জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায়।

এবার চল বাংলাদেশের জাদুঘর সম্পর্কে কিছু জানি। বিশ্বের সব দেশেই নানা রকমের জাদুঘর আছে। আমাদের দেশেও বেশ ক'রকমের জাদুঘর আছে। এগুলোকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–বহুমুখী (Multidisciplinary Museum) এবং বিশেষায়িত (Specialized Museum) জাদুঘর।

যে জাদুঘরে দেশের ভূ-প্রকৃতি, প্রাণীকুল, গাছ-পালা, ফুল-ফল, লতা-গুল্ম আর পূর্বসূরিদের জীবন-যাপনের ইতিহাসকে বিভিন্ন উপাদানের (জাদুঘরের ভাষায় নিদর্শন) মাধ্যমে তুলে ধরা হয় সে ধরনের জাদুঘরকে 'বহুমুখী' হিসেবে গণ্য করা যায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (১৯১৩)কে বহুমুখী (Multidisciplinary Museum) জাদুঘর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর—বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (১৯১০)। এটি একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৬টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর রয়েছে। পাহাড়পুর, ময়নামতি, ষাট গম্বুজ, লালবাগ দুর্গ, প্রভৃতি অন্যতম পুরাকীর্তি। এগুলোর মধ্যে আমাদের ইতিহাসের সবচাইতে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে। উৎখনন (*Excavation*) করে পাওয়া নিদর্শনগুলো মহাস্থানগড় জাদুঘরে গেলে তোমরা দেখতে পাবে। সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারি-বটেশ্বরে প্রত্নখননে যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা সবই মহাস্থানগড়ে পাওয়া প্রাচীন কীর্তিগুলোর সমকালীন, আড়াই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের। উয়ারি-বটেশ্বরকে কখনো কখনো বাংলাদেশের সবচাইতে প্রাচীন স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বন্ধুরা জেনে রাখো মহাস্থানগড়ই এখন অবধি সবচাইতে প্রাচীন স্থান। উয়ারি-বটেশ্বর মহাস্থানগড়ের সমকালীন প্রত্নস্থান। আর বিশেষায়িত জাদুঘর বলতে বলা যায়। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয়, স্থান, স্থাপনা, সময় ও ব্যক্তিত্বনির্ভর জাদুঘর, যেমন—চট্টগ্রামের নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘর, সোনারগাঁ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, ঢাকা নগর জাদুঘর, রাঙামাটি আদিবাসীদের টঙ্গ্যা জাদুঘর, পঞ্চগড়ের রকস্ মিউজিয়াম, গাজীপুরের শস্যবীজ সংরক্ষণ জাদুঘর, যমুনা সেতু প্রাণী জাদুঘর, ফরিদপুর মৎস্য জাদুঘর, ঢাকার সানির ওল্ড কার মিউজিয়াম, জিপিওতে অবস্থিত ডাক-জাদুঘর, বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা জাদুঘর, অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন নির্মিত অগ্রসর বিক্রমপুর জাদুঘর প্রভৃতিকে বিশেষায়িত জাদুঘর হিসেবে গণ্য করা যায়। শহীদ মতিউর স্মৃতি

জাদুঘর, ঢাকা, ময়মনসিংহ জাদুঘর, রংপুরের তাজহাট জাদুঘর, পানাম শহর প্রভৃতি। তোমাদের আরো একটা তথ্য জানাই, এ সব জাদুঘর ছাড়া সারা দেশে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি-স্থাপনা রয়েছে ৪৪৮টি!

আমাদের রয়েছে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বনির্ভর জাদুঘর (Memorial Museum), যেমন– ঢাকার ধানমণ্ডিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক বত্রিশ নম্বর বাড়িতে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' ও টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু সমাধি-কমপ্লেক্স। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার ধানমণ্ডিতে অবস্থিত বত্রিশ নম্বরের এই বাড়িকে কেন্দ্র করেই রহমান তাঁর সকল রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা জনগণকে প্রদান করেছেন। এই বাড়ি থেকেই পাকিস্তান সামরিক জান্তা তাঁকে আটক করে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস করাচি জেলে বন্দি করে রাখে। রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়। আবার এই বাড়িতেই বাংলার মানুষের মুক্তির এই মহানায়ক স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে, মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে যখন দেশের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তখনই কিছু বিপথগামী সেনার নৃশংস ঘাতকের বুলেট তাঁকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ তাঁর সবচয়ে প্রিয় জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিল। কিন্তু জীবিত মুজিবের চাইতে শহিদ মুজিবের রক্ত আরো বহুগুণ শক্তিশালী, তার প্রমাণ বর্তমানের অগ্রসর বাংলাদেশ।

সিলেটে জেনারেল এম.এ. জি. ওসমানীর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ওসমানী জাদুঘর, মওলানা ভাসানী স্মৃতি জাদুঘর, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, শিলাইদহ ও সাজাদপুর রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, জয়াগের মহাত্মা গান্ধী আশ্রম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত জাদুঘর, নড়াইলের এস.এম. সুলতান স্মৃতি জাদুঘর, পল্লিকবি জসিম উদ্‌দীন স্মৃতি জাদুঘর, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু জাদুঘর প্রভৃতি। এ ছাড়া রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর জাদুঘর, যেমন– জাতির পিতা স্মৃতি কারা জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা স্মৃতি কারা জাদুঘর, ডাকসু সংগ্রহশালা, শহীদ মতিউর সংগ্রহশালা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর প্রভৃতি। সরকারি, বেসরকারি, বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক, ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর—সব মিলিয়ে প্রায় দু'শতের বেশি জাদুঘর রয়েছে সারা বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে জাদুঘর-আন্দোলনের সূত্রপাত কখন, কী ভাবে হল সে এক ইতিহাস। সে গল্প আরেকদিন তোমাদের শোনাব। আজ শুধু এটুকু জেনে রাখ যে, ইংরেজরা যখন এ দেশকে শাসন আর শোষণ করছে, ঠিক সে সময় কুড়ি শতকের প্রথম দশকে পূর্ববাংলার বেশ কয়েকজন ইতিহাসমনস্ক মানুষ তাঁদের দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এই ভূ-খণ্ডে হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এই ঐতিহ্যের ধারক-বাহক জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে হলে ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপাদানগুলোকে রক্ষা করতে হবে। আর

ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষা করতে হলে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। এভাবেই স্বাধিকার আন্দোলনের একটি ধারা হিসেবে জাদুঘর-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

বন্ধুরা, জাদুঘরের কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দু'একটি কথা তোমাদের জানালাম। জাদুঘর নিয়ে তো বেশ আলোচনা হল, নানা রকম জাদুঘরের নামও জানা গেল। চল এবার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঘুরে আসি। কি? খুব চেনা লাগছে তোমাদের? হ্যাঁ এটিই রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় জাদুঘর। নিশ্চয়ই অনেকেই এই জাদুঘরটি দেখতে গিয়েছ।

তোমরা কি জান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কাজ কী? বলছি, শোন–বিশ্বের যে কোনো জাদুঘরের মতোই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কতগুলো মূল কাজ হল—দেশের প্রাচীন আর সমকালীন ইতিহাসের উপাদান বা নিদর্শন সংগ্রহ করা, তারপর নিদর্শনগুলোকে সংরক্ষণ করা অর্থাৎ কি-না যত্ন করে রাখা, গবেষণা এবং প্রদর্শন করা। 'প্রদর্শন' মানে হল সোজা বাংলায় দেখানো। এইসব ঐতিহ্যবাহী উপাদান আমাদের পূর্বসূরিদের সৃজনশীলতার জীবন্ত প্রমাণ। তোমরা যখন এইসব স্মৃতি-নিদর্শন কাছ থেকে দেখবে, তখন মনে হবে যেন অতীতের বর্তমানতায় পৌঁছে গেছ। এইসব নিদর্শন তোমার সাথে ইতিহাসের কত কথা বলছে!

বন্ধুরা, একটা কথা মনে রাখবে এইসব স্মৃতি-নিদর্শনগুলোর মধ্য দিয়েই অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। জাদুঘর শুধুমাত্র আমাদের প্রাচীন সমাজের আয়নাই নয় বরং চলতি কালের বস্তু ও মানবসংস্কৃতি-সম্পদের এক প্রাণময় কোষ। ভবিষ্যতে তোমরাই জাদুঘরবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে এইসব অনন্য উপাদানগুলো নিয়ে গবেষণা করে ইতিহাসের অনেক অজানা কথা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে। পুরো বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখবে অনন্য এক বাংলাদেশকে। তোমাদের মতো তরুণদের মননে ইতিহাসকে তুলে ধরা যাতে নিজেদের সংস্কৃতির শেকড় কত শক্তিশালী তা তোমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পার।

স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, যেমন– শিশু চিত্রাঙ্কন, সুন্দর বাংলা হাতের লেখা, উপস্থিত বক্তৃতা, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তোমরাও পুরস্কার পেতে পার। বিজয়ীদের আঁকা ছবি দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় আর অ্যালবামও প্রকাশ করা হয়।

এখন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠিত হল তা নিয়ে কিছু তথ্য জানা যাক। ১৯০৯ সালে ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়। ১৯১২ সালের ২৫ জুলাই গভার্নর লর্ড কারমাইকেলের সম্মানে ঢাকার নর্থব্রুক হলে নাগরিক সংবর্ধনার অয়োজন করা হয়। সংবর্ধনার সভায় দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে লর্ড কারমাইকেলের কাছে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। ১৯১৩ সালের ৫ মার্চ ঢাকায় জাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাবনাটি অনুমোদিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তখনকার ব্রিটিশ সচিবালয়ের একটি

কক্ষে (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) কয়েকটা মূর্তি ও কিছু মুদ্রা দিয়ে সর্বপ্রথম 'ঢাকা জাদুঘর' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট জনসাধারণের জন্য এটি খুলে দেয়া হয়। ১৯১৪ সালের ৬ জুলাই ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭) প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা জাদুঘরে যোগদান করেন। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর অধ্যক্ষ নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম অধ্যবসায় ও মমতা দিয়ে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জাদুঘর আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে অধ্যক্ষ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সতত স্মরণীয়। ১৯১৫ সালে জাদুঘরটি নিমতলির বারদুয়ারী ও দেউরিতে স্থানান্তরিত হয়।

অধ্যক্ষ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রায় একক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ঢাকা যাদুঘর ঢাকার একটি অন্যতম দর্শনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে। তোমাদেরকে একটা মজার তথ্য জানাই– ১৯১৫ সালের ৩১ মার্চ এইচ.ই. স্ট্যাপলটন ঢাকা জাদুঘরের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন (Annual Report of the Dacca Museum 1915-1952)। ২৫ আগস্ট ১৯১৪ থেকে ১৯১৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৫৩ দিনে ৪,৪৫৩ জন দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে পুরুষ দর্শক ৪,৩১০, নারী দর্শক ১৪৩ জন। গড়ে প্রতি ২৯ জন দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এই দর্শকসংখ্যা সে সময়ের জনসংখ্যার তুলনায় একেবারে কম নয়।

জাদুঘরটি শাহবাগে নতুন ভবনে নিয়ে আসা পর্যন্ত নিমতলিতেই ছিল। ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর 'ঢাকা জাদুঘর'কে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে শাহবাগের নতুন ভবনে একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

২০১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। বন্ধুরা আমাদের সবার প্রিয় এই জাদুঘরটি এখন নিজেই এক ইতিহাস। জনগণের চেতনায় নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা নির্মাণে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে শতবর্ষী এই জাদুঘরটি।

জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ নিদর্শন সরাসরি নিজের চোখে দেখে, উপলব্ধি করে ইতিহাসের গভীরতর শেকড় থেকে টেনে নেবে ঐতিহ্যের প্রাণরস এবং নবসৃষ্টির আনন্দে তোমরাই বাংলাদেশকে গড়ে তুলবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' রূপে।

[লেখক: শিল্পকলা গবেষক, জাদুঘর আন্দোলক। উপ-কিপার, ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। ই-মেইল: niru.terracotta@yahoo.com]

আজকের শিশু আগামী দিনের বাংলাদেশ

মো ফা জ্জ ল শা ম স্

ক' মাস আগে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে নারায়ণগঞ্জ অফিসার্স ফোরামের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেই। প্রধান অতিথি এম.পি. সেলিম ওসমানের বক্তৃতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। তিনি বন্দর এলাকায় একটি স্কুলে গিয়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্রকে বাঘ দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে ছাত্রটি বাঘ দেখেছে বলে জানায়। কোথায় দেখেছে? উত্তর, টেলিভিশনের পর্দায়। ডোরাকাটা বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমার এক আত্মীয়ের ছেলেকে নিয়ে তার চাচা ঢাকা চিড়িয়াখানায় গেছে। বানরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছে। চাচার প্রশ্ন, বাবা কী দেখছ? উত্তর, বানরগুলোকে কে নাচাচ্ছে? রিমোট কন্ট্রোল কোথায়? ব্যাটারি কোন স্থানে, লাগিয়েছে। এ হল আজকের শিশুর শৈশবকালের অবস্থা।

এ কালের শিশুরা টিভি দেখে রিমোট কন্ট্রোল টিপে। ব্যাটারিচালিত খেলনা খেলে রিমোট কন্ট্রোলে। পরিবারের সবাই ব্যস্ত থাকে বলে তাদেরকে চিড়িয়াখানা, খেলার মাঠ কিংবা পার্কে নেয়া হয় না। শহরের যান্ত্রিকতার সাথে মিশে গেছে সব।

আজকের শিশু আগামী দিনের বাংলাদেশ। এমনিতেই মাদকের আগ্রাসনে একটি প্রজন্ম প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। পরবর্তী প্রজন্ম কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবে আসক্ত। তাহলে আগামী দিনের বাংলাদেশ কেমন হবে? কে নেতৃত্ব দেবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে।

আজকের শিশু বইভর্তি ব্যাগের চাপে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। স্কুলগেটের ভ্যান থেকে অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। বসতবাড়িতে আঙিনা না থাকায় ঘরকুনো হয়ে টিভি দেখে। স্কুলে খেলার মাঠ নেই। নেই সুকুমার বৃত্তির চর্চা। অনেক বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা শিক্ষক পর্যন্ত নেই। বৎসর শেষে বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় না। নেই কোনো প্রার্থনাকক্ষ। এ ভাবে বড় হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে" আনা স্বাধীনতা, লাল-সবুজের পতাকা আর সার্বভৌম ভূখণ্ড, এর দায়িত্ব কার হাতে বর্তাবে? কে নেবে নেতৃত্ব?

শৈশবে আমাদের অভিভাবকেরা সন্ধের মধ্যে ঘরে ফেরাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত।

এখানকার অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের বাইরে বের করার জন্য বহু চেষ্টা করেও সফল হয় না। তার উপরে সংসারভাঙার হিড়িক। স্বামী-স্ত্রীতে দোষারোপ। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। ভাঙা পরিবারের শিশুরা বড়ই অসহায়। ঘরে ঘরে ঝগড়াঝাটি।

দুই.

শহরে যৌথ পরিবার নেই বললেই চলে। সন্তানদের শৈশব কাটছে কাজের বুয়া আর ড্রাইভার মামার সাথে। জীবন ও জীবিকার জন্য ব্যস্ত পরিবারের কর্তাব্যক্তি- বেগমসাহেবরা। মনমানসিকতা বিকাশের সব পথ রুদ্ধ। অভিজাত ফ্যামিলিতে আরো ব্যস্ততা। উপরের তলায় পার্টি হচ্ছে। নিচতলায় খুন হচ্ছে পরিবারের অসহায় মেয়েটি। আর কত দেখতে হবে এ রকম ভয়ংকর পরিস্থিতি?

তাই আগামী দিনের বাংলাদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেখতে চাইলে শিশুদের দিকে খেয়াল করতে হবে। আজকের শিশুই আগামীদিনের বাংলাদেশ। শিক্ষাব্যবস্থাকে শিশুদের উপযোগী করে সাজাতে হবে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে।

এ ব্যাপারে সরকারকে নিতে হবে সুসংহত ভূমিকা। শিক্ষা কারিকুলাম এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষা নিতে গিয়ে আনন্দ পায়।

শিশু সংগঠনগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে পথশিশু পর্যন্ত তাদের আওতায় আসে।

আনন্দময় শৈশবই পারে একটি জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে। শৈশবকে আনন্দময় করতে হলে তাই কোমলমতি এসব শিশুদের মন বুঝতে হবে। তাদের চাওয়াকে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারা যাতে ধারণ করতে পারে তা শেখাতে হবে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মাত্র ন' মাসে কিভাবে এ দেশের কিশোর আর যুবকেরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল তা জানতে হবে। বাঙালি বীরের জাতি। তার বীরত্বগাথা ইতিহাসের পরতে পরতে লেখা রয়েছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন' ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৬৬'র ছয় দফা, ৭০'র নির্বাচন সর্বোপরি একাত্তরের স্বাধীনতা। এসব গেঁথে দিতে হবে শিশুমনে। তবেই আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে সুখী সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী।

[লেখক: কবি, গদ্যশিল্পী। জেনারেল ম্যানেজার, অবসরপ্রাপ্ত, সোনালী ব্যাংক লি.।]

আমাদেরও আছে অধিকার

আ লী ই মা ম

শিশুরা হচ্ছে পৃথিবীর সোনালি আশা। তাদের অধিকাংশের চোখে-মুখে রয়েছে স্বপ্নের ঝিলিক। তারা চারপাশের পৃথিবীকে খুব সহজেই সজীব করে তুলতে পারে। শিশুদের মাঝে সুপ্ত রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। তারা নতুন কুঁড়ির মতো। ফুল হয়ে ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে শিশুরা রয়েছে অবহেলিত। সুবিধাবঞ্চিত। দারিদ্র্যের কারণে তাদের সংগ্রাম করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য। নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে কখনো নিয়োজিত হতে বাধ্য হয় তারা। তারা বীজের মতো। বিশাল মহীরুহ হবার সম্ভাবনাকে বুকের মাঝে সঞ্চিত রেখেছে। শিশুরা হচ্ছে ভবিষ্যৎ-এর যাত্রাপথের পথিক। শিশু, এই শব্দটির মধ্যে যেন মিশে রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা। তাই বলা হয়েছে 'শিশুরাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ'। পৃথিবীর আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বর্তমানের শিশুদের উপর। তাই স্লোগান তৈরি হয়েছে 'সবার আগে শিশু'। এই কথাটি খুবই গুরুত্বের সাথে এখন বলছেন সমাজের নেতারা। বিভিন্ন সম্মেলনে অত্যন্ত জোরালোভাবে এই বক্তব্যকে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রচারমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন জনপদের শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সমাজপতিরা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছেন শিশুদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য। তাঁরা চাইছেন সমাজকে সুন্দর আর নিরাপদ করতে। সমাজকে গ্লানিমুক্ত রাখতে। সুস্থ রাখতে। তাঁরা অনুভব করছেন এই বিশ্বকে সত্যিকার অর্থে বাসযোগ্য করে তুলতে হলে শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাদের ন্যায্য অধিকারকে সব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে থাকতে হবে পরিষ্কার ধারণা। তাদের দাবি সম্পর্কে সকলকে হতে হবে সচেতন। তাই এখন নতুনভাবে তৈরি হয়েছে বক্তব্য 'সব শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বদলে দেব এই পৃথিবী'। এই অঙ্গীকার এখন প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। সবাই বুঝতে পারছেন আজকের শিশুকে যদি সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন না করা হয় তবে আগামী দিনের পৃথিবী তলিয়ে যাবে হতাশার ঘন অন্ধকারে। আশার আলো থাকবে না

কোথাও। চারপাশকে ঘিরে রাখবে অমানিশা। শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশের উপর নির্ভর করছে সমাজের উন্নতি আর ভবিষ্যৎ।

শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছে। এই সনদ এখন একটি আন্তর্জাতিক আইন। এই সনদ তৈরি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে শিশুদের অধিকারসমূহকে দেয়া হয়েছে স্বীকৃতি। এই সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়নের জন্য আইনি সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। শিশু অধিকার সনদ যেন পৃথিবীর কোটি কোটি শিশুর সামনে স্বপ্নরাজ্যের দুয়ারকে খুলে দিল। অন্ধকার কাটিয়ে উদ্ভাসিত হল আলোময় ভুবন। সমাজপতিরা হাত বাড়িয়ে দিলেন শিশুদের দিকে। আশ্বাসের হাত। বলতে চাইলেন, আমরা রয়েছি তোমাদের সাথে। তোমাদের জন্য নিরাপদ এক ভুবন তৈরি করতে চাই আমরা। যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের ভীতি আর হতাশা। শিশুরা খুঁজে পেল আস্থা। তাদের জন্য দেশে দেশে গৃহীত হল না কল্যাণকর কর্মসূচি। অন্ধকারের বুক চিরে প্রবাহিত হল আলোকের ঝরনা।

জাতিসংঘের শিশু সনদে রয়েছে এই শুভ বিশ্বাসের কথা। কল্যাণময় পৃথিবীর কথা। বলা হয়েছে, বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে প্রতিটি শিশুর জন্মগত। শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলোর মাঝে আছে শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা পাবার অধিকার, সুস্থ সামাজিক পটভূমিতে বেড়ে ওঠার অধিকার খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকার। দুর্যোগ মোকাবেলায় সবচাইতে আগে সাহায্য পাবার অধিকার। মোট ৫৪টি ধারায় বর্ণিত হয়েছে শিশুদের এইসব মৌলিক অধিকার।

সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে বিশ্ব শিশু আন্দোলন। শিশুদের প্রতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক পরিমাণে। এমনি এক আন্দোলন হচ্ছে 'শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন'। এই আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছে ইউনিসেফ। এখন এই আন্দোলনের ধারায় দেশে দেশে নেয়া হচ্ছে নানা ধরনের কর্মসূচি। বিভিন্ন দেশের সরকার ও বিভিন্ন ভাষার মানুষ এই কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেছে। এতদিন ধরে শিশুদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল তার আমূল পরিবর্তন করবে এই কর্মসূচি। শিশুদের প্রতি বড়দের আচরণে আসবে এক ব্যাপক পরিবর্তন। এই আন্দোলন বিশ্বের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে শিশুদের ভাগ্য পরিবর্তনের। তাদের কর্মসূচির প্রতি ইতিবাচক হতে হবে। এ মুহূর্তে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন শিশুদের জন্য এক নতুন বিশ্ব সৃষ্টির। যেখানে শিশুদের মতামত পাবে প্রাধান্য। তাদের সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য তাদের পরামর্শ শোনা হবে আন্তরিকভাবে। শিশুদের ভাবতে হবে সমাজের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। শিশুদের নিজেদের সাথে সরকারের নতুনভাবে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের মাঝে যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে তা প্রকাশের জন্য সব প্রয়োজন তা তাদের দিতে হবে। বিশ্ব শিশু আন্দোলন সূচনা করেছে এই পরিবর্তনের। অধিকারবঞ্চিত শিশুদের জীবনে নতুন আশা আর উদ্দীপনার আলো ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। শোষণের থাবা থেকে তাদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত থেকে অকালেই তাদের

জীবনীশক্তি যাতে ক্ষয় না হয়ে যায় তার জন্যে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। শিশুদের প্রতি শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হচ্ছে। শিশুদের দেয়া হচ্ছে স্বাস্থসেবা। শিশুদের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে অসামান্য সম্ভাবনার বীজ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লবী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, 'যে জাতি শিশুদের কথা ভাবে না, সেটা কোনো জাতিই না'।

একটি জাতিকে যদি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে সে জাতির শিশুদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ জন্যে নিতে হবে বিভিন্ন সুষ্ঠু কার্যক্রম। শিশুদের দিতে হবে অগ্রাধিকার। তাদের দাবিগুলো বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে হবে। শিশুরা প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করছে,

আমরা সুন্দর আমরা শিশু
এসো গাই জীবনের গান
এই অপরূপ পৃথিবী সাজাতে
আমাদেরও আছে অবদান
আমরা চাই অধিকার

তোমাদের আহ্বানে পৃথিবীতে
আমরা এলাম
স্বদেশের পতাকা হাতে তুলে নাও
বলে দাও কী আমার নাম
মুক্ত কণ্ঠে যেন বলতে পারি
আমি তোমাদের সন্তান
আমরা চাই অধিকার

এই অধিকারের ধারণাটি নতুন। শিশুর প্রতি যে স্বাভাবিক মায়া, মমতা, স্নেহ রয়েছে তা থেকে এই অধিকার স্বতন্ত্র। এই অধিকার কথাটির মাঝে মিশে রয়েছে নতুন এক মাত্রা। শিশুর এই অধিকার হচ্ছে জন্মগত। এই অধিকার শুধুমাত্র তার লালন-পালনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিশুর সৃজনশীল বিকাশের জন্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিশুকে শুধু স্নেহশীল পরিচর্যা করলেই চলবে না। তাকে পরিবেশ ও বয়সের সাথে সংগতি রেখে তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাজ এগিয়ে চলেছে নানা বিবর্তনের পথ ধরে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় হয়েছে ধারাবাহিক চর্চা। শিশু অধিকারের ধারণা এই ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে। অপুষ্টি হচ্ছে শিশুদের জন্য এক মারাত্মক সমস্যা। এর ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত

হয়। শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থার কথা, এখন গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। শিশুর গঠনের জন্য সুস্থ ও মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। এই ধরনের পরিবেশে শিশুরা সবল মানসিকতায় গড়ে ওঠে। এই সবলভাবে বেড়ে ওঠার জন্যে সুষম খাবার ও পরিচর্যা একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রকৃত শিশু গড়ে তুলতে হলে শিশুর শারীরিক গঠনের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সমাজে সৃষ্টি করতে হবে সচেতনতা। শিশুরা যাতে বৈষম্য, নিপীড়ন আর নিষ্পেষণের শিকার কোনো অবস্থাতেই না হয়।

ইতিহাস

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে বহু শিশু তাদের পিতামাতাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে যায়। এই অনাথ শিশুরা তখন সমাজে পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য হল। এদের রক্ষা করার কোনো ধরনের ব্যবস্থা তখন ছিল না। এই বিশাল সংখ্যার শিশুরা খুব সহজেই অবহেলিত হল। সমাজ তাদের দেখল করুণার চোখে। তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের পক্ষে তখন কোনো সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে অনাথ শিশুরা সহজেই অবহেলা আর অনাদরের শিকার হল। তাদের বেঁচে থাকাটাই তখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। সমাজ-নেতারা চিন্তিত হলেন এই বিশাল সমস্যার কথা ভেবে। এ যেন এক ভয়াবহ সামাজিক দুর্যোগ হয়ে দেখা দিল। শিশুদের প্রতি যে বিশেষ যত্ন আর পরিচর্যায় প্রয়োজন রয়েছে এ বক্তব্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রথম স্বীকৃতি পেল ১৯২৪ সালে। লীগ অব নেনশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪২ সালে জেনেভা অধিবেশনে প্রথম শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়, মানবজাতির সবচাইতে ভালো যা কিছু দেয়ার রয়েছে শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য। যেহেতু শিশু দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে অপরিপূর্ণ তাই তাকে বিশেষভাবে যত্ন করার ও রক্ষার করার প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি আইনগতভাবে এবং তা শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার আগে থাকতেই। জেনেভা ঘোষণাই হচ্ছে শিশুদের রক্ষা করার সবচাইতে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবার পৃথিবীতে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য শিশু। আবার অনাথ হয়ে পড়ে প্রচুর সংখ্যক শিশু। নতুন করে সামাজিক শৃঙ্খলা ভাঙার আশঙ্কা করেন সমাজপতিরা। আবার জাতিপুঞ্জের শীর্ষ নেতারা এই সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসেন। বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের করুণ অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১৯৪৪ সালে জাতিপুঞ্জ শিশু অধিকারের এক ঘোষণা দেয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'।

এই ঘোষণাপত্রের দুটো ধারা ছিল শিশু অধিকার নিয়ে।

১৯৫২ সালে সিদ্ধান্ত নেয়া হল বছরের একটি দিনকে বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে শিশুদের প্রতি বিশ্ববিবেক জাগ্রত করা। অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার হবে এই বিশেষ দিন। ১৯৫৩ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব শিশু দিবস। পৃথিবীর ৪০টি দেশ

সেই দিনটি সে বছর অত্যন্ত উৎসাহ আর গুরুত্বের সাথে পালন করে। তারপর থেকে প্রতি বছর বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপিত হচ্ছে। ইউনিসেফ এবং আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রতিটি দেশে এই দিবস পালিত হয়।

১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে শিশুদের ১০টি অধিকার গৃহীত ছিল। এটি ছিল পৃথিবীর শিশুকল্যাণের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। এই অধিকারগুলো হল:-

(১) জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম অথবা জাতীয়তা নির্বিশেষে শিশুরা এই অধিকার ভোগ করবে।

(২) স্বাধীন, মুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশে শিশু বিশেষ নিরাপত্তা ও অবাধ সুযোগ ভোগ করবে।

(৩) শিশুর একটি নাম ও জাতীয়তা থাকবে।

(৪) প্রচুর পুষ্টি, আবাসিক সুবিধা, বিনোদন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সামাজিক সুবিধা।

(৫) পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শুশ্রুষা, শিক্ষা ও পরিচর্যা। সমঝোতা এবং নিরাপত্তার স্নেহময় পরিবেশে শিশু থাকবে।

(৭) স্থানীয় সত্তা বিকাশে সমান সুযোগ এবং বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) শিশু দুর্যোগের সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপত্তা ও ত্রাণ পাবে।

(৯) অবজ্ঞা, নিষ্ঠুরতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দিতে হবে।

(১০) বর্ণ, ধর্ম অন্য যে কোনো ধরনের বৈষম্য থেকে নিরাপত্তা এবং শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিবেশে শিশুকে গড়ে তোলা।

এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৯ সালে ঘোষিত হল শিশু দশক। উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের দুর্দশাকে জরুরি ভিত্তিতে মোকাবিলা করার জন্য ৬টি ঘোষণা করা হয়:

(১) শিশুদের মারাত্মক রকমের পুষ্টিহীনতা নির্মূল করা এবং খাদ্য সহায়তার কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ পুষ্টির মাত্রা আরো কমিয়ে আনা।

(২) উন্নয়নগামী বিশ্বে প্রতি হাজারে ১১৩টি শিশুর বর্তমান মৃত্যুর হার অন্তত ৫০ ভাগে কমিয়ে আনতে হবে।

(৩) উন্নয়নশীল বিশ্বে বর্তমানে বিদ্যমান সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল ৫৬ থেকে ৬৫ বছরে উন্নীত করা।

(৪) সাধারণ রোগগুলো প্রতিরোধের উদ্দেশে সব শিশুর জন্য টিকা দানের ব্যবস্থা করা।

(৫) শিশু এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(৬) সব শিশু ও তার পরিবারের জন্য মানবেতর থেকে নিম্নমানের হলেও বাসগৃহের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ ১৯৮৬ সালে শিশু অধিকার কনভেনশনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত খসড়া কনভেনশন গৃহীত হয়।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বা কোনো দুর্যোগের সময়ে শিশুদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ওই বছর বাংলাদেশ শিশু আইন জারি করা হয়।

১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেয়া হল শিশুদের বিচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নির্ধারিত ন্যূনতম নিয়ম মানতে হবে।

১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ অধিবেশনে জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে কোনো শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব কাউকে দেবার ক্ষেত্রে সামাজিক ও আইনগত নীতি ঘোষিত হল। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হল জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ।

১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশসহ ২০টি দেশ এই সনদটি পুনঃসমর্থন করে। ১০৫টি দেশ স্বাক্ষর করে সনদটিতে। ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর এই সনদের ৫৪টি অধিকারকে স্বীকার ও সংরক্ষণের আইনগত পটভূমি তৈরি হয়।

১৯৯০ সালের ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় শিশু বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন। এতে ৭২টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় শিশুদের কল্যাণের ব্যাপারটিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো শিশুর স্বার্থে ৭টি প্রধান বিষয় নির্ধারণ করে।

১. ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।
২. মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।
৩. ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।
৪. সকলের জন্য নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় সুযোগ নিশ্চিত করা।
৫. সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বাড়ানো।
৬. বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার কমিয়ে আনা।
৭. বিশেষ দুর্দশায় নিপতিত শিশুদের সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা।

শিশু অধিকার সপ্তাহ

শিশুদের অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে বাংলাদেশে প্রতি বছর শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়। এতে শিশু জন্মনিবন্ধীকরণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এটি হচ্ছে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকার।

শিশু অধিকার সপ্তাহের মূল ব্যাপারটি ছিল জনসচেতনতা সৃষ্টি। এর একটি প্রধান দিক ছিল শিশুদের কথা শুনুন।

* শিশুদের কাছ থেকে সমস্যা সম্পর্কে জানার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানান।
* শিশুরা নিজেদের জন্য কী করা প্রয়োজন বলে মনে করে তা নির্ণয় করুন।

* শিশুদের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সময় তাদের মতামত বিবেচনা করুন।

বাংলাদেশের শিশু পরিস্থিতির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সাফল্যের কথা। পৃথিবীর দেশগুলোর অগ্রগতি এখন তাদের সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তির বিচারে গণ্য করা হচ্ছে না। রাজধানী নগরীর বিশাল ভবনসমূহের মাপকাঠিতে বিচার করা হচ্ছে না। বরং সেই দেশের জনগণের কল্যাণের মাপকাঠিতে বিচার করা হচ্ছে। জনগণ কতটা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষার অধিকার গ্রহণ করছে তার ভিত্তিতে। দুস্থ ও সুযোগবঞ্চিত মানুষদের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে। দেশের অগ্রগতির কথা ভাবা হচ্ছে সেই দেশের শিশুদের শরীর ও মনের বিকাশের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার ভিত্তিতে।

১৯৯০ সালের বিশ্ব শিশু সম্মেলনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। এই অগ্রগতি দ্রুতগতিতে হয়েছে। কারণ এই দেশগুলো শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছে। দেশসমূহ এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে যে প্রতিটি শিশুরই রয়েছে সব ধরনের মৌলিক অধিকার লাভ করার যোগ্যতা। শিশুর জন্মের পর নিবন্ধন ঠিকমতো না হওয়ার ফলে প্রচুর শিশু এ ধরনের অধিকার থেকে বাদ পড়ে। শিশুদের টিকা দানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগগতি সাধিত হয়েছে।

১৯৭৪ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। আমাদের দেশে যত শিশু মৃত্যুবরণ করে তার প্রায় ৩ ভাগের ১ ভাগ মারা যায় ৬টি সংক্রামক রোগে। এগুলোকে সহজে প্রতিরোধ করা যায়। ঠিক সময়ে প্রতিষেধক টিকা না দেয়ার জন্যে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৬টি রোগে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় আড়াই লাখ শিশু মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ে। যে ৬টি মারাত্মক রোগ শিশুদের মৃত্যুর কবলে নিয়ে যেত সেগুলো হল ধনুষ্টংকার, হাম, যক্ষ্মা, হুপিংকাশি, পোলিও, ডিপথেরিয়া। এখন ইপিআই কর্মসূচিতে রোগ প্রতিষেধক ইনজেকশন দিয়ে অথবা কয়েক ফোঁটা ভ্যাকসিন খাইয়ে একটি শিশুকে এই ৬টি মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হচ্ছে।

ইপিআই কর্মসূচির পাশাপাশি পালিত হয়েছে ভিটামিন 'এ' সপ্তাহ। ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতির জন্য শিশুদের চোখে অসুবিধা দেখা দেয়। এই সমস্যার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শিশুরা ভোরের বেলায় বা সন্ধ্যায় অল্প আলোতে ভালোভাবে দেখতে পায় না। এতে চোখের কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

৬ মাসের বেশি বয়সের শিশুকে বছরে ৩ বার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে এই কর্মসূচিতে। শিশুর রোজকার খাবারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অল্প পরিমাণ সবজি শাক, মিষ্টি কুমড়া, হলুদ ফল।

শিশুদের রোগ, ব্যাধি, অন্ধত্ব কমানোর ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলের ব্যবহার একটি সাফল্য অর্জনকারী পদক্ষেপ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই উন্নীত হয়েছে। প্রায় সমানসংখ্যক ছেলে ও মেয়ে এখন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি শিশুরই রয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা লাভের অধিকার। এতে থাকবে একটি নীতিমালা। যে নীতিমালাটি তৈরি হবে শিক্ষাদানে শিশু কেন্দ্রিক উদ্যোগকে নিয়ে। শিশুদের এমনভাবে প্রস্তুত করা হবে যাতে তারা একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবন যাপন করতে পারে।

১. সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
২. মেয়ে শিশুর শিক্ষার জন্য ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত শিশুদের জন্য উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৪. স্কুলত্যাগী শিশুদের, বিশেষত ভর্তি না হতে পারা মেয়েশিশুদের শিক্ষালাভের সুযোগ দেয়ার জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহের (মাদ্রাসা) উপযুক্ত ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
৫. শৈশবের শুরুতেই শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন/শিক্ষাদান এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন ও জোরালো প্রচারণা চালানো।
৬. শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধি ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রণীত সিলেবাসে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা।
৭. সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে শিশুদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপযুক্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে শিক্ষানবিশ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করা।
৮. শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক শিশুসাহিত্য, ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই বিনামূল্যে/হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য উপযোগী বইপুস্তক প্রকাশনা এবং বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া।
৯. সরকারি/আধা সরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থ শিশুদের জন্য সহজলভ্য করা।

শিশুশ্রম সম্পর্কে অনেক সমাধান খুঁজে বের করা হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প থেকে পর্যায়ক্রমে শিশুদের প্রত্যাহার এ ধরনের একটি কর্মসূচি। তাদের জন্যে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শ্রমজীবী শিশুদের জন্য যদি উপযুক্ত চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা করা যায় তবে তা তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

যেমন:

পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ভালো ধারণা জন্মাবে।

আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
ভালো করে কথা বলতে পারবে।
চিন্তায় যুক্তির ব্যবহার বাড়বে।
হিসাব করতে পারবে।
চিঠি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সহজ ভাষায় লিখতে পারবে।
সঞ্চয়ের ইচ্ছা জন্মাবে।
দেশে প্রচলিত সাধারণ আইন-কানুন বিষয়ে জানবে।
সাইনবোর্ড পড়তে পারবে।
ছোটখাট নির্দেশনা পড়তে পারবে।
নিজের আনন্দের জন্য সহজ বইপত্র পড়তে পারবে।
পরিষ্কার থাকবে।
নিজের আশপাশকে পরিষ্কার রাখার ইচ্ছা জন্মাবে।
ছোট পরিবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবে।
বিয়ের আইন সম্পর্কে জানবে।

শিশুদের অধিকারসমূহকে ভাগ করা হয়েছে চারটি গুচ্ছে।

বেঁচে থাকার অধিকার: এতে রয়েছে জীবনধারণের জন্য মৌলিক অধিকার। স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

বিকাশের অধিকার : শিক্ষার অধিকার। গড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত এক জীবনমানের অধিকার অবকাশ যাপন, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার।

সুরক্ষার অধিকার : উদ্বাস্তু শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু এবং নির্যাতন, শোষণের শিকার শিশু, অবহেলার শিকার যেসব শিশু তাদের রক্ষা করার অধিকার।

অংশগ্রহণের অধিকার : শিশুদের কথা শোনার অধিকার, তথ্য ও ধারণা চাওয়া পাওয়ার ও প্রদানের অধিকার।

পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রাণহানি ঘটে প্রায় ৫ কোটি মানুষের। এর মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগই হচ্ছে কমবয়সী শিশু। এর প্রায় অর্ধেক হচ্ছে ৫ বছরের কমবয়সী শিশু। পৃথিবীর বার্ষিক মোট মৃত্যুর বেশিরভাগই ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার গরিব দেশগুলোতে। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু প্রাণ হারায় ৬টি মারাত্মক রোগে। সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচির ফলে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করা সম্ভবপর হয়েছে। বাঁচানো সম্ভব হয়েছে শিশুদের। পোলিও রোগে বাংলাদেশের শিশুরা বেশি আক্রান্ত হত। এই মারাত্মক রোগ শিশুর জীবনকে পঙ্গুত্বের অভিশাপে দুর্বিষহ করে তোলে। স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার শিশুদের একটি

মৌলিক অধিকার। তাই পোলিও টিকা খাইয়ে এদেশের শিশুদেরকে সুস্থ জীবনের পথ দেখানো হচ্ছে।

পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ হচ্ছে এক অনুকরণীয় সাফল্যের নাম।

অন্তহীন সমস্যার শিকার শিশুরা। শিশুর অপুষ্টি হচ্ছে একটি প্রধান সমস্যা। অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।

আয়োডিন-স্বল্পতার জন্য শিশুদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক গঠন হয় না। আয়োডিনের অভাবে শিশু কম বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। একটি জরিপে দেখা গেছে, যে সব শিশু আয়োডিন-ঘাটতিতে ভোগে তাদেরকে স্বাভাবিক দেখালেও তার বুদ্ধিমত্তা কম থাকে। এর ফলে তারা স্কুলে পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে পারে না। এ জন্য শিশুদের আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ানোর জন্য ব্যাপক প্রচারণা করা হচ্ছে।

অপুষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয় শিশুদের বেড়ে ওঠার বয়সে। এক পুষ্টিজরিপ থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশের ৬ থেকে ৭ বয়সী পল্লিশিশুদের ৫৭.৬ শতাংশ ধারাবাহিক অপুষ্টি ৮.১ শতাংশ মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত। এই দুটি সমস্যাই শহরের তুলনায় পল্লি অঞ্চলে মারাত্মক। উভয় সমস্যাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আরো বেশি আঘাত হানছে। এই মারাত্মক সমস্যা সমাধানের জন্য এখন নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশু অধিকারের মধ্যে একটি অন্যতম দিক হচ্ছে শিশুর বিকাশ। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের উপর নির্ভর করছে জাতির কল্যাণ। জন্মের পর থেকেই শিশুরা খুব দ্রুত শিখতে শুরু করে। ২ বছর বয়সের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্যে সবচাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে বড়দের ভালোবাসা। এই সাথে আরো প্রয়োজন বড়দের মনোযোগ। খেলাধুলাও শিশুর বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শিশুর দেহের এবং মনের অনুশীলন হয়।

অভিভাবকদের উচিত শিশুদের জন্য খেলাধুলার সুযোগ বাড়ানো। সহানুভূতি নিয়ে শিশুর আবেগের প্রতি সাড়া দিলে সে মানসিক ভারসাম্য নিয়ে বেড়ে উঠবে। ধৈর্য সহকারে শিশুর অনুভূতির প্রতি সাড়া দিলে তার আচরণ সুন্দর হবে। শিশু চায় সম্মতি। স্বীকৃতি। উৎসাহ। এগুলো পেলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে। শারীরিক নির্যাতন শিশুর বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, জন্মের পর থেকেই শিশুকে স্পর্শ করা দরকার। কোলে বা বুকে নেয়া দরকার এবং আদর-সোহাগ করা দরকার। সে পরিচিত মুখ ও মুখের অভিব্যক্তি দেখতে চায়। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে চায়। সে চায় অন্যেরা তার প্রতি সাড়া দিক। এছাড়া শিশু নতুন নতুন ও আকর্ষণীয় বস্তু দেখতে, ধরতে এবং তা নিয়ে খেলা করতে চায়। সে নতুন নতুন শব্দও শুনতে চায়। শেখার শুরু এখান থেকেই। মানুষের কণ্ঠস্বর হল শিশুর শোনার জন্য সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি। মানুষের মুখ শিশুর দেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। শিশুকে দীর্ঘক্ষণ একা একা থাকতে দেয়া উচিত নয়।

শিশুর মনের সুস্থ বিকাশের জন্য দরকার পর্যাপ্ত :

* ভালোবাসা ও মনোযোগ।
* খেলার সুযোগ।
* পুষ্টি।
* সেবাযত্ন ও পরিচর্যা।

বুকের দুধ খাওয়ার সময় শিশু ও মায়ের পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা শিশুর মানসিক তৃপ্তির জন্য খুব প্রয়োজন।

শিশুর বিকাশের প্রথম শর্ত হচ্ছে শিক্ষা। পিতামাতা হচ্ছে শিশুর সেরা শিক্ষক। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। শিশুর মানসজগতে পৌঁছে দিতে হবে বার্তা। জানাতে হবে সে-ও হচ্ছে বন্ধু। অনেক রাষ্ট্র এখন শিশুদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছে। শিশুর জন্য প্রণীত আইনে বলা হয়েছে, অহেতুকভাবে শিশুকে প্রহার করা যাবে না। শিশুর সাথে এমন আচরণ করা যাবে না যাতে তার মনের জগতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন

১. বাদ যাবে না কোনো শিশু

প্রতিটি শিশুই জন্মায় সমান স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। অথচ বর্ণ, লিঙ্গ বা পারিবারিক পরিচয়ের দরুণ অনেক শিশুকে শিকার হতে হয় বৈষম্যের। এ বৈষম্য হতে পারে অবহেলা, ঘৃণা এমনকি সহিংসতা রূপে। অনেক মেয়েশিশু স্কুলে তার ছেলে সহপাঠীর সমান সুযোগ পায় না। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে অনেককে এমনকি স্কুলেই পাঠানো হয় না। কোনো প্রতিবন্ধী শিশু যখন স্বাভাবিক শিশুর সমান সুযোগ পায় না তখন সেটা বৈষম্য। এ ধরনের বিভাজনের অবসান প্রয়োজন। প্রতিটি শিশুর জন্য চাই সমান সুযোগ।

২. সবার আগে শিশু

১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বাক্ষরিত শিশু অধিকার সনদ অনুসারে প্রতিটি সরকারকে শিশুদের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে। এছাড়া শিশুদেরও নিজের ও অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

৩. সকল শিশুর জন্য চাই আদরযত্ন

শিশুর জন্য টিকা দান, পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানি পয়ঃনিষ্কাশনের পর্যাপ্ত সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বজুড়ে শিশু স্বাস্থ্যসেবা বাড়লেও এখনো প্রতি বছর ১ কোটি ১০ লাখ অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মারা যায় প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধিতে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেলেও অনুর্ধ্ব এক মাস বয়সী শিশুদের জন্য কার্যত কিছুই করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে।

৪. এইচআইভি/ এইড্স প্রতিরোধ করুন

শিশু ও তার পরিবারকে এইচআইভি/এইড্স থেকে রক্ষা করতে হবে। এই ঘাতকব্যাধি শিশুদের বঞ্চিত করে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে। এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইড্স এ পর্যন্ত ১ কোটি ৩০ লাখ শিশুকে অনাথ করেছে। এইড্স হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রচলিত পরিবার ব্যবস্থার জন্যে। ব্যাধিটি প্রতিরোধে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশুদেরও সচেতন করে তুলতে হবে।

৫. শিশু নির্যাতন আর শোষণ বন্ধ করুন

নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার শিশুর জন্মগত। অথচ বিশ্বজুড়ে আড়াই কোটি শিশুকে স্কুলে না পাঠিয়ে নিয়োজিত করা হয় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে। তাদের বিক্রি করা হয়, ভাড়া দেয়া হয়। শিশুদের প্রতি এসব অমানবিক আচরণ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

৬. শিশুর কথা শুনতে হবে

শিশু অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে আমাদের। শিশুদের প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিশ্চিত করতে হবে তাদের অংশগ্রহণ। কারণ শিশুরাই তাদের চাহিদাগুলো বড়দের চেয়ে ভালো বোঝে। এমন অনেক বিষয় আছে যা শিশুরাই ভালো বলতে পারে, যা বড়রা ভুলে গেছে বা আদৌ জানেই না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এই শিশুরাই হচ্ছে ভবিষ্যতের কর্ণধার।

৭. প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষা

জানার আগ্রহ শিশুদের মজ্জাগত। শিক্ষা তাদের জন্মগত অধিকারই শুধু নয় এটি তাদের দায়িত্বও। অথচ বিশ্বে ১ কোটি দশ লাখেরও বেশি শিশু, যাদের অধিকাংশই মেয়ে, স্কুলে যায় না। আবার এর চেয়েও বেশিসংখ্যক শিশুকে দেওয়া হয় নিম্নমানের শিক্ষা। সব শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. যুদ্ধ থেকে শিশুদের রক্ষা করুন

কোনো শিশুই কখনো যুদ্ধ শুরু করেনি অথচ যুদ্ধে এরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক শিশুকে জোর করে অস্ত্র ধরতে বাধ্য করা হয়। বর্তমান বিশ্বে ৩ লাখেরও বেশি শিশু সংঘর্ষের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত রয়েছে। যুদ্ধ থেকে শিশুদের রক্ষা করতে হবে।

৯. শিশুর স্বার্থে পৃথিবীকে বাঁচান

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশকে বাসোপযোগী রাখতে হবে। এ পৃথিবী শিশুদেরই, আমরা রক্ষক মাত্র। বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে চলছে পানিসংকট-এর কুফল ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে শিশুদেরই।

১০. দারিদ্র্য বিমোচনে শিশুর জন্য বিনিয়োগ

দারিদ্র্যের ভয়াবহতা শিশুদেরই স্পর্শ করে, তাই অভিযানটা শুরু করতে হবে এখন থেকেই। শিশু ও তার পরিবারের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক শিক্ষার মতো সামাজিক সেবাখাতগুলোর বিনিয়োগ করতে হবে। বৈদেশিক ঋণ বা ত্রাণ কর্মসূচি উন্নয়ন সহায়তা ও সরকারি অর্থব্যয়ে শিশুকল্যাণের দিকটিরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

[লেখক: শিশু-কিশোর সাহিত্যিক। শিশু-কিশোর সাহিত্যের বহুসংখ্যক গ্রন্থের লেখক। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। প্রাক্তন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ টেলিভিশন।]

বাংলাদেশের শিশু ও শিশুদের আইনি অধিকার

জ্যোতির্ময় বড়ুয়া

প্রায় ৭ কোটি শিশুর বাস বাংলাদেশে। এদেশের সংবিধান দেশের নাগরিক হিসেবে শিশুর অধিকার যেমন দিয়েছে তেমনি বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের ১৯৫৯ সনের শিশু অধিকারের যে সনদ রয়েছে সেটির অনুসমর্থন দিয়েছে ১৯৯০ ইং সনে। আন্তর্জাতিক সনদের পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ শিশুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ২৮(৪) নং অনুচ্ছেদে নারী, শিশুসহ সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্যে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে বিশেষ বিধান করার ক্ষমতা দিয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৮২ নং ধারায় বলা আছে—৯ বছরের নিচে কোনো শিশুর কোনো কর্মকাণ্ড অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না। একই আইনের ৮৩ নং ধারায় ৯ বছরের উপরে কিন্তু ১২ বছরের নিচে এমন কোনো শিশু যার কোনো ঘটনা ও তার ফলাফল সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের বোধ তৈরি হয়নি তেমন শিশুর কোনো কর্মকা- আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না মর্মে উল্লেখ আছে। ১৯৭৪ সনে শিশুদের অধিকার বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ বিধান করার উদ্দেশ্যে প্রথম শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। সম্প্রতি জাতিসংঘের শিশু সনদের বিধানগুলো দেশীয় আইনে সংযোজন করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সনে প্রণীত হয়েছে নতুন শিশু আইন, যা ২১ আগস্ট ২০১৩ থেকে কার্যকর হয়েছে। এই আইনের ৪নং ধারায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু হিসেবে গণ্য করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও এই আইনে কোনো শিশু আইনের সংস্পর্শে আসলে তার অধিকার রক্ষার জন্যে "প্রবেশন অফিসার" নিয়োগের নতুন বিধান সংযোজন করেছে, যা আগের আইনে ছিল না। এছাড়া, জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা, শিশু বিষয়ক স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর ক্ষেত্রে একত্রে অভিযোগপত্র দেয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ, বিচারের জন্যে শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করাসহ বিবিধ নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে যা শিশুদের বিচারসংশ্লিষ্ট আইনি জটিলতা কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারে বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু এতসব বিশেষ বিশেষ আইন থাকা সত্ত্বেও শিশুদের প্রতি অত্যাচার, নিপীড়ন, শিশুপাচার, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ যেমন রোধ করা যায়নি বরং প্রতি বছর বাড়ছে, তেমনি শিশুদের শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান এসবও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

কোনো সমাজেই কেবল আইন দিয়ে সমাজের কোনো নির্দিষ্ট অংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা সম্ভব নয়। তারপরও অনেক আইনের ভিড়ে শিশুদের সুরক্ষার জন্যে আমাদের কোনো আইন

নেই। এধরনের সুরক্ষা আইন শিশুদের প্রতি হওয়া ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারত। বিশ্বের অনেক দেশেই শিশুদের সুরক্ষার জন্যে আলাদা আইন রয়েছে। যেমন, যুক্তরাজ্যে শিশুদের সুরক্ষার জন্যে Safeguarding Vulnerable Groups Act, 2006 নামের নতুন আইন হয়েছে।

বাংলাদেশী শিশুদের বর্তমান অবস্থা:

সামগ্রিক বিবেচনায় পূর্বের তুলনায় শিশু মৃত্যুহার কমেছে কিন্তু শিশুদের অবস্থায় তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যে কথা বলা হচ্ছে তা এখনো সুদূরপরাহত।

১. শিশুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান:

বলা হয়ে থাকে দারিদ্র্যের কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু এটি বলার পাশাপাশি আমাদের দেখা দরকার আসলেই সরকারের তরফ থেকে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিনা। আমাদের সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদ নারী, শিশু ও সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করাও দায়িত্ব দিয়েছে রাষ্ট্রকে। তাই রাষ্ট্র শিশুদের জন্যে বিশেষ বিধান করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আইনি বাধা নেই বরং সেটি করার জন্যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উপরোক্ত আইনি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও শিশুস্বাস্থ্য বিভিন্ন কারণে ঝুঁকির মধ্যে থাকে, যেমন দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলোতে শিশুদের পর্যাপ্ত খাদ্য যোগান দিতে ব্যর্থতার পাশাপাশি বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পানিবাহিত রোগের কারণে শিশুস্বাস্থ্য বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এখনো ঝুঁকির মুখে থাকে। কেবলমাত্র বাসস্থানের নিশ্চয়তা না থাকার কারণে প্রতিবছর ভাসমান শিশুর সংখ্যা বাড়ছে।

দেশে মোট ভাসমান শিশুর সংখ্যা কত তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী মোট চার লক্ষ ভাসমান শিশুর হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী শিশুর সংখ্যা দশ লাখেরও বেশি হবে। এসব ভাসমান শিশুদের নিয়ে সরকারের কোনো স্থায়ী পুনর্বাসন পরিকল্পনা দেখা যায়নি। কিছু সংগঠন ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ করলেও তাদের শক্তিসামর্থ্য সীমিত হওয়ার কারণে এখনো অবধি স্থায়ী কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। তাই এক্ষত্রে সরকারি উদ্যেগ নেয়া জরুরি।

২. শিশু নির্যাতন:

বিগত কয়েক বছরে শিশু নির্যাতনের হার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে এবং এই নির্যাতনের ধরন আগের চেয়েও নৃশংস এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র নামের একটি বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটি

প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে বিগত বছরে নির্যাতনের ফলে মোট ৪৬৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এসব শিশুদের মধ্যে ১২৪ জনের বয়স ছিল ৬ বছর কিংবা তার নিচে এবং ১৩৩ জনের বয়স ছিল ৭-১২ বছরের মধ্যে। তাছাড়া ১৩-১৮ বছর বয়সসীমার মধ্যে ছিল মোট ১৮৬ জন শিশু, বাকিদের বয়স জানা যায়নি। এই পরিসংখ্যান বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর তৈরি বিধায় এটি প্রায়শই সত্যিকারের ঘটনার চেয়ে কম হয়, কারণ এমন অসংখ্য ঘটনা সারা দেশে ঘটে যা পত্রিকার পাতায় খবর হয় না এবং বিচারের দরজা পর্যন্ত যেতে পারে না। যদি শুধু গত বছরে ঘটা শিশু নির্যাতনের ধরন বিবেচনায় নিই তাহলে দেখা যাবে এর মধ্যে ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন বিশেষত গৃহকর্মীদের, অপহরণের পর হত্যা, শিক্ষক দ্বারা শারীরিক নির্যাতন অন্যতম। ২০১৫ সালে সিলেটে রাজন হত্যা, দ্রুত বিচারে প্রধান আসামি কামরুলসহ চারজন আসামির মৃত্যুদ-ের রায় হওয়ার পর অনেকেরই ধারণা ছিল শিশুর উপর নির্যাতন কমে আসবে, কিন্তু সেরকমটি দেখা যায়নি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন থেকে শিশু নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা নির্যাতন কমার সাক্ষ্য বহন করে না। তাছাড়া, ২০১৫ সালের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের ২৪ জুলাই একটি এবং পরবর্তীতে ১৪ ডিসেম্বর অপর একটি শিশুকে পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়। গৃহকর্মীদের উপর নৃশংস নির্যাতনের কারণে অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে আইনের মুখোমুখি হতে দেখা গেছে।

৩. বাল্যবিবাহঃ

বাল্যবিবাহ রোধকল্পে ১৯২৯ (সংশোধিত ১৯৮৪) সালে যে আইন রয়েছে তা পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাযুজ্য রেখে নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে ২০১৩ সনে সরকার এর একটি খসড়া প্রকাশ করে। সেই খসড়ায় শিশুর বয়স কমিয়ে ১৬ বছর করার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে ওঠার কারণে সরকার সেই আইন পাস করা থেকে বিরত থাকে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে সরকার সেই খসড়ায় কিছুটা পরিবর্তন আনে যা ২৪ নভেম্বর তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে। এই আইনে "বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহের বয়স শিথিল করার বিধান" রাখা হয়েছে যা নিয়ে সাধারণের মহলে বেশ সমালোচনা চলছে। বিদ্যমান আইনে শিশুর বয়স ১৮ বছর থাকা সত্ত্বেও যেখানে আমাদের শিশুবিবাহের হার ৬৬ শতাংশেরও বেশি সেখানে এই ধরনের একটি সুযোগ নতুন করে সৃষ্টি করে দেওয়া হলে বাল্যবিবাহের হার আশঙ্কাজনক হারে বাড়বে বলে সহজেই অনুমান করা যায়।

৪. শিশুশ্রমঃ

আন্তর্জাতিক আইন ও সনদগুলোতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হলেও আমাদের দেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করে কোনো আইন নেই। শ্রম আইনে কেবল কতিপয় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ না দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান শ্রমবাজারের, বিশেষত অনিয়মিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশই মূলত শিশু। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে কিংবা পারিবারিক নানা বিরূপ পরিস্থিতির কারণে শিশুদের অনেকেই বাধ্য হয় নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শ্রম দিতে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করার অঙ্গীকার থাকলেও তা মূলত কাগুজে পর্যায়ে রয়ে গেছে। শিশুদের আমরা যেমন দেখছি বিড়ি কারখানায় তেমনি দেখছি পরিবহন খাত থেকে শুরু করে জাহাজভাঙার মতো শ্রমেও অবাধে কাজ করছে। শ্রম আইন এক্ষেত্রে কার্যত কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

৫. শিশুপাচার:

শিশুদের উপর নির্যাতনের পাশাপাশি অপর এক ভয়াবহ সমস্যা হল পাচার। এটি একটি সংগঠিত অপরাধ। এক শ্রেণির অপরাধীরা শিশুদের কাজ পাইয়ে দেয়ার কথা বলে কিংবা অন্য কোনো প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসে এবং বিভিন্ন পতিতালয়ে বিক্রয়সহ নানান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখে। নারী ও শিশুপাচার রোধে শক্ত আইন থাকা সত্ত্বেও এই অপরাধ প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে কোনো অপরাধ রোধ করা যায় না, এর জন্যে চাই সমন্বিত উদ্যোগ। চাই সামাজিক সচেতনা ও সবার এগিয়ে আসা।

শিশুর অধিকার রক্ষার জন্যে কিছু কিছু আইনি বিধান করা হলেও আমাদের দেশে শিশুদের সুরক্ষার জন্যে এখনো পর্যন্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। কেবল অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আইন করলেই অধিকার বাস্তবায়ন করা যাবে না। যেহেতু শিশুরা সমাজের সংবেদনশীল ও অসহায় শ্রেণি, তাই তাদের অধিকার সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন থাকা প্রয়োজন। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৩২(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে, "শরিক রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে। শিশুর শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কিংবা তার স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর কাজ করানো না হয়, সে ব্যবস্থা নেবে।" বাংলাদেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র বিধায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় ইতিবাচক পদক্ষেপ গহণ করার। ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে যেমন, শিশুশিক্ষার হার বেড়েছে, শিশু মৃত্যুহার কমেছে, স্কুলে শারীরিক শাস্তি অবৈধ করা হয়েছে এবং শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু শিশুর জীবনযাপনকে সহজ ও যথাযথ করতে হলে দরকার শিশু সুরক্ষা আইন। যা তার কেবল অধিকার রক্ষা করবে না, তার জীবনবোধও তৈরি করবে।

[লেখক: গণমানুষের পক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্র-চিন্তক। আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।]

শিশু ও জাতির ভবিষ্যৎ এবং রাষ্ট্রের ভাবনা

আলমগীর খান

খুব আগের কথা নয়, বাংলাদেশে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দুই-ই ছিল অনুন্নত– ভালো রাস্তাঘাটও ছিল না, মোবাইল ফোনও ছিল না। স্কুল-কলেজ ছিল বেশ দূরে দূরে। শিশুদেরকে দুয়েক ঘণ্টার পথ হেঁটে স্কুলে যেতে হত। একইভাবে বাড়ি ফিরতে হত। খেলতে গেলেও তাই। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলেও একই। তার মানে বাড়ি থেকে বের হলে দীর্ঘক্ষণ খোঁজ পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তাই বলে বাবা-মা খুব একটা দুশ্চিন্তায় ভোগেননি যে তাদের ছেলেমেয়ে কোনো বিপদে পড়বে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবা-মা নিশ্চিন্ত থাকতেন। সন্ধ্যায়ও শিশু না ফিরলে কেবল তারা চিন্তায় পড়তেন।

কিন্তু এখন দেশের রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত। মোবাইল ফোনের ছড়াছড়ি। বাচ্চাদের হাতেও আধুনিকতম ফোন। অথচ শিশু স্কুলে যাওয়ার পর থেকে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত বাবা-মা'র চিন্তার

অন্ত থাকে না। আর ছেলেমেয়ে বাইরে যাওয়ার পর দশ মিনিট ফোন বন্ধ থাকলে বা নেটওয়ার্কের সমস্যা হলে মাথায় দুশ্চিন্তা চেপে বসে। মেয়েদের বেলায় দুশ্চিন্তা আরো ভয়ানক। শিশুকিশোরদের জন্য পথেঘাটে বিপদ ওঁত পেতে বসে আছে। মানুষই সবচেয়ে বড় বিপদ। একসময় বাংলাদেশে জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের অভাব ছিল না, অভাব ছিল না সেখানে বাঘ-ভাল্লুক-সাপের। এখন জঙ্গল তো গেছেই, পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনও যাই যাই করছে। বাঘ-ভাল্লুক চিড়িয়াখানায় ছাড়া দেখা পাওয়া ভার। কিন্তু ঝকঝকে তকতকে দিনের চেয়েও উজ্জ্বল আলোয় ঘোরাফেরা করছে যারা তারা মানবেতর ন্যাংটা প্রাণী নয়, জন্তুজানোয়ারের চেয়ে ইতর পোশাকি মানব। সবচেয়ে বেশি বিপদ নারী ও শিশুর। এ অবস্থা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

শিক্ষা যদি জাতির মেরুদ- হয় তবে শিশু জাতির হৃৎপি- ও মানবজাতির পিতা। কথাগুলো স্বীকার করে নেয়া হলেও গভীরভাবে ভেবে দেখা হয় না। আমাদের দেশে এখন শিশু ও শিক্ষা দুয়েরই বেহাল দশা। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন–সব হেন অপরাধ নেই ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে যার শিকার শিশুরা হচ্ছে না। এটি প্রায় সামাজিক ব্যাধির রূপ লাভ করেছে। কিন্তু এ ব্যাধি সারানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। আমাদের জাতির মেরুদ-কে

যেমন দিনে দিনে দুর্বল ও ভগ্ন করে তোলা হচ্ছে, আমাদের জাতির হৃৎপি-কেও তেমনি দুর্বল ও অকার্যকর করে তোলা হচ্ছে।

প্রথমেই শিশু কেন জাতির হৃৎপিণ্ড আর মানবজাতির পিতা সে কথায় আসি। এ প্রসঙ্গে আমার বন্ধু কিছুদিন আগে প্রয়াত ড. সাজেদুর রহমান চঞ্চলের অসাধারণ শিশুভাবনার একটা পরিচয় দেয়া যায়। সে ছিল এক নাটক-পাগল মানুষ। একসময় ঢাকায় টিএসসি-কেন্দ্রিক একটি নাট্যদল করত। তারপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক নিয়ে পড়াশুনা করে। পরে বাইরে থেকে নাটকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে অভিনয় ও নির্দেশনার জগতে ডুবে যায়। কিছুদিন টেলিভিশনে কাজ করে। সর্বশেষ ঢাকায় গ্রিন ইউনিভার্সিটির ফিল্ম, টেলিভিশন ও ডিজিটাল মিডিয়ার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একটু পিছনে ফিরে যাই।

২০০৮ সাল। কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত গ্রাম ঠুটা পাইকড়ে শিশুদের নিয়ে দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলা বিষয়ে সে একটা নাটক করেছিল। ছাত্রছাত্রী ঠুটা পাইকড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। স্কুলটি তিস্তার পারে অবস্থিত। নাটকের মূল ধারণা চঞ্চলের তৈরি। তবে সংলাপসহ কাহিনীর নানা অংশ গড়ে তোলে শিক্ষার্থীরা। তারা ছিল বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবারের যারা কেউ কেউ অভাবের কারণে না খেয়ে বা আধপেট খেয়ে স্কুলে আসত। নাটকের নাম 'সর্বনাশা তিস্তা'। চঞ্চল যে কতটা নাট্যপ্রেমিক ও কাজের প্রতি কত মনোযোগী ছিলেন তা বোঝাতে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, সেখানে থাকার ভালো জায়গা না পেয়ে তিনি রাতে একা ওই স্কুলে থাকতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে নাকি একটু ভয়ও করত। সেইসঙ্গে শিশুদের সঙ্গে মিশে যাবার যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল চঞ্চলের তা- বোঝা যাবে।

ক্লাসে শিক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই ওই শিশুদের হাত-পা কাঁপত। সম্ভবত তাদের কেউই কোনোদিন দেড় ঘণ্টার টেম্পু-রিক্সার রাস্তা পাড়ি দিয়ে কুড়িগ্রাম শহরে আসেনি। কোনোদিন মাইক্রোফোন ছুঁয়ে দেখেনি। চঞ্চল আমাকে বলেছেন, মহড়ার প্রথমদিকে এই শিশুরা অনেকে ভয়ে হাতটাও উঁচু করে কোমরের উপরে তুলতে পারত না। সংকোচে ছেলে ও মেয়ে পাশাপাশি বসতে পারত না। শুধু এটুকু হাসিল করতেই চঞ্চলকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। ওরকম ৩০ জন ছেলেমেয়ে ওই বছর ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় তাদের স্কুলের মাঠে হাজার তিনেক দর্শকের সামনে ও পরদিন কুড়িগ্রাম শহরে খলিলগঞ্জ স্কুলের প্রাঙ্গণে হাজার পাঁচেক দর্শকের সামনে নাটক করে দেখায়। শিশুদের কাছে এ অভিজ্ঞতাটি ছিল হিমালয়ের চূড়ায় উঠবার মতো। যারা সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষ তাদের পক্ষে এ সাফল্য পরিমাপ করা দুরূহ।

সে ঘটনায় শিশুদের মতো একজন হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার যে ক্ষমতা দেখেছিলাম তার, তা বিস্ময়কর। চঞ্চলের ব্যক্তিত্ব, নাটক ও শিশু একাকার হয়ে গিয়েছিল। ১৯ তারিখ সন্ধ্যার অনেক পরে নাটক ও দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পর আমি আর চঞ্চল ঢাকায় ফিরব। শিশুরা তাদের শিক্ষকের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবে। চঞ্চল যখন তার অল্পদিনের নাট্যশিক্ষার্থীদের বললেন, আমরা ঢাকায় ফিরে যাব– প্রত্যেকটি বাচ্চার চোখ অশ্রুসজল হয়ে

উঠল। চঞ্চলের নিজের কণ্ঠস্বরও কিছুটা কেঁপে উঠছিল। সে প্রত্যেক শিশুর জন্য চকলেট কিনে দিল। অনেকক্ষণ শিশুরা তাদের আবেগ চেপে ধরে রেখেছিল, আর পারল না। হু-হু করে কেঁদে উঠল কেউ কেউ। এ বাঁধভাঙা আবেগ ছড়িয়ে পড়ে অন্য শিশুদের মাঝে। আরো অনেকে কেঁদে ফেলল। মনে হয়, প্রত্যেক শিশুর চোখে তখন পানি।

আমার আবেগাক্রান্ত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল না। তবু কেমন যেন কাতর হয়ে উঠলাম। মনে হচ্ছিল, এই শিশুদের জীবনের প্রিয়তম মানুষটি অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। যে মানুষটি তাদের অনেককে শুধু কোমরের উপর হাত তোলা শেখায়নি, হাজার হাজার দর্শকের সামনে অভিনয় করা শিখিয়েছে। নাটকের মহড়ায় এসে তারা কয়েকদিন দুপুরে পেট ভরে খেতে পেয়েছে। তারা জীবনে প্রথম শহরে এসেছে। আর কোনোদিন এমন স্বপ্নরাজ্যের দেখা পাবে কিনা তারা জানে না। চঞ্চল অবশ্য তাদেরকে বারবার আশ্বস্ত করছিলেন, তিনি আবার আসতে চেষ্টা করবেন। আর তাদেরকে তিনি ঢাকার অনুষ্ঠানে নিয়ে নাটক করাবেন। অনিশ্চিত অবস্থায়ই তিনি এ কথাগুলো বলছিলেন। শিশুরা কেউ তাকে বিশ্বাস করেছিল কিনা জানি না। তবে ওই শিশুরা আর কোনোদিন তাকে পায়নি। পাবেও না। চঞ্চল এখন অনেক দূরে– আকাশজগতে। সেদিনের সেই শিশুরা আজ নিশ্চয়ই যুবক-যুবতী। তারা কেউ যদি এই লেখাটি পড়ো, তবে আরেকবার কেঁদে নাও।

এরপর চঞ্চলের সঙ্গে আমার কালেভদ্রে যোগাযোগ হত। একদিন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে দেখা। নিয়ে গেল যেখানে সে শিশুদের নাট্যচর্চা করাত। সে নিজেও ছিল শিশুর মতো সরল, তেমনি শিশুদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অপূর্ব ক্ষমতা। ঢাকায় গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে যোগদানের পর ফিল্ম, টেলিভিশন ও ডিজিটাল মিডিয়া বিভাগের প্রধান হয়ে একদিন সে ফোন করে। আসতে বলে, অনেক কথা আছে। গণমাধ্যমের নানাকিছু নিয়ে তার অনেক পরিকল্পনা থাকত যা বাস্তবায়ন করা দুরূহ। এসব নিয়ে তার আলোচনায় উৎসাহের ভাটা ছিল না কখনো। সেখানে গিয়ে দেখা হলে সে আমাকে শিশু ও সভ্যতা নিয়ে তার একটি গদ্যের কথা বলে। আমি উৎসাহ দেখালে সে আমাকে এটি ই-মেইলে পাঠায়। যা আমি আমাদের সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকে (জুলাই ২০১৪) ছাপি। লেখাটি মূলত ইতালীয় শিক্ষাবিদ মারিয়া মন্তেসরি'র শিশুভাবনা নিয়ে রচিত। লেখাটি থেকে কয়েকটি অপূর্ব অংশ উদ্ধৃত করব।

শুরুতেই আছে ড. মারিয়া মন্তেসরি'র 'আপনার শিশু সম্পর্কে আপনার যা জানা উচিত' (জ্ঞান প্রকাশম, অনুবাদ- অসিতবরণ ঘোষ) বই থেকে: "মানুষের ভোগ্যবস্তুগুলোই যদি শ্রমিক উৎপাদন করে এবং সে যদি সকল বাহ্য বস্তুর নির্মাতা হয়, তাহলে তো শিশু খোদ মানবজাতিকেই উৎপাদন করে, আর এ কারণেই সমাজ রূপান্তরের প্রশ্নে তার অধিকার প্রবলতর।" বইটির আলোচনায় চঞ্চল লিখেছেন, "আমাদের বর্তমান অসভ্য সভ্যতা যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা যাবে তার কারণ, প্রথমত, এখনো শিশুর প্রকৃত মর্যাদা নিরূপণে ও প্রতিষ্ঠায় এটা আন্তরিক নয়। দ্বিতীয়ত, শিশুর মাধ্যমে প্রবাহিত মহাপ্রকৃতির নতুনতর মেসেজসমূহের প্রতি ক্ষীণদৃষ্টি দোষে দুষ্ট আত্মবিধ্বংসী বিষয়-বাসনায় আসক্ত তথাকথিত বয়োজ্যেষ্ঠ সমাজের সীমাহীন উদাসীনতা। শিশুকে দুর্বল,

অসহায়, আদরের বস্তু আর অযোগ্য ভাবার একটা প্রবণতা তথাকথিত বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজে লক্ষণীয়। শিশুর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তার অবমাননা করে আমরা বয়ঃপ্রাপ্তরা কিন্তু প্রকারান্তরে নিজেদেরকেই অপমান করি।"

আরো লিখেছিলেন, "আমরা বয়স্ক কেজো সমাজ শিশুর মাধ্যমে আগত নিত্য নতুন সুসমাচারসমূহ অনুধাবনের চেষ্টা না করে বরং আমাদের জীর্ণ পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে তাদেরকে পরিচালিত করি, শাসন করি, শোষণ করি, আদরের ছলে বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করি এবং অভিভাবকত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর আমাদের পছন্দ-অপছন্দ চাপিয়ে দেই, আমাদের অপূর্ণ বাসনা সকল চরিতার্থে তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করি। আমার সন্তান এবং ওর সন্তান এরকম স্থূল ও অসুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার পাঁকে নিষ্পাপ নিরপরাধ শিশুদেরকে টেনে নামাই। এভাবেই আমরা সামাজিক পরিবেশে পচন ধরাই এবং ধর্ষকামী ও কুসংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার ঘটাই। এমনটি করা আমাদের একেবারেই ঠিক না। এ ব্যাপারে কহলিল জিবরান-এর কাব্য স্মরণীয়: Your children are not your children/ They are the son and daughter of future/ They come through you but not from you."

সুতরাং আজ ঘোষণা করা প্রয়োজন যে, শিশু কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বাপ-মায়েরও সম্পত্তি নয়। শিশু সবার, সমাজের। শিশুই জাতি, শিশুই ভবিষ্যৎ। অথচ বয়স বিভাজনের ভিত্তিতে মনে হয় এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী শিশুরা। শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যানুযায়ী, সারা দেশে ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এক হাজার ৮৫ শিশুহত্যার শিকার হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রত্যেক মাসে প্রতিদিন গড়ে একটি করে শিশুহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত হত্যার শিকার হয়েছে ২৯ শিশু। (*ভোরের কাগজ* সম্পাদকীয়, ৪ মার্চ ২০১৬) সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়েছিল, 'দেশে শিশুদের নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।'

সোজা হিসাবে, বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ সবচেয়ে নির্যাতিত। কেউ যখন একটি শিশুকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পেটায় তখন সে জাতির ভবিষ্যৎকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পেটায়। কেউ যখন একটি শিশুর গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দেয়, সে আসলে জাতির ভবিষ্যতের গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দেয়। যে কোনো শিশুকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে মারে, সে জাতির ভবিষ্যৎকে ছুঁড়ে ফেলে মারে। যারা কোনো শিশুর পায়ুপথে হাওয়া ঢুকিয়ে পেট ফুলিয়ে মেরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, তারা জাতির ভবিষ্যতের পায়ুপথে হাওয়া ঢুকিয়ে তার পেট ফুলিয়ে মেরে উল্লাসে মেতে ওঠে। এসব মোটেও আবেগের কথা নয়, অঙ্কের মতো নিরাবেগ যোগ-বিয়োগের ফল।

জাতির নিকট-ভবিষ্যৎ আজ থেকে মাত্র আঠারো-বিশ বছর দূরে যখন আজকের শিশু তরুণ ও যুবক হয়ে উঠবে। আজ থেকে বিশ বছর পরের বাংলাদেশ কেমন হবে সে ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে এখন দেলফি'র মন্দিরে যাওয়ার দরকার নেই। আজকের শিশুর দিকে তাকালেই সহজে বোঝা যাবে। তবে শুধু নিজের শিশুর দিকে নয়, সমাজের শিশুর দিকে তাকাতে হবে। কেননা শিশু কারো একার নয়, সবার। আজকে আমরা উন্নত বাংলাদেশে প্রবেশ করছি, না এখনো

উন্নয়নশীলই আছি, তাতে বেশিকিছু আসে-যায় না। কারণ ইতিহাস বহু জাতির উন্নতি-অবনতি ও উত্থান-পতনে ভরা। বরং ভাবা দরকার আগামী আঠারো বছর পরের বাংলাদেশ কেমন হবে। তার জন্য দেশের মাটি, নদনদী, খনিজসম্পদ, বনবনানী, সড়ক, দালানকোঠা, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি হিসাব করা যায়। অনুমান করা যেতে পারে, কেমন হবে এইসব। কিন্তু যত কিছুই থাকুক, সে দেশেরও প্রাণ হবে তার মানুষ যারা তখন তরুণ-যুবক কর্মক্ষম বা দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেমন হবে তারা। কেমন করে জানব? আজকের শিশুর দিকে তাকালেই উত্তর মিলবে। কেমন আছে আজকের শিশু? ভালো নেই বললে সবটা বলা হয় না। সঠিক উত্তর হবে, খারাপ অবস্থায় আছে আজকের শিশু।

শিশু-নির্যাতন, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি যে চরম মাত্রা পেয়েছে, তা স্বেচ্ছান্ধ ছাড়া সবাই বুঝতে পারছেন। এখনকার এসব নৃশংস ঘটনাকে আগেও এমন হত বলে চালিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। শিশু-নির্যাতন-হত্যা যে কেবল সংখ্যার দিক থেকে বেড়েছে তা নয়, তা আরো কিছু ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, যা অতীতে এই পর্যায়ে ছিল না। সিলেটে ১৩ বছরের শিশু রাজনকে নির্যাতনের ঘটনাটিকে অপরাধীরা ভিডিও রেকর্ড করেছিল। মানুষ কতটা বিকৃতমনস্ক হলে একটি শিশুকে নির্যাতন করে আবার তার ভিডিও অন্যদেরকে দেখানোর কথা ভাবতে পারে! নিশ্চয়ই সে চিত্র দেখার মতো কিছু বিকৃতমনস্ক অমানুষ আছে।

শিশু-নির্যাতনের খবর যেভাবে ও যে পরিমাণে পত্রিকায় আসে, তাতে যেকোনো সুস্থ মানুষের আঁতকে ওঠার কথা। যেভাবে দলবেঁধে শিশু-নির্যাতনেরও খবর পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, আমাদের সমাজের একটা অংশ বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের অপরাধ মানুষ লুকানোর চেষ্টা করে এবং অপরাধীর মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করে। কিন্তু আমরা দেখি যে, শিশু-নির্যাতনের নৃশংস দৃশ্য নির্যাতনকারীরা ভিডিও করে ও সামাজিক মাধ্যমে তা প্রচার করে। অপরাধীরা গোপনে নয়, অনেক সময় সভা করে তারা পরিকল্পনামাফিক এসব করে। এ থেকে বোঝা যায়, এরকম অপরাধ কেবল ব্যক্তিচরিত্রের সমস্যা থেকে উদ্ভূত নয়, সমাজচরিত্রের সমস্যা থেকে উদ্ভূত। এজন্য রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

এরকম মাত্রার নির্যাতন যে কেবল শিশুর ক্ষেত্রে ঘটছে তা নয়, নারীর ক্ষেত্রেও ঘটছে। শ্রমিকরা বিশেষ করে গৃহশ্রমিকরা, যাদের একটা বড় অংশ নারীশিশু, তাদের বেলায় এরূপ নির্যাতন বহুকাল ধরেই চলে। কিন্তু এখনকার শিশু-নির্যাতন দেখে মনে হয়, শিশু হয়ে জন্মানোই একটা অপরাধ। তারপরও জীবকুলের জন্য বিধাতা অন্য কোনো উপায় তো রাখেননি! এতদিন দেখেছি ও শুনেছি, গায়ের রঙ ভিন্ন হওয়ার জন্য মানুষ আক্রান্ত হয়, ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষ আক্রান্ত হয়, নারী হলে তো হয়ই। যুদ্ধ পরিস্থিতি নারীর জন্য মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। ভিন্ন জাতের হলেও বিপদের শেষ নেই। এখন উদার গণতন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সে অন্ধকার পথেই পা বাড়াচ্ছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিও কি আসবে যেখানে শিশু হওয়াও একটা অপরাধ? মাঝে মাঝে এমন দুঃস্বপ্নও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

বড়দের হাতে শিশুদের নির্যাতনও আসলে অনেক পুরনো ইতিহাস। এখন তা দুঃস্বপ্নে রূপ নিচ্ছে। সংস্কৃতির মধ্যেও এ চর্চা প্রবলভাবে বহমান। আমরা শিশুদেরকে সারাক্ষণ শেখাই– বড়দেরকে সম্মান করো। কিন্তু বড়দেরকে কেউ শেখায় না– ছোটদেরকে সম্মান করো। পরস্পরের সমমান বজায় রাখা বয়স নির্বিশেষে ছোট-বড় সবারই সমান দায়িত্ব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ দায়িত্বের বোঝাটা বড়রা ছোটদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ছোটদেরকে তুই-তুকারি করে কথা বলার সংস্কৃতি তো আছেই, বড়জোর 'তুমি'। তাদেরকে 'আপনি' করে কথা বলার কথা কেউ ভাবে না। অর্থাৎ তারা কোনো সম্মান পেতে পারে না। অথচ স্নেহ-ভালোবাসার অপরিহার্য উপাদান সম্মান। আমাদের বড়রা আমাদের ছোটদেরকে সম্মান করতে ভুলে যাচ্ছে বলে শিশু-নির্যাতনও বাড়ছে।

শিশু-নির্যাতনের দায় থেকে বাবা-মা'ও মুক্ত হতে পারবেন না। একসময় স্কুলের শিক্ষকরা শিশুদেরকে যথেচ্ছ নির্যাতন করতেন। এখন সে পরিস্থিতি কিছুটা কমেছে, কিন্তু দূর হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যৌনঅপরাধের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। আবার শিক্ষকের শিশু-নির্যাতন কমাতে গিয়ে এমনসব নির্বোধ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে যে, এখন শিক্ষককেও সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। শিশু-নির্যাতন বন্ধ করতে পান থেকে চুন খসলেই শিক্ষককে শাস্তির ব্যবস্থা পরিস্থিতিকে মোটেও ভালো করবে না। আইন-কানুন তৈরি করে এসব পরিস্থিতি সামান্যই উন্নত করা যাবে। প্রয়োজন সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ও পরিবর্তন। স্কুলে শিক্ষককে সোজা করার জন্য এখন অনেক আইন-কানুন তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। এতে শিশুরা অনেক রেহাই পেয়েছে, সত্য। তবে শিক্ষাও যাতে সোজা থাকে ও রেহাই পায়, তা-ও লক্ষ রাখা উচিত।

স্কুলে শুধু কি শিক্ষকই শিশু-নির্যাতনের জন্য দায়ী? যখন মন্ত্রী ও মন্ত্রীগোছের ব্যক্তিরাও শিশুদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রোদের মধ্যে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নিজেদের সংবর্ধনা আদায় করেছেন, তার কী হয়েছে? স্কুলগুলো যেভাবে কারণে-অকারণে শিশুর পিঠে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, তা এক ভয়াবহ শিশু-নির্যাতন। বর্তমানে শিশুর পিঠে বইয়ের বোঝা কমানোর আইনি নির্দেশনা এ নির্যাতন কিছুটা কমালেও তা দূর করবে না। আইনে শুধু শিশুর পিঠ ও বইয়ের ভার বিবেচনা করা হয়েছে। শিশুর মনের পিঠ ও পাঠের ভার বিবেচনা করা হয়নি। অনেক স্কুলে সিলেবাসে অপ্রয়োজনে যে অতিরিক্ত বই যোগ করা হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণ না করলে শুধু পিঠের উপর থেকেই বইয়ের ভার কমবে, মনের উপর থেকে পাঠের ভার কমবে না। শিশুকে পণ্ডিত বানানোর অসুস্থ প্রচেষ্টা শিশু নির্যাতন বৈ কিছু নয়।

আরো আছে পরীক্ষার বোঝা ও ভর্তিযুদ্ধ। যদি কতগুলো পরীক্ষা দিতে হয় এই সংখ্যা দিয়ে শিক্ষার মান নির্ণয় করা হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অলিম্পিকে এই প্রতিযোগিতাটি এখনো চালু হয়নি। সারা পৃথিবীতে প্রাথমিক শিক্ষার মান বিচার করার রেওয়াজ শিশুর পড়তে পারা, লিখতে পারা ও যোগ-বিয়োগ করতে পারা এই মাত্র তিনটি

ক্ষমতা দিয়ে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় কয়েক শ যোগ্যতা অর্জনের কসরৎ করা হয়। কিন্তু মাত্র ওই ৩টি যোগ্যতার কোনোটিই অর্জন করে না, প্রাথমিক উত্তীর্ণ এমন শিক্ষার্থী আশ্চর্যরকম বেশি। মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষার বোঝা ও ভর্তিযুদ্ধের মতো নির্যাতনের জন্য আমাদের শিক্ষক নন, নীতিনির্ধারকরাই দায়ী।

স্পষ্টতই শিশু-নির্যাতনের দৃশ্য-অদৃশ্য নানা রূপ আছে। সংকটটিকে কিছু ব্যক্তির চারিত্রিক স্খলন হিসেবে দেখলে তেমন কোনো উন্নতি হবে না। সাথে এ-ও লক্ষ করা দরকার, শিশু-নির্যাতন শ্রেণি-নিরপেক্ষ কোনো সমস্যা নয়। দরিদ্র শ্রেণির শিশুরাই এর প্রধান শিকার। তবে সংকটটি যদি এভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে, তবে অন্য শ্রেণির শিশুরাও সহজে রেহাই পাবে না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে এর যে দুষ্টবীজ রোপিত আছে তা এখনই চিহ্নিত ও উৎপাটন করা দরকার। তাহলেই শিশু-নির্যাতন আশানুরূপ কমানো সম্ভব হবে। তাহলেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাহলেই শিক্ষা, শিশু ও ভবিষ্যৎ তিনই বাঁচবে।
কেননা, কহলিল জিবরান-এর কথায়:

তোমার সন্তান তোমার নয়
তারা ভবিষ্যের ছেলেমেয়ে
তারা তোমার মাধ্যমে আসে
তবু জেনো তোমার নয়।

এখনকার পরিস্থিতি হল– শিক্ষা, শিশু ও ভবিষ্যৎ তিনই কোনো অচেনা পথে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষকে এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বেরুতে হবে। অবশ্যই শিক্ষা, শিশু ও ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে হবে।

দুই.
রাষ্ট্রের ভাবনা

যেকোনো জনগোষ্ঠীতে শিশু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিশুকে বাদ দিলে কোনো জনগোষ্ঠীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। জাতি বা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ হচ্ছে তার শিশু। অতএব সেই রাষ্ট্র ও জাতিই শ্রেষ্ঠ যে তার ভবিষ্যৎ দেখতে পায় ও তাকে সুন্দর-সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে। অর্থাৎ সেই জাতি ও রাষ্ট্রই দূরদর্শী যে তার শিশুর প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয় ও তাকে সুস্থ, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে। আমরা কি তেমন জাতি বা আমাদের রাষ্ট্র কি তেমন দূরদর্শী? দেখা যাক।

বাংলাদেশে জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশই হচ্ছে শিশু। সংখ্যার দিক থেকে তারা বিরাট। সেই তুলনায় তাদের নিয়ে আলোচনা, ভালোমন্দের বিবেচনা ও রাষ্ট্রভাবনা নিতান্তই কম। বরং বয়সের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীকে বিভাজন করলে আজকে শিশুরাই সবার চেয়ে বেশি অবহেলিত ও

নির্যাতিত। নারী তো বহুকাল থেকেই অবহেলিত ও নির্যাতিত, শিশুরা তাতে নতুন যুক্ত হয়েছে যা এক অস্বাভাবিক ঘটনা। তবে জনগোষ্ঠী হিসেবে শিশু শ্রেণিনিরপেক্ষ নয়। তাই অবহেলা ও নির্যাতন কোন শ্রেণির শিশুর ভাগ্যে বেশি ঘটে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দরিদ্র শিশুরা নির্যাতন-বঞ্চনার প্রধান শিকার। অন্যরাও কম-বেশি ভুক্তভোগী। অতএব রাষ্ট্র আমাদের শিশুকে মানে আমাদের ভবিষ্যৎকে কিভাবে দেখে থাকে, সে আলোচনা জরুরি।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শিশুভাবনার প্রথম প্রতিফলন হয় তার সংবিধানে। এটি হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। এতে দ্বিতীয় ভাগে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'র আওতায় ১৭-এর ক-এ "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য" কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। ১৫ অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসার সঙ্গে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের আওতায় এমন কিছু নেই। এরফলে শিশুর শিক্ষালাভ আমাদের রাষ্ট্রের চোখে তার মৌলিক অধিকার কিনা সে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। যদিও ১৫-এর ৪-এ নারী বা শিশুর অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়নে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা যে শিশুর মৌলিক অধিকার আমাদের রাষ্ট্র তা সরাসরি বলেনি, তবে অন্যান্য কথার মধ্য দিয়ে তা স্বীকার করেছে। ঘোষণা দিয়ে বা মেনে নিয়ে রাষ্ট্র শিক্ষাকে যেভাবেই শিশুর মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখুক না কেন, সামগ্রিকভাবে শিশু রাষ্ট্রের চিন্তায় কম গুরুত্ব পেয়েছে। শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করে রাষ্ট্র তার শিশুচিন্তার প্রকাশ ঘটায়। পরবর্তীতে সেটি রহিত করে শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। এসব আইনে নানরাকম দোষত্রুটি থাকে, আর তারচেয়ে বড় কথা আইন তৈরি করাটা যত বড় কাজ তারচেয়ে বড় ও আসল কাজ হচ্ছে আইনের যথাযথ প্রয়োগ। বাংলাদেশে শিশুর অবস্থা কী তা জানার জন্য কাউকে আইনের বই পড়ে দেখতে হয় না, প্রতিদিন রাস্তাঘাটে হাটেমাঠে সর্বত্র দেখা যায়।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুসমর্থন করে। শিশুশ্রম নির্মূল করার উদ্দেশ্যে শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণীত হয়। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ আরেকটি বড় পদক্ষেপ। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ শিশুর শিক্ষার অধিকারকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার উদ্যোগ, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, ক্লাসে শিশুকে শাস্তি দেয়া নিষিদ্ধ করা, স্কুলে খাবার দেয়া– ইত্যাদি পদক্ষেপ শিশু-অধিকার বাস্তবায়নে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আবার শিক্ষানীতির বক্তব্য বিবেচনায় না নিয়ে জাতীয়ভাবে প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাসমূহ চাপিয়ে দেয়া শিশু-অধিকারের প্রতি সরকারের নীতিনিষ্ঠতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

জাতীয় শিশু নীতির ৬.১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'শিশুর অধিকার ও উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে শিশুর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমে তাদের মতামত ও

অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।" শিশুদের মতামত ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় বলেই হয়তো কোনোকিছুতেই তাদের মতামত নেয়া হয় না। হলে পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ইত্যাদি নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যেত না। অন্তত একটা মত এখন শিশুদের জোর গলায় ঘোষণা করা দরকার: "তোমাদের যথেচ্ছ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আমরা গিনিপিগ নই।"

শিশু নীতির প্রথম বাক্যটি হল: "শিশু জাতি গঠনের মূল ভিত্তি।" আর ভূমিকা পর্বের শেষ বাক্যটি হল: "শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।" শিশু নীতির ভূমিকাপর্বের প্রণেতা যে কথার জাদু জানেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জাদুর রসগোলায় কারই-বা পেট ভরে যদি-না সত্যি সত্যি "সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নে" শিশুর স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে বিবেচনা করা হয়। সে অবস্থা থেকে আমরা এখনো কল্পনাতীত দূরে।

এক্ষেত্রে গত দুবছর ধরে সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের শিশু বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগটি ভালো। যদিও এটি পৃথক বাজেট নয়, বরং একটি চশমা যা পরে বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুর স্বার্থরক্ষায় কী পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা দেখা ও বোঝা যায়; এটি ছোট হলেও একটি ভালো পদক্ষেপ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনায় সঠিকভাবেই বলা হয়েছে: "জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ রুগ্‌ণ ও শিক্ষাবঞ্চিত থাকলে কোনো দেশের পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়।" জনগোষ্ঠীর এই বড় অংশ বলতে শিশুদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা শিশু নীতিতে উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তাই স্বীকার করা হয়েছে: "২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিশু বাজেট-এর মাধ্যমে শিশুর কল্যাণ ও উন্নয়নে সমন্বিত বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই।"

২০১৬-১৭ শিশু বাজেট নিয়ে ভাবনায় স্বীকার করা হয়েছে: "অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও এখনও লক্ষ লক্ষ শিশু পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।" এবং বলা হয়েছে "... মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে তারা বঞ্চিত। এসকল কারণে ... বৃহত্তর উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ।" শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, অপুষ্টি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া, সহিংসতা, নির্যাতন ইত্যাদি সমস্যাকে শিশুর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধাগ্রস্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে বাংলাদেশে ৩ কোটির বেশি শিশু ।

শিশুদের নিয়ে রাষ্ট্রের ভাবনা অল্প মাত্রায় হলেও বিকশিত হচ্ছে কিন্তু কার্যক্রম এখনো শৈশবেই পড়ে আছে। তাই বলে দিন বসে থাকবে না। আজকের শিশুরা বড় হবে, একদিন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক হাল ধরবে। অনেক লম্বাচওড়া কথা বলা হলেও কাজে যেমন ঠনঠনা, তাতে ২০৪০ দশকের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কাছে আজকের প্রজন্মকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হবে– যদি এ অবস্থা চলতে থাকে ।

[লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, আবৃত্তি শিল্পী । পেশা: সাংবাদিকতা ।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশে শিশু-অপুষ্টির ব্যাপকতা

খু র শী দ জা হা ন

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনবসতিপূর্ন একটি উন্নয়নশীল দেশ। ষোল কোটি মানুষের বাসভূমি এই দেশটি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে নিজেকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে। মূলত এটি একটি কৃষি-নির্ভরশীল দেশ, এখনও আমাদের দেশে প্রায় ২৫% লোক দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এদেশে অপুষ্টির হার এখনও অনেক বেশি। প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় এদেশে শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যুর হার অনেক বেশি।

১৯৬২-৬৪ সালে এদেশে অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পর্যায়ে একটি পুষ্টি জরিপ হয়েছিল। সেই জরিপ থেকেই প্রথম আমরা জেনেছিলাম এদেশে জনগণের একটি বিশাল অংশ

বিশেষ করে মা ও শিশুরা বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টির শিকার। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি পুষ্টি জরিপ জাতীয় পর্যায়ে হয়েছিল। সব জরিপ গুলোতেই আমরা একই ধরনের চিত্র দেখেছি, যেমন আমাদের দেশের জনগণ বিশেষ করে মা ও শিশুরা প্রোটিন-এনার্জির অভাবে

(Protein Energy Malnutrition), ভিটামিন এ'র অভাবজনিত সমস্যা (VADD), আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা (IDD), আয়রন বা লৌহস্বল্পতা (ID) এবং লৌহস্বল্পতার কারণে রক্তস্বল্পতা (IDA), অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোর অভাবজনিত সমস্যায় (ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি, বি-ভিটামিনস, জিন্ক) ভুগছে। তবে গত চার যুগের উপরে আমাদের দেশে বিভিন্ন Intervention হয়েছে সরকারি পর্যায়ে, এনজিও এবং প্রাইভেট সেক্টরগুলোর মাধ্যমে, ফলে অপুষ্টির হার, মাতৃ-মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার আগের তুলনায় কমেছে। তবে সেটা এখনও আশানুরূপ ভাবে কমেনি। আমাদের দেশে পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বয়সের তুলনায় কম উচ্চতার (stunting) শিশু রয়েছে শতকরা ৩৬ জন, বয়সের তুলনায় কম ওজনের শিশু রয়েছে শতকরা ৩৬ জন। Infant mortality'র হার হল ৩৩ জন, এবং ঘবড়হধঃব ২৪ জন প্রতি হাজার জীবিত জন্মানো শিশুর মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি দশ হাজারে ১৭০ জন। জন্মকালীন কম ওজনের শিশুর হার (Low birth weight) ২২ জন। কম BMI (Body Mass Index, <18.5)-এর মায়েদের হার ৩২%।

আমরা যদি adult population-এর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে শতকরা ৩০ জনেরও বেশি লোক এবং মহিলা দীর্ঘস্থায়ী এনার্জির অভাবজনিত সমস্যায় ভুগছে অর্থাৎ তাদের Body Mass Index <18.5, অর্থাৎ WHO'র মতো অনুযায়ী তারা একটা Critical অবস্থায় রয়েছে। এগুলোর কারণ হল চাহিদার তুলনায় দীর্ঘদিন ধরে কম খাদ্য গ্রহণ এবং বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগা (Jahan et al 1998)।

অপুষ্টির অনেকগুলো কারণ রয়েছে, তার মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল দরিদ্রতা, অশিক্ষা, পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খাবারের অসম বণ্টন, ক্রয়-ক্ষমতার অভাব, রোগ সংক্রমণ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সঠিক রন্ধনপদ্ধতি না জানা, অনিরাপদ খাদ্য এবং পানীয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। আমরা জানি যে malnutrition and infection is a vicious cycle, একটার সাথে আরেকটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

Undernutrition-এর পাশাপাশি Overnutrition- ও আমাদের দেশে একটি বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ছেলেমেয়েরা Doble burden of Disease-এর শিকার হচ্ছে। ১৯৯৬-এ undernutrituon এবং overnutrition-এর অনুপাত ছিল ৫৩ঃ৭, ২০০৫-এ এই অনুপাত হয়েছে ৩২ঃ১৭। অর্থাৎ বেশি ওজনের ছেলেমেয়ে আমাদের দেশে অনেক বেড়েছে। এটা বেশির ভাগই হচ্ছে সুসম খাবার না খাওয়া, সঠিক জীবনযাত্রায় না চলা, অর্থাৎ Sedenteric জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া, ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের ক্রনিক অসুস্থতা যেমন ডায়াবেটিস, করোনারি হার্ট ডিজিজ, স্থুলতা ইত্যাদির শিকার হওয়া।

আমাদের দেশে সরকার ভিটামিন এ'-র অভাবজনিত রাতকানা রোগের হার কমানোর জন্য উচ্চমাত্রার ভিটামিন এ' ক্যাপস্যুল পাঁচ বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের মধ্যে বছরে দুইবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ফলে রাতকানা রোগের হার এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কমে এসেছে। ভিটামিন এ'-র অভাবজনিত রাতকানার হার এখন ০.১৩% মতো কিন্তু স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে, মায়েদের ক্ষেত্রে এটার হার এখনও বেশি, প্রায় ১.৭% (Jahan et.al 1998)

টেবিল: ১ বিভিন্ন জরিপে ছয় বৎসরের নিচের বয়সী শিশুদের রাতকানার হার

1982-83 (%)	1989 (%)	1995-96 (%)	1999 (%)	2001 (%)	2004 (%)
BBS	BBS	INFS	BBS	BBS	BBS
3.6	1.78	1.0	0.3	0.21	0.13

রাতকানা রোগ দূরীকরণ ছাড়াও ভিটামিন এ'-র অনেক কার্যকারিতা শরীরের উপর রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবীতে যত শিশুর মৃত্যু হয় তার মধ্যে ১.৪% মৃত্যু, অর্থাৎ ০.৮ বিলিয়ন মৃত্যু হয় প্রতিবছর শুধুমাত্র ভিটামিন এ'-র অভাবে (Sight and Life 2008)|

Global burden of Disease-এর যে প্রথম দশটি risk factors রয়েছে তার মধ্যে খাবারে ভিটামিন এ'-র অভাব এবং লৌহের অভাব অন্যতম। ভিটামিন এ'-র অভাবে রাতকানা ছাড়াও আরও অনেক বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে, যেমন শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immune function) ব্যাহত হতে পারে, রোগ সংক্রমণের হার বেড়ে যেতে পারে, মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বাড়তে পারে। রক্তস্বল্পতার কারণ হিসেবেও ভিটামিন এ'-র অভাবের ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবীতে বর্তমানে ৮৫ মিলিয়ন স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশু রয়েছে যারা ভিটামিন এ'র অভাবে Acute Respiratory tract (ARI) সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিটামিন এ'-র অভাবজনিত সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

Hidden hunger-এর মধ্যে আর একটি বিশাল সমস্যা হল আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা। সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় দুই বিলিয়ন লোক এই সমস্যার শিকার, তার মধ্যে ৬০ মিলিয়ন স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশু রায়েছে। বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৩০৩ মিলিয়ন লোক আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যায় ভুগছে (WHO 2005)। আয়োডিনের অভাবে শিশুদের মগজবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ছিল। ভারী বৃষ্টিপাত, ঘন ঘন বন্যা বাংলাদেশের মাটি থেকে আয়োডিন নামক এই প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থটি ধৌত হয়ে হারিয়ে যায় বা কমে যায়, ফলে জনগণের আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা হয়। আয়োডিনের অভাবে একটি প্রকট সমস্যা হল গলগ- রোগ। তাছাড়া এর অভাবে শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শেখার ক্ষমতা কমে যায়। স্কুলে খারাপ রেজাল্ট হওয়া, বোবা-কালা শিশুর জন্ম, খর্বাকৃতি (Cretin) হয়ে জন্মানো এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়। গর্ভবতী অবস্থায় এই খনিজ লবণের অভাব

যদি মায়েদের হয় তাহলে তারা মৃত শিশুর জন্ম দিতে পারেন, শিশুর জন্মকালীন ওজন কম হতে পারে। পরবর্তীকালে আর স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফেরা সম্ভব হয় না।

গত তিন যুগ ধরে (Three decades) ধরে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই শিশু এবং মায়েদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনেক ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে, তাতে করে শিশুমৃত্যু, মায়েদের মৃত্যুর হার কমে এসেছে। বাংলাদেশ সরকার আয়োডিনের অভাব দূর করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন– সেটা হল Universal salt Iodization Program যেটাতে বাংলাদেশের সকল লোকেরা – প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত আয়োডিন নামক এই খনিজ লবণটি সারা বছরই পেতে পারে। এই প্রোগ্রামের ফলে এ দেশে গলগণ্ডের হার অনেক কমে এসেছে। ১৯৯৩ সালে এই গলগণ্ডের হার ছিল ৪৭%, ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ২৫%, ১৯৯৯ সালে এটা ছিল ১৭.৮%। শিশু এবং মায়েদের ক্ষেত্রে এই হারটা আরও কম ছিল। ১৯৯৩-তে শিশুদের এবং মায়েদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে এটা ছিল ৪৯.৯% এবং ৫৫.৬%। পরবর্তীতে ২০০৪-০৫-এ এটা কমে হয়েছিল যথাক্রমে ৬.২% এবং ১১.৭%। Universal Salt Iodization Program-এর ফলে এদেশে হাবা-গোবা, বেঁটে (Cretin), জন্মকালীন কম ওজনের শিশুর সংখ্যা কমে এসেছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সরকারের এটা একটা সফল প্রোগ্রাম।

টেবিল: ২ বাংলাদেশের বিভিন্ন জরিপে গলগণ্ডের হার

1962-64 (%)	1981-82 (%)	1993 (%)	1995-96 (%)	1999 (%)
20	10.5	47	25	17.8

টেবিল: ৩ শিশু এবং মায়েদের গলগণ্ডের হার

	1993 (%)	2004-05 (%)
Children	49.9	6.2
Women	55.6	11.7

মানবদেহে লৌহস্বল্পতা এবং লৌহস্বল্পতার কারণে এনিমিয়া (অহধবসরধ) বা রক্তস্বল্পতা সমস্ত পৃথিবীজুড়েই এখন একটি Challenging সমস্যা। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ও আমাদের জনগণের জন্যও এটা একটা অন্যতম প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভিটামিন এ' এবং আয়োডিনের অভাবগুলো যতটা সফলতার সাথে অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে রক্তস্বল্পতা সেভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। সমস্ত বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লৌহস্বল্পতায় ভুগছে প্রায় ৫০% শিশু, ২৬% মহিলা এবং ২৫% পুরুষ, (Sight & life, 2008).

বাংলাদেশে রক্তস্বল্পতার হার এখনও অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার criteria অনুযায়ী এখনও বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুদেও মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার ৬৮% (Jahan et al

1998) যদিও এই হার ১৯৭৫-৭৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কমে এসেছে, গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে এই হার শতকরা ৫০-এর ও বেশি ।

টেবিল: ৪ বাংলাদেশে বিভিন্ন জরিপে শিশুদের রক্তস্বল্পতার হার

1975-76 Rural	1981-82 Rural	1995-96 National	2004 National
0-4 years %	0-4 years %	0-4 years %	<5 year %
82	73	69.5	68

রক্তস্বল্পতার কারণগুলোর মধ্যে প্রায় ৫০%-ই লৌহস্বল্পতার জন্য দায়ী (Thomas et al 2008) পৃথিবীতে প্রায় ২ বিলিয়নেরও বেশি লোক রক্তস্বল্পতায় ভুগছে এবং এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি লোকই লৌহের অভাব রয়েছে (Gillespies 1998)।

মানুষের শরীরে হিম আয়রন বা প্রাণীজ উৎসের লৌহ উদ্ভিজ উৎসের লৌহ থেকে বেশি শোষিত হয় । বাংলাদেশের জনগণ তাদের বেশির ভাগ পুষ্টি উপাদানই পায় উদ্ভিজ উৎস (non–heme iron) থেকে । লৌহের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য । আমাদের দেশের জনগণের প্রধান খাবার হল শস্যজাতীয় খাবার । এই শস্যজাতীয় খাবার থেকেই তারা তাদের প্রতিদিনের বেশির ভাগ লৌহ পেয়ে থাকে । ফলে তাদের শরীরে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় । Heme iron শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরির কাজে লাগে । আমাদের দেশে Heme iron-এর উৎস প্রাণীজ খাবার গ্রহণ বেশির ভাগ লোকের কম ।

রক্তস্বল্পতার খাবারের সাথে সম্পর্কিত লৌহ ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে । যেমন খাদ্যে ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-১২, ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, আমিষ-শক্তি (PEM) ইত্যাদির অভাব । খাবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় যেসব কারণ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে Acute এবং Chronic রক্তক্ষরণ, প্যারাসিটিক ইনফেসটেশন, ম্যাল অ্যাব্জরপ্শন, জেনেটিক ফ্যাক্টর, বোন ম্যারোতে রক্ত উৎপাদনে সমস্যা, অ্যান্টি নিউট্রিয়েন্ট ফ্যাক্টরস ইত্যাদি ।

সাধারণত লৌহস্বল্পতায় যারা ভোগে তারা হল বেশিরভাগই গর্ভবতী মহিলা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, বিশেষভাবে ৬ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশু । তবে স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশু-কিশোরী ও যুবতী মায়েরাও এই সমস্যার শিকার হয় । কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের ক্ষেত্রে Menstruation-এর সময় মাসিক রক্তক্ষরণ একটি বড় কারণ । গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে ভ্রূণের অতিরিক্ত পুষ্টি চাহিদা, ডেলিভারির সময় প্রচুর রক্তক্ষরণ ইত্যাদি ।

শিশুদের লৌহের অভাব হলে তদের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন হতে বঞ্চিত হয়, জন্মকালীন ওজন কম হয়, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়, বুদ্ধিমত্তা ও লেখাপড়া শেখার ক্ষমতা (Learning ability) কমে যায়, স্কুলে ভালো রেজাল্ট প্রদর্শন করতে পারে না । ভ্রূণ অবস্থায় মায়েদের রক্তস্বল্পতা হলে, লৌহের অভাব হলে সেই শিশুর ও শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । বড়দের মধ্যে দুর্বলতা, অবসাদ, কাজ করার ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদির জন্যও লৌহস্বল্পতা

দায়ী। বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে প্রতিবছর যে Economic productivity রক্তস্বল্পতার কারণে কমে যায় সেটা হিসাব করে দেখা গেছে যে তার পরিমাণ প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার (Galloway 2003)। United Nations Standing Committee on Nutrition (UNSCN)-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে রক্তস্বল্পতার economic cost ২০০৬ সনের GDP-র প্রায় ৭.৯% ছিল (UNICEF 2006)।

বাংলাদেশ সরকার রক্তস্বল্পতা দূরীকরণে গর্ভবতী মায়েদের জন্য লৌহ এবং ফলিক এসিড খাওয়ানোর জন্য একটি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন সমস্ত দেশে। শিশুদের জন্য কৃমি দূরীকরণের প্রোগ্রামও সরকার হাতে নিয়েছেন। এনজিও এবং প্রাইভেট সেক্টরে অনেক Intervention কার্যক্রম চলছে, কিন্তু রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া এখনও বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি বিশাল Challenging issue. Public Health significance-এর Prevalence rate-এর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে আমাদের দেশের মায়েরা, শিশুরা এখনও এনিমিয়ার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।

টেবিল: ৫ পাবলিক হেল্‌থ সিগনিফিকেন্স অনুযায়ী রক্তস্বল্পতার হার

Anaemia Prevalence	Public health significance
>40 %	Severe
20-39 %	Moderate
5-19 %	Mild
0-4.9 %	Normal

Ref: WHO/UNU 2000

বাংলাদেশে অপুষ্টি দূরীকরণে খাদ্য নিরাপত্তায় যে বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে আমাদের জোর দেওয়া উচিত সেখানে নির্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যাভাস পরির্বতনের সাথে সাথে চাহিদা অনুযায়ী মাইক্রোনিওট্রিয়েন্ট-এর Food availability, ক্রয়ক্ষমতা, পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সচেতনতা, সুষম খাবার গ্রহণ, পরিবারের সদস্যগণের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যগ্রহণের ব্যবস্থা (access) থাকতে হবে। তাছাড়া ছয়মাস বয়স পর্যন্ত ছোট শিশুদের মায়ের বুকের দুধ পান, ছয়মাস বয়স থেকে শিশুর উপযোগী বাড়তি খাবার দেওয়া, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে শিশু খাদ্য তৈরি ও পরিবেশন, নিরাপদ খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণের দিকে নজর রাখতে হবে।

গত দুই দশকে বাংলাদেশ সহ সমস্ত পৃথিবীতে মা এবং শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে অনেক চেষ্টা চালানো হয়েছে, অনেকটা সফলতাও লাভ করেছে সেটার মূল কারণ হল পাবলিক হেল্‌থ ইন্টারভেনশনের প্রচেষ্টা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ দেশের সকল স্তরের মানুষের অপুষ্টির হার কমিয়ে আনতে হবে। সমন্বিতভাবে

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, এনজিও, গবেষক, পলিসি মেকার এবং প্রোগ্রামারদের এই ব্যাপারে কাজ করতে হবে ।

References:

Gillespies (1998) Major issues in the control of iron deficiency. The Micronutrient Initiative. Food security in Bangladesh (2005) Ministry of Food and Disaster Management.

Galloway, R (2003) Anaemia Prevention & Control, What Works, Washington DC, USAID Integrated Anaemia Steering Group.

Jahan et. al (1998) Nature and Extent of Malnutrition in Bangladesh. Bangladesh National Nutrition Survey 1995-96.

Donald S. Mc Laren (2008) Sight and Life. Multiple Micronutrients and æHidden hunger”
www.sightandlife.org p-28

Thomas V. Chacko et. al (2008) Vitamin A Prophylaxis and Anaemia Control Programs. Sight and Life issue #31, 2008.

UNICEF (2006) Progress for children, A report card on nutrition. No. 4, May 2006, New york: UNICEF.

WHO (2005) Iodine status world wide. WHO Global Database on Iodine deficiency WHO, Geneva.

Corrected copy- 25/01/2017

Grading of anaemia by public health significance

Grading	Hb concentration gm/dl
Normal	12.0
Mild anaemia	10-11.9
Moderate	7-9.9
Severe	<7

Ref: WHO/UNICEF/UNU (2001)

[লেখক: অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।]

প্র ব ন্ধ

শিশুর মন ও মানসিক স্বাস্থ্য

আ হ মে দ হে লা ল

"রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচারে যে তাহার কখন কোন্ দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না।.....আসবার সময় বৌদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সদ্যই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেচ, বেশী বড় হয়নি তা-ও কুড়ুলের

এক-এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে এই শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'রামের সুমতি' উপন্যাসের রামলালের চরিত্রটির মধ্যে ছিল অবাধ্যতা, দুরন্তপনা আর সামাজিক নিয়মকানুন মানতে না চাওয়ার প্রবণতা। এমনতর শিশু কিন্তু আমাদের আশেপাশে প্রায়ই দেখা যায়। কোনো শিশু আছে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'র মিনির মতো চঞ্চল আর 'এক দ- কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না'। কখনো 'ছুটি' গল্পের ফটিক-এর মতো শিশুও আমরা দেখতে পাই—যারা নিয়ত চারপাশের মানুষকে ত্যক্ত করে বেড়ায়; পথিককে ভুল পথের নিশানা দেয়, ভাইকে উত্যক্ত করে—মাকে ধাক্কা দেয়। এমনধারা শিশুদের দেখেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধে-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।"

চপলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা শিশুদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই চঞ্চলতা আর আচরণের সমস্যা যখন শিশুর দৈনন্দিন কাজ আর অপরের সাথে সামাজিক সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করে তখন সেটাকে সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যার অন্যতম কারণ রয়েছে শিশুর বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মাঝে। শিশুর এই বেড়ে ওঠা বা বিকাশের কয়েকটি ধরন রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

শারীরিক বিকাশের পর্যায় শুরু হয় মাতৃগর্ভে। ৩৮ থেকে ৪০ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে একটি শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। ভূমিষ্ঠ হবার পর তাদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করতে শুরু করে; শিশু থেকে কিশোর এরপর যুবক আর তারপর প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হতে হতে শারীরিক পরিবর্তনগুলো চলতে থাকে।

শিশুর মনোসামাজিক বিকাশের মাধ্যমেই তার মন আর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। মনোসামাজিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিশুর ধারণার জগৎ তৈরি যাকে বলা হয় 'কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট'। সুইস বিজ্ঞানী জ্যঁ পিয়্যাজে এই বিকাশের পর্যায়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ধারণার বিকাশের চারটি পর্যায় রয়েছে— ১. সেনসরি মটর: জন্মের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত একটি শিশু আশেপাশের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। রঙিন খেলনা, সুরেলা গানের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়। ২. প্রি-অপারেশনাল: ২ থেকে ৭ বছর বয়সে তারা প্রতীকী খেলা অনুকরণ করে

খেলতে শিখে এভাবে তার জ্ঞানীয় জগৎ বিস্তৃত হয়, একটি বস্তুর সাথে আরেকটি তুলনা করতে শেখে। ৩. কংক্রিট অপারেশনাল: ৭-১১ বছরের এই সময় তারা সামাজিক রীতি-নীতির সাথে পরিচিত হতে শেখে। তারা যৌক্তিক চিন্তা করা শুরু করে এবং সহজে যুক্তিকে অতিক্রম করতে পারে না। ৪. ফর্মাল অপারেশনাল: ১১ বছরের পর থেকে তারা যুক্তির সাথে সাথে কার্যকারণগুলো বুঝতে শিখে, বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি হয়। নিজে নিজে অনেক সময় আরোপিত যুক্তিকে অতিক্রম করে নিজস্ব যুক্তি তৈরি করতে পারে। এই ধারণা বা জ্ঞানীয় বিকাশের সাথে সাথে শিশুর মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ শুরু হয়। নৈতিকতার বিকাশকে লরেন্স কোহলবার্গ কয়েকটি পর্বে ভাগ করে ব্যাখা করেছেন। কোহলবার্গ পিয়্যাজে'র ধারণার জগৎ বা জ্ঞনীয় বিকাশের পর্যায়গুলোর সঙ্গে নৈতিক বিকাশের যোগসূত্রও তুলে ধরেন। মানুষের নৈতিকতার বিকাশের পর্যায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোহলবার্গ তিনটি স্তরের বর্ণনা দেন। জন্ম থেকে প্রথম কয়েক বছর শাস্তি এড়াতে শিশুরা নিয়মকানুন মেনে চলে, এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে বয়ঃসন্ধিতে সে নিজের কাজের স্বীকৃতির জন্য সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে একাত্ম হয় 'ভালো ছেলে' বা 'ভালো মেয়ে' অভিধায় তারা ভূষিত হতে চায়। এই পর্যায়ে শিশুরা বিশ্বাস করে যে কোনো কাজ নৈতিক হবে যদি তা ব্যক্তির কাছে আনন্দদায়ক হয়। আর নৈতিকতার বিকাশের তৃতীয় স্তরটি শুরু হয় ১৬-১৭ বছর বয়সের দিকে। তখন সে নৈতিকতাকে নিজস্ব ধারণার জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিতে থাকে। এই পর্যায়ে সমাজের নিয়ম-কানুন থেকে সরে এসে তার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি, নীতিবোধ ও বিবেক দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করে। তার ধারণার জগৎ বা জ্ঞানীয় বিকাশ যদি হয় প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতিপন্থী, তবে তার নৈতিকতার চর্চা হয় সমাজ-অনুগামী। আর তার ধারণার জগতে যদি সে বিশ্বাস করে এই সমাজ, এই প্রচলিত রীতিনীতি 'সঠিক নয়', তখন সে তার চারপাশকে পরিবর্তন করতে চায়। যারা নৈতিকতা বিকাশের এই সর্বশেষ স্তরে পৌঁছাতে পারে তারা কিছু উচ্চ ও জটিল নৈতিক আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। এসময়কার নৈতিক আচরণগুলো কৃষ্টি বা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত আকার ধারণ করে।

শিশুর মনের জন্য সামাজিক বিকাশ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসময় সে মা-বাবা, পরিবারের সদস্য, আশেপাশের মানুষ ও পরিবশের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ তৈরি করতে শেখে। মা-বাবার ধরন এবং সামাজিক পরিবেশ শিশুর উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে। শিশুর লালন পালনের উপর ভিত্তি করে বাবা-মায়ের ধরনকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

বাবা-মায়ের ধরন অনুযায়ী শিশুর মনোসামাজিক গড়নও পরিবর্তন হয়-

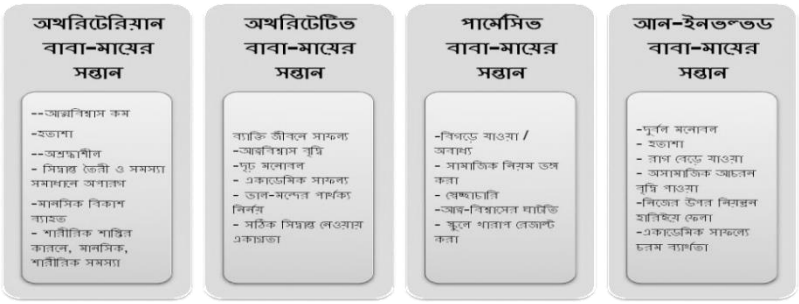

শিশু-কিশোরদের এই শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠা, বাবা-মা, পরিবার আর সামাজিকতা সবকিছু তার মনোজগৎকে প্রভাবিত করে। যখনই এইগুলোর মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি হয় তখন তার মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যাগুলোকে মোটাদাগে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

বিকাশজনিত সমস্যাগুলো মূলত দৈহিক বিকাশ আর মস্তিষ্কের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। যেমন—অটিজম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, ইত্যাদি। আর আবেগের সমস্যাগুলো তার মনোসামাজিক বিকাশের সাথে যুক্ত। আবেগের সমস্যার মধ্যে রয়েছে—কনভার্সন সমস্যা (হিস্টিরিয়া), উৎকণ্ঠা, বিষণ্নতা, অহেতুক ভীতি বা আতংক ইত্যাদি। আর আচরণের সমস্যাগুলোর মূল কারণ আশেপাশের পরিবেশ, শিশুর বেড়ে ওঠা, মা-বাবার ধরন ইত্যাদি। আচরণের সমস্যার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে—কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার, অতি চঞ্চল অমনোযোগী শিশু, মাদকনির্ভরতা, প্রযুক্তি-আসক্তি ইত্যাদি।

অধুনা বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত শিশুরা সামাজিক নিয়মকানুন মানছে না, বাবা-মায়ের সাথে অবাধ্যতা করছে। 'রামের সুমতি'র রামলালের মতো শিশু-কিশোরদের আধিক্য যেন বেড়েই চলেছে। কখনো তারা সংঘবদ্ধভাবে অপরাধ করছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে কারণে প্রযুক্তিবান্ধব পরিবেশে গড়ে তোলা

সম্ভব হচ্ছে না—প্রযুক্তির খারাপ দিকগুলো তারা শিখছে আর ভালোটুকু কমই গ্রহণ করছে। সামাজিক চাপ, ফলনির্ভর কারিকুলাম, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা-মা এবং ত্বরিত অপরিকল্পিত নগরায়ন শিশুদের সাবলীল আর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে নৈতিকতা আর সাংস্কৃতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না। ফলে শিশুদের মন আর মানসিক স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে।

শিশুদের মনন-এর বিকাশে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বাবা-মা, পরিবার, শিক্ষক, সমাজ সকলেরই রয়েছে সমান দায়িত্ব। ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরি করতে হলে শিশুর মন ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এর জন্য কয়েকটি সাধারণ নীতি সবারই মেনে চলা উচিত—।

১. শিশুকে বকা দেবেন না, মারবেন না।

২. শিশুকে একই আদেশ বার বার দেবেন না। প্রয়োজনে একবার তাকে বুঝিয়ে বলুন, না শুনলে বেশ কিছুক্ষণ পর আবার বুঝিয়ে বলুন।

৩. শিশুকে রুটিন মেনে চলতে উৎসাহিত করুন, পরিবারের সবাই নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলুন।

৪. শিশুকে উপহাস করবেন না, তার প্রতি বক্রোক্তি করবেন না।

৫. শিশুকে উৎসাহ দিন। যে বিষয়টিতে তার আগ্রহ আছে সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিন।

৬. সফলতার পাশাপাশি ব্যর্থতাও যে জীবনের অনুষঙ্গ তা শিশুকে বুঝতে দিন, ব্যর্থতাকে মেনে নেয়ার শিক্ষা দিন।

৭. পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করুন।

৮. শিশুকে নৈতিকভাবে দৃঢ় করতে পারিবারিকভাবে নৈতিকতার চর্চা করুন। শিশুর সামনে কোনো অপরাধ করবেন না এমনকি কোনো ছোটখাটো নিয়ম ভঙ্গও করবে না।

৯. প্রযুক্তিকে শত্রু মনে করবেন না—শিশুদের মধ্যে প্রযুক্তির যৌক্তিক ব্যবহার বাড়াতে উৎসাহিত করুন। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সচেতন হন– যেমন নির্দিষ্ট সময় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেয়া, প্রকাশ্য স্থানে কম্পিউটার ব্যবহার করা, প্রতিরোধমূলক সফটওয়ার ব্যবহার করা।

১০. শিশুকে বই পড়তে উৎসাহিত করুন—তবে সে কী বই পড়ছে সেটার দিকে নজর দিন।

১১. শিশুর কোনো চিন্তা ও আচরণে সমস্যা দেখতে পেলে তা গোপন করবেন না, পারিবারিকভাবে আলোচনা করুন, শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করুন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

[লেখক: সহকারী অধ্যাপক, চাইল্ড এডলোসেন্ট এন্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা। মহাসচিব, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর চাইল্ড এন্ড এডলোসেন্ট মেন্টাল হেলথ (ব্যাকহাম)। soton73@gmail.com]

প্র তি ক্রি য়া

নবজাতকদের থাইরয়ড: অভিভাবকদের যা জানা দরকার

সা হি দা আ খ তা র

নবজাতকদের থাইরয়ডের জন্য বাছাইকরণ

উপসর্গ প্রকাশের পূর্বেই নবজাতকদের কিছু কিছু স্বাস্থ্যসমস্যা নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে নিউবর্ন স্ক্রিনিং, সংক্ষেপে NBS। এই পদ্ধতিতে অতি দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর রোগ নির্ণয় করা যায় এবং নির্ণয়কৃত রোগের দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। NBS কে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেয়ার সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ সহজ একটি পরীক্ষা করে হাজার হাজার নবজাতকের মধ্য থেকে

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুটিকে বের করে আনা। অধিকাংশ ঝুঁকিহীন শিশু ছাঁকনি দিয়ে বেরিয়ে যাবে, অল্প সংখ্যক, বিশেষ করে যারা ঝুঁকিপূর্ণ, তারা চিহ্নিত হবে। স্ক্রিনিং যে সবসময় সঠিক হবে তা নয়। কখনো এমন হতে পারে যে বলা হল নবজাতকটি কোনো বিশেষ রোগ, যেমন হাইপোথাইরয়ডিজম বা থাইরয়ড হরমোনের অভাবজনিত রোগের ঝুঁকিতে আছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আবার এমনও হতে পারে, বলা হল, "আপনার শিশু ঝুঁকিমুক্ত", কিন্তু আসলে সে ঝুঁকিমুক্ত নয়। তবে এরকম হেরফেরের সংখ্যা অতি নগণ্য।

স্ক্রিনিং এবং ডায়াগনোসিসের মধ্যে পার্থক্য কী?

স্ক্রিনিং হচ্ছে সহজ পদ্ধতিতে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ শিশুর মধ্য থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের বের করে আনা। অন্যদিকে ডায়াগনোসিস হচ্ছে রোগের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করে বলা। ডায়াগনোসিস ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। স্ক্রিনিং সেবা স্বল্পশিক্ষিত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

ডায়াগনোসিসের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত জনবল এবং ল্যাব সেটআপ লাগে। স্ক্রিনিং ঝুঁকি নির্ণয় করে, ডায়গনোসিস তার নিশ্চিত অবস্থা নির্ধারণ করে। স্ক্রিনিং-এ অধিকাংশ শিশু যারা ঝুঁকিমুক্ত বলে বেরিয়ে আসবে, মনে হতে পারে বৃথা খোঁজা হল। কিন্তু একদিকে যেমন এটা জানা সম্ভব না কোন শিশুটি ঝুঁকিতে আছে, অন্যদিকে যে শিশুটি আসলে রোগাক্রান্ত তার অকল্পনীয় উপকার হবে। যথাসময়ে যথাযথ চিকিৎসা আরম্ভ হবে, এবং রোগের মারাত্মক ক্ষতিকর দিক এড়ানো যাবে।

স্ক্রিনিং যেহেতু রোগ নিশ্চিত করে না, সেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হলে তা নিশ্চিত করার জন্য শিশুকে বাড়তি কিছু রক্ত পরীক্ষা (Confirmatory test) করাতে হবে। এর জন্য শিশুটিকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আনা হবে।

হিল-প্রিক টেস্ট (Heel-prick-test):

অভীষ্ট রোগের ঝুঁকি নির্ধারণ করতে নবজাতকের গোড়ালি থেকে সামান্য রক্ত নিতে হয়। বাতাস অচিরেই বাংলাদেশে নবজাতকের জন্মগত থাইরয়ড হরমোনের অভাবজনিত রোগ congenital hypothyroidism, সংক্ষেপে CHT স্ক্রিনিং আরম্ভ করতে যাচ্ছে। পরবর্তীতে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য স্ক্রিনিংযোগ্য রোগও একে একে এই স্ক্রিনিং-এর আওতায় আনা হবে।

স্বাস্থ্যকর্মী শিশুর ৩ থেকে ৫ দিন, অনুর্ধ ৭ দিনের মধ্যে হিলপ্রিকের সাহায্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত একটি বিশিষ্ট পরীক্ষা-কিট-এ সংগ্রহ করবেন। এতে দ্রুত, অনুর্ধ্ব ১০ মিনিটের মধ্যে জানা যাবে শিশুটি রোগের ঝুঁকিতে আছে কিনা। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার নিশ্চিতকরণ রক্তপরীক্ষা (confirmatory blood test) করে সঠিক চিকিৎসা আরম্ভ করা হবে।

CHT কী?

জন্মের সময়ই কোনো শিশুর থাইরয়ড হরমোনের অভাব থাকলে congenital hypothyroid, সংক্ষেপে CHT বলা হয়। আমাদের দেশে CHT- এর কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে মোটামুটিভাবে প্রতি ২০০০ নবজাতকে একজন CHT নিয়ে জন্মায়। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমাদের দেশে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ২৯ (২০-৪০) জন শিশু CHT নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। সব মানুষের গলার সামনে নিচের দিকে মাঝখানে থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। থাইরয়ড গ্রন্থির কাজ থাইরয়ড হরমোন তৈরি করা। থাইরয়ড হরমোন শরীর গঠনকারী প্রতিটি কোষের পাচন-প্রক্রিয়া (metabolism) স্বাভাবিকভাবে চলার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি হরমোন।

CHT কিভাবে হয়?

মায়ের গর্ভে থাকাকালীন ২০ সপ্তাহ বয়সেই শিশুর থাইরয়ড গ্রন্থির হরমোন তৈরি করতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈবাৎ দুর্ঘটনাক্রমে অজানা কারণে এই হরমোন তৈরি হয় না। পূর্বব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো ডাক্তার বা বাবা-মায়ের করার কিছু থাকে না।

চিকিৎসা কী?

চিকিৎসা হচ্ছে মুখে খাওয়ার বড়ি থাইরক্সিন, সহজলভ্য, এবং ব্যয়বহুলও না। বয়স এবং ওজন অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রার ওষুধ সকালে ১ বার খালি পেটে খেতে হয়। রোগ নির্ণয়ের পরপরই দ্রুত, পারতপক্ষে জন্মের দু'সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা আরম্ভ করা দরকার। অধিকাংশ শিশুকে এই ওষুধ আজীবন চালাতে হয়। এটি অত্যন্ত নিরাপদ ওষুধ। গবেষণায় এই চিকিৎসার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হাইপোথাইরয়ড শিশুর জীবন

হাইপোথাইরয়ড শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ ও কার্যকর জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। কদাচিৎ কিছু কিছু শিশু বাড়তি কিছু সমস্যায় ভুগতে পারে। যেমন শারীরিক জড়তা বা লেখাপড়া সম্পর্কিত (Learning problem) সমস্যা হলে তাদের কিছু বাড়তি চিকিৎসা লাগতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎকের পরামর্শ নিতে হবে। হাইপোথাইরয়ড শিশুকে থাইরয়ড চিকিৎসার পাশাপাশি রুটিন টিকাসহ সকল প্রয়োজনীয় চিকিৎসা একটি স্বাভাবিক শিশুর মতোই চালিয়ে যেতে হবে। খাওয়া-দাওয়ারও এই শিশুদের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। অধিকাংশ শিশুর আজীবন চিকিৎসা লাগে। স্বল্প কিছু শিশুকে ২ থেকে ৩ বছর চিকিৎসা চালাবার পর ওষুধের মাত্রা কমানো এমনকি

বন্ধও করা লাগতে পারে। তবে অবশ্যই তা হতে হবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে। মাতৃদুগ্ধপানকারী শিশুদের বেলায় মায়ের দুধের সঙ্গে গুড়ো করা বড়ি মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। তাছাড়া অন্য কোনো খাবারের সঙ্গে এই ওষুধ মেশানো উচিত নয়–তাতে সঠিক মাত্রা নিশ্চিত করা যাবে না।

হাইপোথাইরয়ড শিশুর শরীরে এই হরমোন একেবারেই অথবা যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয় না। থাইরক্সিনের অভাবে শিশু শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিশু এমনকি স্থায়ীভাবে মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে পারে।

CHT যদিও সাধারণত একেবারে সারিয়ে তোলা যায় না, অতি সহজে, স্বল্প খরচে সহজভাবে এর চিকিৎসা করা সম্ভব। বর্তমান ব্যবস্থায় CHT জন্মের আগে নির্ণয় করার, বা গর্ভজাত শিশুর CHT বাধা দেয়া সম্ভব নয়। বাবা-মা বা চিকিৎসক কারোই কিছু করার নেই। তাই স্ক্রিনিংই হচ্ছে দ্রুততম সময় রোগ নির্ণয় করে যথাসময় চিকিৎসা আরম্ভ করার সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে **CHT** হতে পারে

এক.

ক. থাইরয়ড গ্রন্থিটি তৈরি হয় না।
খ. থাইরয়ড গ্রন্থিটি অসম্পূর্ণ বা ছোট হয়।
গ. থাইরয়ড গ্রন্থিটি তৈরি হয় কিন্তু সঠিক অবস্থানে থাকে না এবং ঠিকভাবে কাজ করে না।

এই ধরনের CHT- এর সাধারণত বংশ- ইতিহাস পাওয়া যায় না। পরিবারে একটি শিশু আক্রান্ত হলে পরবর্তী শিশুটি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দুই.

শতকরা ১০ দশ থেকে ২০ ভাগ শিশুর থাইরয়ড গ্রন্থি তৈরি হয় ঠিকমতোই, কিন্তু হরমোন তৈরি করে না। গ্রন্থিটি স্বাভাবিক আকারে, এমনকি কখনো একটু বড়ও হয়-তা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে হরমোন তৈরি করে না। এই ধরণের CHT শিশুদের সাধারণত পারিবারিক ইতিহাস (family history) পাওয়া যায়।

রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে CHT রোগী থাকে, এবং পরিবারে একটি শিশু CHT আক্রান্ত পাওয়া গেল পরবর্তী শিশুটির আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি থাকে। অতএব সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে এদের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।

স্ক্রিনিং-এ হাইপোইরয়েডের ঝুঁকি পাওয়া গেলে শিশুকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর নিকট পাঠানো হবে। তিনি পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিবেন।

জেনে রাখা প্রয়োজন, ওষুধ খাওয়াতে ভুলে গেলে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা খাওয়াতে হবে। কখনো দ্বিগুণ মাত্রা একসঙ্গে খাওয়ানো যাবে না। খাওয়ার পরপরই ওষুধ বমি করে ফেলে দিলে দ্বিতীয়বার খাওয়াতে হবে। অভিভাবকগণ শিশুর অসুস্থতা বা বিশেষ কোনো অবস্থায় ওষুধ খাওয়াবার বিষয়ে জানতে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

শিশুর ফলোআপ কিভাবে করাবেন?

শিশুর বয়স এবং ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ওষুধের প্রয়োজনীয় মাত্রা ঠিক করে দেবেন। প্রথম বছর যেহেতু শিশু খুব দ্রুত বাড়ে, তাই একটু ঘন ঘন পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন ধরুন প্রথম বছর চিকিৎসা আরম্ভে ৩ সপ্তাহ পর, তারপর ৪ সপ্তাহ পর, তারপর প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করে মাত্রা ঠিক করতে হবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ বার, অর্থাৎ প্রতি ৩ থেকে ৪ মাস অন্তর অন্তর রক্ত পরীক্ষা করে ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর্মী শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিশ্চিত করবেন।

[লেখক: অধ্যাপক, নবজাতক ইউনিট, শিশু বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল।]

শিশুর ভাষা অর্জন

গু ল শা ন আ রা

প্রাণীজগতে মানুষকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে ভাষা। অন্যান্য অনেক প্রাণীর মধ্যে সীমিতভাবে যোগাযোগ দক্ষতা লক্ষ করা গেলেও মানুষের মতো এমন পূর্ণাঙ্গ ভাষাসংশ্রয় আর নেই। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভাষার কারণেই মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। মানুষের এই সংজ্ঞাপন দক্ষতার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে তার সুসংগঠিত স্নায়ুতন্ত্র, যার কেন্দ্রবিন্দু মস্তিষ্ক। মানবশিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই কেঁদে ওঠে। এই কান্নাই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তবে কান্নার শারীরবৃত্তীয় তাৎপর্য ভিন্ন, এর দ্বারা তার শ্বসন অঙ্গ যেমন ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তেমনি এটাই তার বাগযন্ত্রের প্রথম ব্যবহার। সাধারণ একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকেই ভাষা শেখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশু বাকযন্ত্রের সাহায্যে আওয়াজ তৈরি বা কথা বলার ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, যে আওয়াজ পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়ে নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিরূপ পরিগ্রহ করে। এ কথা বলার অপেক্ষা করে না, শিশু জন্ম থেকেই সরব। প্রথম কান্নাই তার পরবর্তী সময়ের ভাষিক দক্ষতা অর্জন প্রক্রিয়ার প্রবেশদ্বার। শিশুর ভাষা অর্জনে পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ামক হলেও একটি বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা একমত, শিশুর ভাষা অর্জন ক্ষমতা সহজাত। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি প্রথম "সর্বজনীন ব্যাকরণ"-এর বিষয়টি উপস্থাপন করেন ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর *"Syntactic Structures"* নামক গ্রন্থে। সর্বজনীন ব্যাকরণের মূল কথা হল, মানবশিশু সহজাতভাবে ভাষিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ ব্যাকরণের কারণেই একটি শিশুর মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাষিক দক্ষতা বিকাশ লাভ করে। শিশু যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে সেই অঞ্চলের ভাষার ব্যাকরণ তার মস্তিষ্কে রক্ষিত ভাষা অর্জন ডিভাইসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে নেয়।

বিষয়টিকে সরলীকৃতভাবে উপস্থাপন করা যায় নিম্নোক্তভাবে-

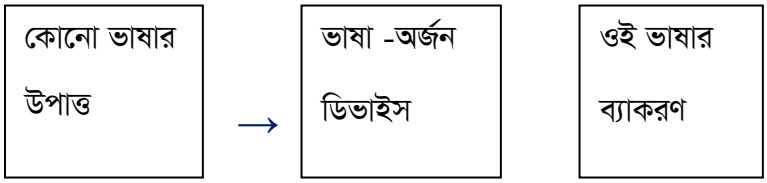

ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলোর মধ্যে Cognitive theory বা প্রজ্ঞানমূলক তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে, যার মূল কথা হচ্ছে, ভাষা অর্জনের একটি বোধগত ভিত্তি থাকবে। আবার ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে আচরণবাদীরা ভাষাকে একটি আচরণ হিসেবেই দেখতে চান। উদ্দীপকের প্রতি সাড়াদান—এই প্রক্রিয়াই মানুষের সকল আচরণের কেন্দ্রে অবস্থান করে। তাঁদের মতে শিশুরা "তাবুলা রাসা" বা শূন্য পৃষ্ঠার মতো পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই পৃষ্ঠা পূর্ণ হতে থাকে। শিশুর ভাষা অর্জনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর বিভাজন দেখতে পাই।

০-৬ মাস: শিশুর কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম ধ্বনি

শিশু জন্মের পর যে কান্না করে, সেটাই তার কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম ধ্বনি। জন্মের পর প্রথম কান্না দ্বারাই সে ঘোষণা করে তার অস্তিত্ব এবং একই সাথে চালু হয় তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া। এরপর কয়েকদিন তার কান্নার কারণ মূলত ক্ষুধা ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা। এ সময় কান্না ছাড়া সে আরও নানারকম ধ্বনি তৈরি করে, যেমন—কোঁকানো, গরগর শব্দ করা, হিক্কা তোলা, ফোঁসফোঁস শব্দ করা ইত্যাদি। এসব ধ্বনি দ্বারা শিশুর বিশেষ কোনো শারীরিক অবস্থা বোঝা যায় না। এমনকি, শিশুর কান্না নিয়ে নানা গবেষণা করে দেখা গেছে যে, কান্নার বিভিন্ন ধরন রয়েছে বলে যে ধারণা বর্তমান, তা মূলত পরিস্থিতি বিচার করেই করা হয়। অনেক গবেষকের মতে, মা-বাবা শিশুর কান্নার ধরন থেকে ক্ষুধা, ব্যথা, কাঁথা ভেজানো ইত্যাদি বিষয় বুঝতে সক্ষম বলে যে দাবি করে, তা ঠিক নয়। শিশুর কান্না তার বাগধ্বনি উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ-সময় সে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, যা কথা বলার সময়ও প্রয়োজন। এ-সময় সে তার কণ্ঠস্বরের উচ্চতা (loudness) ও মীড় (pitch) নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। তার শারীরিক বিকাশ বাক্-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করে, জিভ সঞ্চালনক্ষম হয়, চোয়াল সহজে নড়াচড়া করতে শুরু করে এবং এসব পরিবর্তন বাগ্‌যন্ত্রকে নমনীয় হতে সাহায্য করে। ভাষা বিকাশের প্রথম স্তরটিকে বলা হয় vegetative বা আত্মগত স্তর, যার স্থায়িত্ব ০-৬ সপ্তাহ। ঠিক এর পরের (৬-১৬ সপ্তাহ) স্তরটিকে বলা হয় "কূজন"(coing)। হাস্য বা laughter (১৬-২০ সপ্তাহ)) স্তরে শিশু তার মাকে খুব ভালো করে

চিনতে পারে, উচ্চস্বরে হাসে এবং হাত-পা ছুঁড়ে বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়া করে, নাম ধরে ডাকলে ঘুরে তাকায়। বাগধ্বনি উৎপাদনের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে স্বরক্রিয়া (vocal play) স্তরের । ৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্থায়ী এ সময়ে শিশুরা নানা ধরনের বাগ্‌ধ্বনি উৎপাদন করতে শুরু করে, এমনকি দ্বিস্বর ধ্বনিও তৈরি করতে পারে ।

শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শব্দের প্রতি তার সাড়াদান সুনির্দিষ্ট ও সুচারু রূপ লাভ করে। শিশুর বয়স-বৃদ্ধি ও পরিপক্কতার সাথে সাথে তার শ্রবণ-ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। শব্দের প্রতি শিশুর সাড়াদান প্রাথমিক অবস্থায় তার শারীরিক নড়াচড়া হ্রাস বা বৃদ্ধির মাধ্যমে হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে শিশু নিজে ধ্বনি উৎপাদন করে সাড়া দিয়ে থাকে। জন্মের পর প্রথম সপ্তাহে শিশু মানুষের নরম গলা শুনে তার কান্না থামাতে পারে। চার মাস বয়সের মধ্যে সে রাগান্বিত ও স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বরের পার্থক্য বুঝতে পারে। দেখা গেছে যে, শিশু ভাষার শব্দ সনাক্ত করার আগে ভাষার অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যাবলি চিনতে পারার ক্ষমতা লাভ করে।

৬-১২ মাস: প্রাকভাষাতাত্ত্বিক পর্যায় ও অস্ফুটভাষ (Babling)

শিশুর ভাষা বিকাশের শাব্দিক পর্যায়ের পূর্ববর্তী স্তরটিকে প্রাক্‌ভাষাতাত্ত্বিক পর্যায় বলা যায়। শিশুর বয়স যত বাড়ে, ততই তার মধ্যে ধ্বনি উৎপাদনে পরিবর্তন আসে। শিশুর ভাষার বিকাশ সব শিশুর মধ্যে প্রায় একইভাবে হয়ে থাকে। এ-সময় শিশুরা ব্যাপকভাবে ধ্বনি নিয়ে খেলা করে। এমনকি মূক ও বধির শিশুদের মধ্যেও এ-স্তরে কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শিশুর প্রথম দিকের অস্ফুটভাষে স্বরধ্বনির চেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা অনেক কম থাকে। শিশুরা যেসব স্বরধ্বনি উৎপাদন করে, তার মধ্যে পশ্চাৎ স্বরধ্বনির আধিক্য লক্ষ করা যায়। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কণ্ঠনালীর ও জিহবামূলীয় ধ্বনির সংখ্যা বেশি। এ সময় শিশুদের অনেক শব্দ সদৃশ ধ্বনিগুচ্ছ বা অক্ষর (syllable) উচ্চারণ করতে দেখা যায় এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক বাগধ্বনির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। দশ মাস বয়সের মধ্যেই একটি শিশু সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রায় সব ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে। অস্ফুটভাষ শিশুর কণ্ঠনিঃসৃত অন্যান্য ধ্বনি, যেমন—কান্না বা কোঁকানো ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি ভাষাসদৃশ। এগুলো সাধারণত হয়ে থাকে স্বর ও ব্যঞ্জনের সমন্বয়ে গঠিত অক্ষর এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্ত। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা দু-ধরনের অস্ফুটভাষ উৎপাদন করে– ১. পুনরাবৃত্ত অস্ফুটভাষ: এক্ষেত্রে ব্যঞ্জন-স্বরধ্বনির অক্ষরের পুনরাবৃত্তি ঘটে, যেমন—বাবা, দাদা ইত্যাদি; ২. অপুনরাবৃত্ত অস্ফুটভাষ: এক্ষেত্রে শিশুরা একাধিক অক্ষর দিয়ে শব্দসদৃশ্য অস্ফুটভাষ তৈরি করে, যেমন দাদা, আলদা ইত্যাদি। মূলত এ স্তর থেকেই শিশুর প্রথম শব্দোচ্চারণ ঘটে। এ পর্যায়ের শেষদিকে শিশুরা এমন ধ্বনিক্রম উচ্চারণ করে, যেগুলো শব্দ নয় আবার ঠিক অস্ফুটভাষ পর্যায়েও পড়ে না। এগুলোকে প্রত্নশব্দ (proto-word) বলা যেতে পারে। অধিকাংশ গবেষকই মনে

করেন, অস্ফুটভাষ ও পরবর্তী ভাষার বিকাশ পারস্পরিক সম্পর্কহীন নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, অস্ফুটভাষের দ্বারা শিশু ভাষার ছান্দনিক বৈশিষ্ট্য (prosodic features) আয়ত্তে আনে।

এ পর্যায়ের শেষদিকে শিশুর ধ্বনি উৎপাদন ক্রমশ জটিলতা লাভ করে এবং শিশু অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সে অবিরত ধ্বনিগুচ্ছ তৈরি করে, যা শ্রুতিমধুর ও ছন্দোময়। অনেক সময় তার অস্ফুটভাষের গুণে মনে হয়, সে কিছু চাইছে কিংবা কোনো প্রশ্ন করছে। এ পর্যায়ের শেষের দিকে শিশু প্রথম অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে। তবে প্রথম শব্দোচ্চারণের অনেক আগে থেকেই সে শব্দ কিংবা কিছু সরল বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সাত মাস বয়স থেকে আফরিদা 'হা করো', 'এখানে বসো', 'এ দিকে এস', 'না না, যেও না' নির্দেশগুলো মানতে শুরু করে। এছাড়াও সে 'তাই তাই' বললে দুহাত দিয়ে তালি দেয়। মুখে তাই তাই বলে এবং 'টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল' বললে দুহাত ছন্দের তালে অনবরত মুষ্টিবদ্ধ করে এবং খোলে।

১২-২৪ মাস: প্রথম শব্দোচ্চারণ ও বাক্য গঠন

এ-সময়টি খবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ-সময় শিশু তার প্রথম শব্দোচ্চারণ করে। তবে শিশুর প্রথম শব্দোচ্চারণ সঠিকভাবে সনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ বেশ কঠিন। সাধারণত যে-কোনো অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ থেকে বাবা-মা শব্দ চিহ্নিত করে থাকেন। তবে যে শব্দ সে উচ্চারণ করে, তার অর্থ শিশুর কাছে প্রথমত, ভিন্ন হতে পারে, দ্বিতীয়ত, একটি শব্দ দিয়ে সে একাধিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং তৃতীয়ত, একটি শব্দ দিয়ে সে একটি বাক্য বোঝাতে পারে। শিশুর উচ্চারিত একটি শব্দ শাব্দিক ধাঁধার মতো। শব্দটি কী বোঝাচ্ছে তার সমাধান করেন শিশুর পাশে যারা উপস্থিত থাকেন তাঁরা। শিশুর উচ্চারিত প্রথম শব্দ সাধারণত পুনরাবৃত্ত ও একাক্ষরিক, যেমন—বাবা, দাদা, মামা, ফুফু ইত্যাদি। শিশুর ব্যবহৃত একটি শব্দের স্বরভঙ্গির তারতম্য ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ নির্দেশ করে; এমনকি শব্দের সাথে-সাথে শিশু নানা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে অর্থ-বৈচিত্র্যও তৈরি করতে পারে। যেমন—একটি শিশু 'মা' বলে যদি শরীরটাকে নির্দিষ্ট কোনো দিকে বা মায়ের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, তবে অর্থ হতে পারে 'মার কাছে যাবো', 'মা কোথায়?' ইত্যাদি। তার উচ্চারিত শব্দের আনুষঙ্গিক আচরণ থেকে সঠিক অর্থটি বের করে নিতে হয়। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিশুরা সাধারণীকরণ করে থাকে। যেসব অর্থ সে একই শব্দ দ্বারা করে থাকে সেগুলোর দু-একটি বৈশিষ্ট্য একই রকম থাকে, যেমন, সে যে-কোনো তরলকে 'দুদু' বলতে পারে, আবার যে-কোনো সাদা বস্তুকেও 'দুদ' বলতে পারে। যে-কোনো শব্দের অর্থ বোঝার ক্ষমতা শিশুর মধ্যে প্রথম গড়ে ওঠে দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, যেমন—রং, আকার, আকৃতি ইত্যাদি। সতের মাস বয়সে ফাইরুয লাল কালির কলম দিয়ে আঁকাআকি করত বলে সে 'লেখা' শব্দ দ্বারা 'লাল রঙ' বুঝাত। আবার রক্তকেও সে লেখা বলত।

শিশুরা এ পর্যায়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলতে শেখে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শব্দগুলো সে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। নতুন শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সে সাধারণীকরণ করে থাকে। যেমু—ফাইরুয ১৪ মাস বয়সে কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাক শুনে কুকুরকে 'ভাও' বলতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সে বিড়ালকেও ভাও বলে। এর কারণ হতে পারে বিড়ালও কুকুরের মতো চার পা বিশিষ্ট ও চলনক্ষম প্রাণী। পরবর্তী সময়ে সে কালো বিড়ালকে 'কালো ভাঁও' বলে এবং মজার বিষয় এই যে, তখন সে সব চতুষ্পদ প্রাণীকে 'কালো ভাঁও' বলতে শুরু করে। সৌমিক ১৬ মাস বয়সে কালো বিড়ালকে 'কালাবু' এবং তেলাপোকাকে 'তেলাবু' বলতে শুরু করে। এক্ষেত্রে সম্ভবত দুটি প্রাণীই তাকে দেখে দৌড়ে পালায় এবং দুটিই চলনক্ষম—এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে নামকরণে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে একটি শিশুর ভাষা-বিকাশ এক-শাব্দিক স্তর থেকে দু-শাব্দিক স্বরে উন্নীত হতে পারে। ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সে শিশু দ্বিশাব্দিক স্তরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ এ পর্যায়ে সে শব্দ থেকে বাক্য তৈরি করতে শুরু করে। তবে এসব বাক্য পুরোপুরি বাক্যিক নিয়ম অনুসরণ করে না।

শিশুর ভাষিক বিকাশের প্রথম আঠার মাসে নিম্নোক্ত ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশঃ

১. বাংলা ভাষার প্রায় সবগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে।
২. প্রায় ৫০টির মতো অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করতে পারে।
৩. বুঝতে পারে প্রায় এর তিনগুণ বেশি শব্দ এবং নির্দেশমূলকসহ অনেক বাক্য।
৪. স্বরভঙ্গির পার্থক্য থেকেও অর্থোদ্ধারে সক্ষম হয়, যেমন, যাবে? ইত্যাদি ঊর্ধ্বগামী স্বরভঙ্গি ও সমান্তরাল স্বরভঙ্গির কারণে সৃষ্ট অর্থ-পার্থক্য ধরতে পারে।
৫. যৌগিক শব্দ তৈরি করতে পারে, যেমন—বোদালি, কালো বাউ।
৬. সরল দ্বি-শাব্দিক, ত্রি-শাব্দিক অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারে। বাক্যের মাধ্যমে প্রশ্ন, নির্দেশ ও চাহিদা প্রকাশ করতে পারে।
৭. 'আমিত্ব' বিকশিত হয়। ভাষায় আমার, আমি ইত্যাদি শব্দ অর্থপূর্ণ স্থান পায়।
৮. ব্যাকরণিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। সে 'আমি' ও 'আমার'-এর সাথে অন্য পুরুষের পার্থক্য করতে পারে। তবে বর্তমান কাল ছাড়া অন্য কোনো কালের বোধ তৈরি হয় বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
৯. বিমূর্ত ধারণাজ্ঞাপক কোনো শব্দ তার ভাষায় পাওয়া যায় না।
১০. ভাষার মূল শব্দ (content word)-ই ব্যবহার করে; কোনো ভূমিকা শব্দ (function word) দেখা যায় না।
১১. কোনো বদ্ধরূপমূলের লক্ষণীয় ব্যবহার দেখা যায় না।

১২. শব্দে ধ্বনি-পরিবর্তন আদ্য, মধ্য, অন্ত্য যে-কোনো স্থানেই হতে পারে (যেমন, যাবো- দাবো, পিপড়া-পিপপা, নাক- নাথ)। এমনকি রূপগত ধ্বনি-পরিবর্তনও দেখা যায় (যেমন, লাল গাড়ি- দালদালি)।

১৩. ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্রাবদ্ধ করা যেতে পারে, যেমন—প্রায় সকল অন্ত্য র, ত-তে পরিবর্তিত হতে পারে (চেয়াত, পেপার, পেপাত ইত্যাদি)।

১৪. নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে, যেমন—বাবা থেকে বাবালা, বাবালু, মা থেকে মানা, মনো, এমনকি 'লা' দিয়ে পরবর্তী সময়ে সে বুয়া থেকে 'বুয়ালা' শব্দ তৈরি করে।

১৫. অর্থপূর্ণ ত্রিশাব্দিক বাক্য তৈরি করতে পারে।

১৮-২৪ মাস বয়সে শিশুর বাক্যে অনবদ্য এক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, এ স্তরটিকে বলা হয় তারবার্তা (telegraphic stage), কারণ বাক্যগুলো থাকে ব্যাকরণ-বর্জিত কেবল মূল শব্দ (content word)) দ্বারা গঠিত ঠিক টেলিগ্রামের ভাষার মতো। ২-৫ বছর বয়সের মধ্যে শিশু পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

শিশুর ভাষা-বিকাশ সব শিশুর মধ্যে একই রকমভাবে দেখা যায় না। কোনো শিশুর ভাষা বিকাশ দ্রুত হতে পারে, আবার কারো কারো ভাষা বেশ ধীর গতিতে বিকশিত হতে পারে। এমনকি উচ্চারণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, কোনো কোনো শিশু খুব দ্রুত ভাষার সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করতে পারে। আবার কেউ ৩ বছরের বেশি বয়সেও সঠিক উচ্চারণে কথা বলতে পারে না। এমনও দেখা যা যে, কোনো কোনো শিশুর ভাষাবোধ গভীর থাকলেও ব্যবহার কম থাকে যে কারণে সে সব কথা বোঝে, এমনকি নির্দেশ পালনও করতে পারে, কিন্তু নিজে কথা বলে না । এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। চার বছর বয়সে আইনস্টাইন প্রথম কথা বলার আগে পর্যন্ত তাঁকে সবাই বাকপ্রতিবন্ধীই মনে করত।

[লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

শি শু সা ম য়ি ক প ত্রি কা

ব দি উ জ্‌জা মা ন

শিশু পত্রপত্রিকায় শিশু কিভাবে এসেছে এর দুটো অংশ, এক, সরাসরি শিশু সাময়িক পত্রিকায় এবং দুই. সংবাদপত্রের শিশু-পৃষ্ঠায় শিশু। সংবাদপত্র কোনো শিশু-পত্রিকা নয় সে কারণে একে বর্তমান আলোচনা রাখা হয়নি। শিশু সাময়িক পত্রিকায়ও প্রায়ও শিশু কিশোর পৃষ্ঠা বা তরুণ ও কিশোর কলম থাকে। শিশুধারণা গঠন যেহেতু পরিণত সমাজ-চেতনার অংশ সে কারণে শিশু সাময়িক পত্রিকার ফোরামে পরিণত বয়সীদের রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। শিশু কিশোরদের রচনার মধ্যে কোনো রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হলে সেগুলো আলোচনায় রাখা হয়েছে।

শিশু (১৩১৯)

বিশ শতকের প্রথম দিকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিশু সাময়িক পত্রিকা হল শিশু। 'শিশু' শিরোনামে দুটো পত্রিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথমটি ১৩১৯ সালে প্রকাশিত অপরটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পত্রিকাটি সম্পর্কে সময়ের ক্রমানুসারিতা অনুসরণ করে যথাস্থানে আলোচিত হবে। ১৩১৯ সালে প্রকাশিত শিশু পত্রিকাটি নানা কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত এ পত্রিকাটি শিশু বিকাশের জন্য অপেক্ষাকৃত যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পেরেছিল সাম্প্রতিককালের হিসেবেও একে বিশেষ ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। 'শিশু' ছিল সচিত্র মাসিক পত্রিকা, ১৩১৯ সালে ৬০ নং মৃজাপুর স্ট্রীট কলিকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নিবেদন অংশে বলা হয়,

শিশুদিগকে আমোদের সহিত শিক্ষাদান করাই শিশুর উদ্দেশ্য। এই মাসিক পত্রে শিশুদের শিক্ষার উপযোগী কৃষি বিজ্ঞান, শিশু বিষয়ক প্রবন্ধ, নানা দেশ বিদেশের ও পশু পক্ষীর বিবরণ, নীতিপূর্ণ গল্প কবিতা পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় সরল সহজ কথা, রূপকথা এবং আমোদজনক খেলার প্রণালী প্রভৃতি বহু চিত্রসহ প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে।

প্রথম সংখ্যায়[১] যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার শ্রী ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দশগুপ্ত শ্রী জীবেন্দ্র দত্ত শ্রী নবেরন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রী রসিক চন্দ্র বসু শ্রী অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রী হরিপ্রসন্ন গুপ্ত ও শ্রী সুধীর কুমার সেন ।

প্রথম রচনা একটি কবিতা, 'শিশু' শিরোনামে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রচিত কবিতাটির অব্যবহিত বাম দিকের পৃষ্ঠায় একটি ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর ছবি, এর নিচে উল্লেখিত 'ভাইবোন' । প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন,

সোনার দেশের বুকে
হাসিয়া এসেছি সুখে....

আনন্দিত শিশুদের এখানে সোনার দেশের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের বিকাশের ক্ষেত্রকে বেশ প্রসারিত করে তোলা হয়েছে। এর পরের রচনার উপশিরোনাম ছাত্রজীবন, মূল শিরোনাম বিদ্যাসাগর, এখানে বিদ্যাসাগরের জীবনকথা আলোচিত, বিদ্যাসাগরের শৈশবকাল শৈশবেরর জ্ঞানতৃষ্ণা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। এটা বিদ্যাসাগরের শৈশবকালের জীবনী অংশ, রচনার শেষে ইঙ্গিত আছে যে পরে আরো প্রকাশিত হবে। লেখকের নাম নেই এতে বোঝা যায় এটা পত্রিকায় নিজস্ব নিবন্ধ এবং সচেতনভাবে লিখিত ও প্রকাশিত । পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে বিভিন্ন মনীষী বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রচনা প্রকাশিত হয়েছে ।

শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রতিধ্বনি জীবনবৃত্তান্ত গ্রিক রূপকথার রূপান্তর, এর সঙ্গে ঈষৎ বিজ্ঞানকথা মিশ্রিত হয়েছে। অভিশপ্ত প্রতিধ্বনি বাক হারিয়ে অরণ্যে নির্বাসিত হল, তার একমাত্র ক্ষমতা থাকল অন্যের কথার প্রতিধ্বনি করা । রচনাটি শেষ হয়েছে এভাবে, 'কথা বললে বনে-জঙ্গলে আমরা যে আওয়াজ শুনি তা ঐ মেয়েটির মরণ কালের সুর...আর সে সুর যে আমাদেরই কথার মত শোনায় তার কারণ মেয়েটির প্রতি স্বর্গের রানীর শাপ ।'

বিষয়টি রূপকথার, স্বর্গের রানির শাপগ্রস্ত মেয়েটির ক্রন্দন পৃথিবীর অরণ্যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে। এ প্রতিধ্বনি আমাদের প্রতিদিনকার ইহজাগতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত, ধ্বনি থাকলে তার প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয় । ধ্বনির প্রতিধ্বনির বিজ্ঞানের অংশ, তথাপি গ্রিক রূপকথাকে সামনে নিয়ে একটি করুণরসের সৃষ্টি করে যেভাবে প্রতিধ্বনি সত্যোপলব্ধিকে তুলে আনা হয়েছে তাকে শিশুর সহানুভূতি মিশ্রিত কৌতূহলের উদ্রেক হয় আবার একই সঙ্গে বিজ্ঞানবুদ্ধিও তাকে অনুসরণ করে। দুয়ের এ মিশ্রণ প্রকৃতপক্ষে শিশুর মুক্ত মনোজীবন গঠনের পরিপূরক ।

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ধ্রুবের কথা ধারাবাহিক রচনা এবং রূপকথা তবে চরিত্রের নাম বিষ্ণু সুরুচি রাজা উত্থানপাদ ইত্যাদি এসেছে, চরিত্র পরিকল্পনাও সেভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ।

মহম্মদ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ আছে এটা শিশু পত্রিকার এ সংখ্যার শেষ রচনা । লেখকের নাম নেই সুতরাং পত্রিকার নিজস্ব নিবন্ধ হিসেবে এটা প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে। প্রবন্ধটি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদের (স.) জীবনী, হালিমার ধাত্রীগৃহে প্রেরণ পর্যন্ত তাঁর শৈশবকালে বর্ণিত। ইতিহাসের সঙ্গে কিছু লোকশ্রুতির দিক প্রাধান্য পেয়েছে, লোকশ্রুতির দিকটি

জীবনী অংশের সঙ্গে কোথাও কোথাও জড়িয়ে আছে। নিবন্ধে কিছু শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, এগুলো ট্রাডিশনাল বাঙালি হিন্দু সমাজের জন্য প্রযোজ্য হিন্দুর ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত, এর মধ্যেই শব্দগুলোর সহজ ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কমিউনিকেশন সৃষ্টি হয়ে আছে। সেভাবে কমিউনিকেশন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেও তা বর্তমান নিবন্ধে পরিকল্পিত হয়ে থাকতে পারে। অপর একটি দিকও আছে, এ পত্রিকার মুসলমান পাঠকের উদ্দেশ্যেও এটা উপস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে যেখানে মুসলমান পাঠকের সঙ্গে হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক ঐক্যনির্মাণ হয়তো উদ্দেশ্য ছিল। তবে ব্যবহৃত শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে মুসলিম বিশ্বাসকে খাটো করা প্রবণতা আছে বলে মনে হয় না। ভিন্ন ধর্মের কারণে কোনো প্রতিযোগিতাবোধ কিংবা অশ্রদ্ধা কোথাও নেই, সমকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের একটি নিবন্ধ বেশ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যায়, যেমন,

পতিশোকে আমেনার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। একমাত্র গর্ভস্থ সন্তানের চন্দ্রমুখ দর্শনের আশায় জীবিত রহিলেন।

অথবা,

যেদিন আমেনা দেবীর কুমার ভূমিষ্ঠ হইল সেদিন মক্কা নগর হঠাৎ আলোকিত হইল।

অথবা,

সুতিকাগৃহে আমেনা দেবী কত রকমের আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে লাগিলেন। কখন দেখেন স্বর্গের দেবগণ তার কুমারকে স্তব করিতেছেন।

অথবা,

কুমারের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে দেবগণের স্তুতি করিতেছেন আর কুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। দেবগণ হৃষ্টমনে যেন তাহাকে অভয় দিতেছেন।

অথবা,

কুমারের জন্মদিন আকাশে এক নূতন নক্ষত্রের উদয় দেখা গেল। জ্যোতিষী সমাজে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

অথবা,

মক্কার অন্তর্গত কাবা নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি ছিল। কুমার জন্মিবা মাত্র উহা ভাঙ্গিয়া গেল। মূর্তিপূজকগণের হৃদয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা আসিল।

অথবা,

পাদ্রীদের প্রাণে যেন হঠাৎ একটা ভয়ের সঞ্চার আসিল। প্রাণে প্রাণে যেন উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। ধার্মিকগণের প্রাণে আনন্দ প্রবাহ ছুটিল।

অথবা,

ক্রমে মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা ইহুদী ও খৃষ্টান মহলে প্রচারিত হইল। তাহাদের প্রাণেও আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

অথবা,

কুমারের জন্মের তৃতীয় দিবসে তাহার পিতামহ মহাসমারোহে কুমারের নামকরণ উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কাবার উপাসনা গৃহে কুমারকে আনিলেন। কুমারের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।....সকলেই ভগবানের নিকট কুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

উপরোক্ত অংশগুলোর নিম্নরেখ আমাদের, পৃথকভাবে গুরুত্ব চিহ্নিত করার জন্য এভাবে করা হয়েছে। মূলে রচনায় ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

নিম্নরেখ অংশগুলো হিন্দু পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়ে থাকতে পারে। বৈশাখ ১৩১৯, ইংরেজি এপ্রিল ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ও তা রদের উত্তপ্ত পটভূমিতে এবং ক্লেদাক্ত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে মধ্যে বাঙালি শিশুর জন্য হিন্দু- মুসলমান সকল শিশুর জন্য নবীজীর (স.) জন্ম ও শৈশবকথার উপস্থাপন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রচনাটি ছিল সকল শিশুর জন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সে অর্থে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু পত্রিকার পরের সংখ্যার দ্বিতীয়[২] নিবন্ধ হল ছাত্রজীবন, উপশিরোনামে মূল নিবন্ধ হাজি মুহম্মদ মোহসেন। এটা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর নিবন্ধের অনুরূপ। হাজি মুহম্মদ মোহসেনের ধর্মানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই যে তাঁর দানে উপকৃত সেগুলো সপ্রশংস উল্লেখিত হয়েছে। লেখক বলেন 'এই হুগলী কলেজ হইতে বাঙ্গালীর' মুখোজ্জ্বলকারী বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বহু কৃতি হিন্দু ছাত্রও বাহির হইয়াছেন। সুতরাং মোহসেনের দানে হিন্দুদেরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।'

এ রচনার উপসংহার সৃষ্টি হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের পটভূমিতে, তবে দৃষ্টিভঙ্গিটি যথেষ্ট উদার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অন্য একটি সংখ্যায় সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খোকার জন্মদিনে[৩] কবিতার দুটো চরণ,

আয় বাছা আয়
আজ তোর জন্মদিন পূজি দেবতায়।

দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদিত তা নিশ্চিত, তবে শিশুর পবিত্রতা দেবতার কাছাকাছি চলে এসে থাকতে পারে।

রাজভক্তি[৪] কবিতার সঙ্গে কবির নাম উল্লেখিত হয়নি এ কবিতায় বড়দিনে রাজভক্তি ও রাজআনুগত্যের প্রকাশ রয়েছে। তেমনি শ্রী কাব্যানন্দের স্বগত কবিতা বড়লাট লর্ড হার্ডিং ও তার স্ত্রী লেডি হার্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশংসাগাথা। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের স্বরস্বতী পূজা[৫] নাট্যরূপে কবিতায় লিখিত। শ্রী হরিকৃপা চৌধুরীর প্রভুভক্তি[৬] রূপকথা আকারে রচিত রাজা শূদ্রক

ও বীরবরের গল্প, লক্ষ্য পাঠক হিন্দু সমাজের শিশু। খোদার দান[৭] কবিতায় কবির নাম উল্লেখিত হয়নি। গরীব আলী কাঠ বেচে খায় তবে ধার্মিক, খোদার কৃপায় কিভাবে বনের মধ্যে ডাকাতের ধন পেয়ে বড়লোক হয়ে যায় তার বিবরণ আছে। শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৌলিক[৮] মহাভারতের ধারাবাহিক গল্প। এ সংখ্যায় দ্বিতীয় রচনা শ্রী সত্যচরণ চক্রবর্তীর হজরত মুহম্মদ, এটা নবীজীর (স.) জীবনী তবে শৈশবকথা আছে সামান্যই। কিছু তথ্যের বিকৃতি আছে, কতিপয় শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। পূর্বে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

যেমন, সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগনের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বর মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই এরূপ কথা আছে।

অথবা,

তিনি পত্নী খাদিজাকে সঙ্গে লইয়া ৬০৯ খৃষ্টাব্দে মক্কার নিকটবর্তী 'হর' পর্বতে গমন করিলে এবং সেখানে এক গহ্বরের মধ্যে অহর্নিশি ঈশ্বর চিন্তায় কাটাইতে লাগিলেন।

অথবা,

তিনি পৃথিবীর প্রতি বস্তুতে ভগবানের হস্ত দেখিতে পাইলেন এবং সেই ভাবে ও চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

উপরে নিম্নরেখ আমাদের। প্রথম উদ্ধৃতিটি ইসলামের মৌল ধারণার বিপ্রতীপ, ইসলামে অবতার নেই, অবতারবাদী হিন্দু ধর্মের কিংবা অন্য কোনো ধর্মের দৃষ্টান্ত থেকে এটা এসে থাকতে পারে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। কোথাও কোথাও উপলব্ধির সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। নিম্নরেখ শব্দগুলো এবং অবতারবাদ ইসলাম ধর্ম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত নয়, হিন্দু পাঠকের সঙ্গে কমিউনিকেশনের কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়ে থাকতে পারে, বিষয়টি পূর্বে ঈষৎ আলোচিত হয়েছে। একই লেখক শ্রী সত্যচরণ শাস্ত্রীর জন্মাষ্টমী[৯] প্রবন্ধটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের এবং সদ্যোজাত শিশু শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ। শ্রী রাজকুমার চক্রবর্তীর বীর বালক[১০] অভিমন্যু বধের কাহিনী।

শিশু পত্রিকাটি সামগ্রিকভাবে সমকালীন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্যমান কিছু বাস্তবতাকে গ্রহণ করে নিয়ে সেভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদির আলোকে শিশু বিকাশের ধারণা গঠন করেছে। বাংলায় শিশুসাহিত্য সৃষ্টির প্রথম দিকে হিন্দু ঐতিহ্য যেভাবে সামনে এসেছিল এ পত্রিকায় সেসবের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। তথাপি ক্যানভাসটি অনেক উদার ছিল এখানে যে, মুসলিম ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত এসেছিল এবং উপলব্ধির সমস্যা বা দূরত্ব কিছু থাকলেও হিন্দুর সঙ্গে এর কোনো সচেতন প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা হয়নি যদিও এ সময়ে সচেতন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এরূপ প্রতিযোগিতা আর্থিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে অর্থে শিশু পত্রিকায় হিন্দু ঐতিহ্য অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়ে এলেও তা সরাসরি মুসলিমবৈর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনি। উপসংহার এখানে যে, 'শিশু' পত্রিকার পেছনে শিশুর

উপস্থিতি বড় করেই ছিল। শিশুর স্বাতন্ত্র্য বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল বলেই শিশু বিকাশের জন্য শিশু পত্রিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। অব্যবহিত পশ্চাৎভূমি ছিল হিন্দু সমাজ, লক্ষ্য পাঠক ছিল সেখানে তথাপি মুসলিম বিষয়বস্তু যে একেবারে গুরুত্বহীন হয়নি তার মধ্যে সমকালীনতা উপলব্ধির এবং সমকালীনতার তুলনায় অগ্রসর উপলব্ধির পরিচয় মেলে। সমগ্র সামাজিক মানুষ ততদিনে হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ে বিভক্ত ছিল ফলে এ পত্রিকার ফোরামে শিশুও বিভক্ত হয়ে থাকতে পারে, তবে পরস্পরবৈর অবস্থানে তা স্থাপিত ছিল না। সেদিক দিয়ে 'শিশু' পত্রিকাটি ধর্মীয় ঐতিহ্য ধারণা কিংবা অবলম্বন করলেও ইহজাগতিক উপলব্ধি বা অবস্থান থেকে সরে যায়নি, সমকালীন বিভিন্ন বাস্তবতাকে গ্রহণ করে নিয়েও শিশুর কল্যাণময় বিকাশে নিবেদিত ছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু সম্পাদিত কিংবা পরিচালিত আর কোনো পত্রিকা হিন্দু ঐতিহ্য অবলম্বন করে প্রায়ই এরূপ উদারতা দেখাতে পারেনি।

শিশুধারণা গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত সন্দেশ (১৩২০), এ পত্রিকার প্রথম দিকের সংখ্যাগুলো প্রায়ই সহজলভ্য নয়। তথাপি উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সুকুমার রায় প্রমুখের রচনায় এ পত্রিকা প্রথম দিকে সমৃদ্ধ ছিল, পূর্বে তাঁদের সাহিত্যিক অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে সন্দেশ পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ ধারণা পাওয়া যাবে। সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু রচনা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, এগুলো শিশুসাহিত্যের অন্যতম সংযোজন।

আঙুর (১৯২০)

মুসলমান সম্পাদকের উদ্যোগে প্রথম শিশু পত্রিকা হল বালক, ১৯০৩ সালে বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়, এর সম্পাদক ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। দ্বিতীয় শিশু পত্রিকা হল আঙুর,[১১] মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় কলিকাতা মখদুমী লাইব্রেরী থেকে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। আঙুর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে।[১২] পত্রিকায় লেখকদের অন্যতম হলেন সুধাকান্ত রায় চৌধুরী এ লোহানী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যশোরী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম শ্রী বিমলেন্দু মিত্র প্রমুখ। আঙুর পত্রিকার প্রথম সংখ্যা[১৩] আমরা খণ্ডিত আকারে পেয়েছি সুতরাং রবীন্দ্রনাথের লেখা দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। এ সংখ্যায় শাহাদাৎ হোসেনের কবিতার শিরোনাম হামিদের দয়া, হামিদ স্কুল থেকে ফেরার পথে অভুক্ত বন্ধু রশিদের দেখা পায়, রশিদকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তাকে আগে খেতে দেয়ায় হামিদের মা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন,

দুহাত তুলে ছেলের শিরে
দিলেন দোয়া আরো
এমনি দয়া সারা জীবন
দুঃখী জনে করো।

ইসলাম ধর্মের এবং মুসলমান সমাজের আচরণীয় এ নৈতিকতা প্রকৃতপক্ষে শিশুশিক্ষার অংশ। শ্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষের সাহসের পুরস্কার নিবন্ধে আওরঙ্গজেবের শৈশবকালে মত্ত হাতির সামনে তার দুঃসাহস প্রদর্শনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আওরঙ্গজেবের এ দৃষ্টান্তটি যদিও ঐতিহাসিক তথাপি কোনো হিন্দু লেখকের হাতে এটা সচরাচর উল্লেখিত হয় না, আঙুর পত্রিকায় এটা স্থান পেয়েছে। মোহাম্মদ মোবারক আলির আফিঙখোর হাস্যরসাত্মক গল্প, আফিঙ নেশার কুফল বর্ণিত। মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যশোরীর চাকুরীর মজা[১৪] গল্পে আলম খারাপ ছাত্র এবং বিভূতি ভালো ছাত্র, বিভূতি বি এ পাশ করে ডেপুটির চাকরি নেয়া আলমের পড়াশুনা এগোয়নি সে, ব্যবসায় মনোযোগ দেয়। একটি পর্যায়ে এসে দুজনকেই একত্রে দুটো অবৈতনিক স্কুল খুলতে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমানের একসঙ্গে শিক্ষাপ্রসারের একটি সামাজিক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি এখানে লক্ষ্য, একটি গল্পের কাঠামোতে এ বক্তব্যকে ধারণ করে রাখা হয়েছে। এ কে এম আবদুল ওয়াহেদের আজগুবী সত্যি ধারাবাহিক দীর্ঘ বিজ্ঞাননিবন্ধ। এতে পৃথিবীর জন্মকথা থেকে শুরু করে প্রাণী গাছপালা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের হোঁদল কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন[১৫] শিরোনামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ মনে করেছেন সম্ভবত আঙুর পত্রিকাতেই কাজী নজরুলের শিশুসাহিত্য সাধনার শুরু হয়ে থাকতে পারে।[১৬] নজরুলের এ কবিতাটি হাস্যরসাত্মক, যেমন,

মিছকে মারা কয়না কথা মনটা বড় খুঁৎখুঁতে,
ছিঁদ কাদুনে ভাবিয়ে ওঠে একটু ছুঁতে না ছুঁতে।
ড্যাবরা ছেলে ড্যাব ড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল-ফুলান্
সন্দেশ এবং মিষ্টি খেতে বাসরে্ বাস্ এক জাম্বুবান।

একই সংখ্যায় শ্রী বিমল মিত্রের কে বড় গল্পে নটবর মুখুজ্জ্যে ও লোচন দাস এক গ্রামের বাসিন্দা, নটবর ব্রাহ্মণ এবং লোচন দাস মুচি। কিন্তু নটবরের উচ্চ-নীচ বোধ সম্পর্কে উপলব্ধি হল এভাবে, 'নটবর তখন বুঝিলেন যে বাস্তবিকই মনের হিসাবে মানুষকে ছোট-বড় জ্ঞান করা উচিত, জাতির হিসাবে কিংবা বংশের হিসাবে নয়।' লেখক এখানে সামাজিক বাস্তবতার বাইরে এসে কেবল গুণের হিসাবে মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য শিশুদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আঙুর পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংঘাতহীন দৃষ্টান্তগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিকে কেউ কেউ মনে করেছেন আঙুর পত্রিকার আকর্ষণের মূল কারণ এবং এর পশ্চাতে ছিল প্রধানত সম্পাদকের নিজস্ব ধর্মনিরপেক্ষ রচনাবলি।[১৭] সমালোচকের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায়ন সম্ভবত সঠিক নয়, একে সম্পাদকের লিবারেল অবস্থান বলা যায়। আঙুরের মোট ভূমিকা দুদিকে বিস্তৃত, সামাজিক নৈতিকতাবোধগুলোর অগ্রায়ন এবং বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রসার, বিজ্ঞানচর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এ দুটোই প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বৃহত্তর শিশুশিক্ষার অন্তর্গত, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আসার ফলে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সৃষ্টিশীলতার প্রসার হয়েছে। লক্ষ্য শিশু হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই, দুয়ের পার্থক্য মুছে গেছে কিনা বলা

কঠিন তবে পার্থক্য উপেক্ষিত হয়েছে, ঠিক দৃশ্যমানভাবে সামনে আসেনি। সেদিক দিয়ে আঙুর পত্রিকা অগ্রসরমান লিবারেল সামাজিক চেতনার পরিপূরক, শিশুর স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে এবং তাদের সৃষ্টিশীলতাকে প্রসারিত করে চলমান সময়ে উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

শিশু সাথী (১৩২৯)

শিশু সাথী মাসিক শিশুতোষ পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৩০ সালে এর দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, এ সংখ্যা থেকে আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। সুতরাং অনুমিত হয় বৈশাখ, ১৩২৯ সালে এটা প্রথম প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে।

শিশু সাথী পত্রিকার বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩০ সালে ৩৯-১, কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়, প্রকাশক ছিলেন এ. ধর। এ সংখ্যার[১৮] প্রথম রচনা কবিতা, কবির নাম শ্রী অক্রুর চন্দ্র ধর, কবিতার নাম শিশু সাথী, এখানে পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।

জানতে পারি ঘুম পাড়ানী মাসীর বাড়ী কই
কেমন বুড়ী সে কাটছে সুতা চাঁদের ভিতর অই
মালনী-মাসির ঘরের ভিতর সুরং কোথা রয়
তোদের কাছে একে একে বলব সমুদয়।

কুমারী হিমালয়া বসুর মায়া রচনায় বলা হয়েছে, 'মায়ারূপ ধরা ঠাকুর তার ভালোবাসার ভেতরে নিয়ে মানুষের মায়া ছড়িয়ে দেন। তখন ভগবানের মায়া ও মানুষের মায়ার মিল হয়। ঐ দুই মায়ার মিলনে মহামায়া হয়। তিনি আমাদের মা ভগবতী।'

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের বঙ্গ বন্দনা কবিতাতেও কালিকা দেবীর প্রসঙ্গ এসেছে, যেমন,

বোধন এসেছ ভবে রোদন ঘুচাও তবে,
মানুষ কর মা সবে উঠিয়াছে ঝটিকা।
নমো নমো কালিকা।

একই সংখ্যায় শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের আবিষ্কারের কথা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা, শ্রী হরিপদ চক্রবর্তীর আলোকস্তম্ভ অনুরূপভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক। কুমারী কল্যাণীর সুপ্রভাব কবিতায়ও ধর্মীয় প্রসঙ্গ এসেছে,

নতুন দিনের নতুন গানে ভগবানের চরণ পানে
ছুটতে সে আজ চাইছে অবিরত।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গালী বীর প্রতাপাদিত্য রচনায় ইতিহাস অনুসৃত হয়নি, প্রসঙ্গত মোঘল-বিরোধিতাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। অক্রুর চন্দ্র ধর-এর শ্রাবণ[১৯] কবিতায় গঙ্গার পবিত্রতার প্রসঙ্গ এসেছে যেমন, 'ত্রিদিবের দেবী আয় সুরধুনী গঙ্গে।'

শ্রী জলধিলাল রায়ের জিজ্ঞাসা কবিতায় শিশু তার মাকে জিজ্ঞাসা করছে,

মাগো তোমার যখন জন্ম হল
আমার বয়স তখন কত ছিল?

এটা তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মকথা কবিতার সঙ্গে, যেখানে শিশু তার মাকে প্রশ্ন করছে 'এলেম আমি কোথা থেকে, কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'[২০] অক্রুর চন্দ্র ধর-এর স্টেশনে কবিতায় সরাসরি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। যেমন,

চাই চাই বেঙ্গলী মেরুপারে ইংরেজ
গান্ধীর বক্তৃতা নাগপুরে কংগ্রেস
মিশরের স্বাধীনতা-আলী ভাই বন্দী
এক আনা দাম বাবু কিনে নাও জলদী।

অনুরূপভাবে শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের খেলার নিমন্ত্রণ সমকালীন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। যেমন,

চারকা সুতা দিব তাঁতে
বুনব কাপড় আপন হাতে
সবার চেয়ে মজা হবে চরকা নিয়ে খেলা
ছুটাছুটি খেলব শেষে আসলে সাঁঝের বেলা।

শ্রীমতী হরিবালা দেবীর ভাই-বোন[২১] গল্পটি সমকালীন রাজনীতির ওপর স্থাপিত। শিশু মেয়েটির নাম মাধবী, ভাই নরেশ। মাধবীর পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত বিদেশি পুতুল তার ভাই নরেশ ভেঙে দিয়েছে বলে মাধবী ক্রন্দনরত। সংলাপ উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে,

'নরেশ কহিল, মা! বিলিতি জিনিস কেন মাধবী রাখে। স্বদেশী পুতুল কি নাই?

মা কহিলেন—বিলিতি জিনিস যে কেন বর্জন করা উচিত তা ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর পুতুলটি নিতে হয়।'

এর পর নরেশ তার জন্য কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত কারিগরের তৈরি অনেকগুলো মাটির পুতুল ও খদ্দরের কাপড় এনে দেয়। গল্পে মাধবীর প্রতিক্রিয়া এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তার 'আর স্কুলের কথা মনেই রহিল না।' তারপর নরেশের প্রস্তাব মোতাবেক দুজনে রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা গানটি গেয়ে উঠল।

এ গল্পে একটি মেয়েশিশু থাকলেও শিশুবিকাশের দিকটি দুর্বল, হয়তো নেই। শিশু একটি রাজনীতি অগ্রায়নের নিমিত্ত, শিশুতুল্য আচরণও করেছে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে মাটির পুতুল ও খদ্দর পেয়ে তার যে স্কুলের কথা মনে নেই এর মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বক্তব্যগুলো উপস্থাপিত হয়েছে।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ শাস্ত্রীর শারদীয় পূজা[২২] নিবন্ধের শেষ হয়েছে এভাবে, 'আমার প্রিয় শিশু সাথীর হিন্দু পাঠক-পাঠিকা—এই মূর্তির পূজা কর, এই মূর্তির ধ্যান কর।'

শিশু সাথী পত্রিকায় প্রচুর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ধর্মবিষয়ক ও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে। অনুমিত হয়, হিন্দুর সমাজ গঠনের ও সংস্কৃতি গঠনের জন্য এ পত্রিকা আগ্রহী ছিল, আব আর একালের বিজ্ঞানচেতনাকে অস্বীকার করতে পারেনি। ফলে দুয়ের মিলিতরূপে একটি হিন্দু ঐতিহ্যসচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গঠন করার বিষয়ে শিশু সাথী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, সমকালীন রাজনীতির সারকথাগুলোকে শিশুদের জানানো এবং সেভাবে শিশুদের গড়ে তোলার জন্যও শিশু সাথী দায়বদ্ধ ছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কথা প্রায়ই বিচ্ছিন্ন আকারে রয়ে গেছে, সময় গঠনের সঙ্গে তা নৈকট্য অর্জন করেনি। এ ধর্মকথা পরধর্মবৈর হয়নি বটে কিন্তু সহাবস্থানের ক্ষমতাও তা অর্জন করেনি। শিশু সাথী পত্রিকায় উপসংহার হিসেবে যে শিশু এসেছে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় সমকালীন কিন্তু পূর্ণ আলোকিত এবং মুক্ত চেতনালোকে সৃষ্টি করে তোলায় সমর্থ নয়। এ সময়ে শিশুদের আবিষ্কার করে তোলা ও গঠন করে তোলার বিষয়ে যে সকল সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক আগ্রহ সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছিল শিশু সাথী সেসবের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবস্থান করে এর সঙ্গে সুর মেলাতে পেরেছিল।

শিশু সওগাত (১৯২২)

শিশু সওগাত পত্রিকাটি এপ্রিল, ১৯২২ প্রথম প্রকাশিত হয়। বিশেষ সমস্যার কারণে কিছুকাল বন্ধ থাকার পর পত্রিকাটি জানুয়ারি, ১৯৩৮ পুনঃপ্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম শিশুদের উদ্দেশ্যে লেখেন,

তোর চোখে দেখিয়াছি রঙীন প্রভাত,
তোর তরে আজিকার নব সওগাত।[২৩]

শিশু সওগাতের তৃতীয় বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ থেকে আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। আমাদের প্রাপ্ত প্রথম সংখ্যায়[২৪] বেলায়েত হোসেনের ওমর ফারুক শিরোনামে হজরত ওমরের (রা.) জীবনী সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, এতে তাঁর শৈশবকথাও এসেছে। শব্দ প্রয়োগের কিছু অসর্তকতা কিংবা বিভ্রান্তিও আছে যেমন, 'ওমরের মত প্রজাবৎসল রাজা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।' রাজা শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়, হজরত ওমর (রা.) খলিফা ছিলেন কখনো রাজা ছিলেন না, রাজা-প্রজা শব্দের তাৎপর্যের সঙ্গে খলিফার মৌলিক পার্থক্য আছে। একই সংখ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ বসুর পৃথিবীর পরিমণ্ডল বিজ্ঞান নিবন্ধ। কুমারী জেবুন্নেসা বেগমের পাঁচ শতাব্দীর পরে নিবন্ধটি বিজ্ঞান ফিকশন এবং রূপকথার মিশ্ররূপে, অঙ্কণ বিদ্যায় অপটু শিশু গালিভারস ট্রাভেলস পড়ে স্বপ্নে কিভাবে পরিণত পৃথিবীর মধ্যে এসে উপনীত হয়েছে; ১৯৪০ সালে বসে ২০৪০ সালে পৌছে গেছে সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ফলে অঙ্কণ করাও সহজ হয়ে গেছে যেখানে কলম আপনা আপনি লেখে। রচনাটির লক্ষ্য শিশুকে বিজ্ঞানমনস্ক করে অঙ্কণের তত্ত্বীয় দিকের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক সৃষ্টি করে তোলা শিশুকে সম্ভাব্য পরিবর্তিত পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত করা।

বেগম সুফিয়া কামালের রামধনু একটি রূপকথার কাহিনীর একজন রাজার কনিষ্ঠ এবং কবি রাজপুত্রের সঙ্গে সাতজন পরীর ভ্রাতা-ভগ্নীসুলভ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত। শেষ হয়েছে এভাবে, 'আসলে ও রাজকুমারের পরী বোনেরা বৃষ্টির জল মুছিয়ে দিতে আঁচল এলিয়ে ভাবে রাজকুমার ভাইটির চোখের জল মুছায়।' রূপকথার কল্পনার বিস্তার থাকলেও এবং মানবসংসারের বাইরে হলেও ভাইবোনের স্নেহ সম্পর্কের ফলে তা অনেকখানি মানবসংসার ও সমাজের কাছাকাছি চলে আসে।

একই সংখ্যায় আনোয়ার হোসেনের রঞ্জন আলো বিজ্ঞান নিবন্ধ।

বেলায়েত হোসেনের রামমোহন রায়[২৫] নিবন্ধটি রামমোহন রায়ের জীবনকথা, তাঁর শৈশবের কথা, কীভাবে তিনি সতীদাহ নিবারণ করেছিলেন সে প্রসঙ্গ বর্ণিত। কুমারী শামসুন্নাহারের মেহনতের মূল্য বক্তব্যধর্মী রচনা, রূপকথার একজন রাজার গল্পের মধ্য দিয়ে মেহনতের গুরুত্ব প্রকাশিত করার প্রয়াস। রফিকুল ইসলামের এরোপ্লেনের জন্ম কথা এবং আনোয়ার হোসেনের ফুল নিবন্ধে এগুলোর সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করার প্রয়াস আছে।

মোহাম্মদ সোহরাব আলীর ন্যায়পরায়ণতা[২৬] নিবন্ধটি হজরত আলীর (রা.) ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী। একরামুল হকের বাংলার প্রাচীন রাজধানী[২৭] ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা। আনোয়ার হোসেনের চাঁদ ও প্যাঁচা কবিতায় চাঁদের সঙ্গে প্যাঁচার লোকপ্রিয় তুলনা এসেছে। আবুল কাসেমের খুকুরানীর গল্প মানুষের সঙ্গে জীবজন্তু ও পশুপাখিকে মিলিয়ে নিয়ে রূপকথার কাহিনী।

শ্রী সুনির্মল বসুর শিশু রবির প্রতি শিশুমহল কবিতাটির পাদটীকায় উল্লেখিত যে, কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্রজয়ন্তী, উৎসেব পঠিত। শিশুসাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিশুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এখানে প্রতিভাত, শ্মশ্রুমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেই তাঁর শৈশবে ফিরে শিশুর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন,

মোদের যত অভিভাবক বাবা জ্যাঠা খুড়ো
পাকা দাড়ির বহর দেখে তোমায় ভাবে বুড়ো,
ছদ্মবেশে যতই আঁটো বুড়োর মুখোশ খানা
তুমি শিশু চির কিশোর মোদের সেটি জানা।
বন্ধু রবি তোমার বয়স আশি বছর নাকি?
আমরা জানি আটের পিঠে শূন্যটি যে ফাঁকি।
আশির থেকে অনায়াসে শূন্যটি বাদ দিয়ে
আট বছরের সঙ্গী মোরা করব তোমার নিয়ে।

শিশু সওগাতের প্রায় সংখ্যাতেই প্রথম কবিতা শ্রী সুনির্মল বসুর, এ কবিতায় এবং অন্যান্য সকল কবিতাতেই পল্লিনিসর্গের পটভূমিতে শিশুর স্বপ্নভুবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কবি তাদের

আকাঙ্ক্ষার রূপকার হয়ে উঠেছেন। একই সংখ্যায় এম. আকবর আলির চাঁদ মামার দেশ বিজ্ঞান নিবন্ধ তবে চাঁদকে মামা সম্বোধনের মাধ্যমে চাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিসম্পর্ক স্থাপন করে।

কে.এম. শমসের আলীর গাঁয়ের ছেলে[২৮] কবিতায় পল্লিজীবন ও নিসর্গের পটভূমিতে রাখাল বালকের সুখময় অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে। যেমন,

গাঁয়ের ছেলে গো-পাল নিয়ে
মাঠেতে যায় কোন সে দূরে
দোয়েল শ্যামা শিস দেয় তার
বাঁশের বাঁশীর চিকন সুরে।

এর পরের সংখ্যায় প্রথম রচনার শিরোনাম রবীন্দ্রনাথ[২৯], লেখকের নাম নেই সুতরাং এটা পত্রিকার নিজস্ব নিবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ পশ্চাতে রেখে লিখিত হয়ে থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের কিছু কথা এখানে আছে, এ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। একই সংখ্যায় শ্রী ইন্দ্র সেনের অমর কবি রবি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ফলে অসময়ে ছুটি পেয়ে স্কুল থেকে ফেরা শিশুর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে,

খোকা বলে—মাগো আমার, দুখের কথা বলি,-
এই জগতের সেরা কবি রবি গেছেন চলি
অস্ত সাগর পারে,
তাই তো আমার নয়ন ঝরে আলোর শাওন-ধারে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সামাজিক প্রতিক্রিয়া শিশুর মধ্য দিয়ে বর্ণিত, কেননা রবীন্দ্রনাথ শিশুর প্রিয় অবস্থানে ছিলেন। আনোয়ারা চৌধুরীর তোমাদের রবীন্দ্রনাথ[৩০] প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে শিশুতোষ আলোচনা। মামুন মাহমুদের অমর রবীন্দ্রনাথ[৩১] ধারাবাহিক আলোচনা, এখানে রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোরকালের কথা আছে।

মৃত্যু হল ইহজাগতিক জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং শিশুর নিকট অপ্রিয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ সকল রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকথাকে প্রায়ই বিস্মৃত করে শিশুদের জীবনের দিকে ফেরানোর প্রয়াস আছে।

মোকসেদ আলীর চাষীর গান[৩২] কবিতায় পল্লিনিসর্গের পটভূমিতে কৃষকের জীবনকে মহিমান্বিত করা হয়েছে, এমনকি দারিদ্র্যও আদর্শায়িত হয়েছে। যেমন,

পরের মুখে ভাত জোগাতে আমরা থাকি ভুক্
পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া-সেইত পরম সুখ।

১৯৪৯ সালে শিশু সওগাত পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকায় মুসলিম ঐতিহ্যের কথা এসেছে তবে অমুসলমানের দ্বার উন্মুক্ত রেখেই। সেকারণে শিশুবিকাশের ক্ষেত্রটি এখানে বেশ প্রসারিত করে

তোলা হয়েছে, মুক্ত বিকাশের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। নাগরিক জীবনের পাশাপাশি এসেছে পল্লিজীবন, তবে মূল প্রবণতা নাগরিক জীবনের দিকে।
রূপকথার গল্পও এসেছে, সেগুলো প্রায়ই পরোক্ষে সামাজিক প্রসঙ্গের সঙ্গে মেশানো। শিশুবিকাশের সঙ্গে ইতিহাসজ্ঞান ও বিজ্ঞানবুদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

বার্ষিক শিশু সাথী (১৩৩২)

মাসিক শিশু সাথী পত্রিকার অনুরূপ বার্ষিক শিশু সাথী প্রকাশিত হয়। বার্ষিক শিশু সাথী সপ্তম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৯ খণ্ডটি শারদীয় বার্ষিকী, এ খণ্ডটি এবং ১৩৪৮ খণ্ডটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। এর সম্পাদক ছিলেন ডা. শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন। এ সংখ্যায় শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদের ভাই-বোন[৩৩] কবিতায় নবীজীর (স.) সঙ্গে তাঁর সইমা হালিমা কন্যার প্রসঙ্গ এসেছে, নবীজীর (স.) সঙ্গে সাক্ষাতের এবং পরিচয়ের পর তিনি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এর পরের রচনাটিই শ্রী রমেশচন্দ্র রায়ের শিশুদের আদর্শ এটা শ্রীকৃষ্ণের শৈশব সম্পর্কিত, রচনাটি শেষ হয়েছে এভাবে, 'এই গুলি যদি কেহ মনে গাঁথিয়া রাখিয়া সেই আদর্শমতে সারাজীবন চলিতে পারেন তবে তিনি দেখিবেন স্বাস্থ্যে ও মনের উন্নতিতে তিনি জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিবেন। প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়ের পক্ষেও এই আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য স্মরণীয় হওয়া চাই।'

শ্রী কুলদারঞ্জন রায়ের মহাদেব রচনায় গল্পের মধ্য দিয়ে মহাদেবের বিরাটত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস রয়েছে। শ্রী প্রকৃতিকুমার ঘোষের মানুষের জন্মকথা বিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনা এবং সভ্যতার ইতিহাস একত্রে, কিন্তু তথ্যের বিভ্রান্তি আছে। যেমন, 'এই সময় চিন্তাশীল মানব একাধারে সৃষ্টি করলেন বেদ উপনিষদ কোরান বাইবেলের মত গভীর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আর অন্যদিকে সৃষ্টি হতে থাকল শারীরিক সুখে থাকবার জন্য নানা রকমের যন্ত্রপাতি আর যানবাহন।'

তথ্যবিভ্রান্তির অংশ এখানে যে কোরান মানবসৃষ্ট নয়। আবার একই সঙ্গে এ রচনায় মানবকেন্দ্রিকতারও ইহজাগতিকতার প্রকাশ হয়েছে এভাবে, 'জীবন্তের এই ত লক্ষণ। যেদিন মানুষ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে জগতের এবং আত্মোন্নতির চেষ্টায় বিরত হবে—সেই দিন থেকে তার অবনতি আরম্ভ হবে, আর তাকে অন্য কোনো জীব জয় করে নিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলবে'।

বোঝা যায়, লেখকের উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে ইহজাগতিকতাবোধ সৃষ্টি কিন্তু তথ্যের বিভ্রান্তি তাকে সীমাবদ্ধ করে তুলেছে।

আমাদের প্রাপ্ত বার্ষিক শিশু সাথীর অপর খণ্ডটির প্রথম রচনা শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা মাঙ্গলিক,[৩৪] এখানে কবি বলেছেন,

বাঙলার শিশু বাঙলার শিশু সাথী
শ্রী ভগবানের স্নেহের পরশ পাক।

শ্রী অনিলবরণ রায়ের শ্রী অরবিন্দের জীবন-কথা প্রবন্ধে অরবিন্দের ধর্মীয় জীবনের দিকে গুরুত্ব পড়েছে। ডা. শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেনের শ্যামের অযোধ্যা প্রবন্ধে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে শ্যামদেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ কর-এর একালের মহাযুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রবন্ধের লক্ষ্য শিশুদের জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করা। এ সকল বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক বিশ্বের বিভিন্ন জটিলতার সঙ্গে যুক্ত, শিশুভুবনেও এগুলো প্রবেশধিকার অর্জন করেছে। ডক্টর শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের শিশু সাথী রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য করা যাবে মাসিক শিশু সাথী পত্রিকার সঙ্গে বার্ষিক শিশু সাথীর দৃষ্টিভঙ্গিগত কোনো দূরত্ব নেই, এখানেও ধর্ম ও বিজ্ঞান একত্রে এসেছে। লক্ষ্য পাঠক অবশ্যই শিশু এবং হিন্দু সমাজের শিশু, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের মূল্যবোধ ধারণ করে একত্রে বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গঠন উদ্দেশ্য, সেভাবে শিশুর বিকাশ আকাঙ্ক্ষিত হয়েছে। বার্ষিক শিশু সাথী পত্রিকার মোট উপসংহার হল পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রেখে হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে হিন্দু সমাজের শিশুর শিক্ষা। কেবল শিশু সাথী নয় সকল শিশু পত্রিকাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিশুভুবন গঠন করেছে তা সত্য।

কিশলয় (১৩৪৩)

কিশলয় পত্রিকাটি কলিকাতা কিশলয় পাবলিশিং হাউস থেকে বৈশাখ, ১৩৪৩ প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। কিশলয় সরাসরি শিশু পত্রিকা নয়, এর লক্ষ্য পাঠক ছাত্র ছাত্রী তরুণ তরুণী,[৩৫] তথাপি প্রায়ই তা কৈশোরের প্রান্তিক ছুঁয়ে গেছে। এখানে যৌবনের ঋষি-শ্রী রামকৃষ্ণ রচনাটিতে এবং পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বিস্তর রচনায় হিন্দু ধর্মের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রকাশিত। শ্রী রাধারানী দেবীর কিশোরদের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা কিশোর, কবি বলেন,

হে কিশোর! কহ কোথা তব গেহ
দিয়েছ যেথায় এত প্রীতি স্নেহ
আপন জনে?-
-"সারা জগতের সবখানে ঘর জানিয়ে মনে।"

শ্রী অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের খোকার পরামর্শ কবিতায় বাবার বকুনির কারণে মা মর্মাহত কিনা সে প্রশ্নের উত্তর শিশু নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছে, তোমায় নিয়ে বনে যাব, এতই কিসের ভয়? তারপর,

আমরা হব লব কুশ আর তুমি হবে সীতে।
দুই ভায়েতে দেশ মাতা রামায়ণের গীতে।
তার পরে বাবার সনে
সেই খানে সেই তপোবনে
ক্রুদ্ধ হয়ে বাধিয়ে দেবো যুদ্ধ আচম্বিতে।

এবং

বীরত্ব মোর দেখে

বাবা এসে নেবে কোলে যুদ্ধ ফেলে রেখে ।

সম্পূর্ণ সমকালীন হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পটভূমিতে স্থাপিত হয়েই রামায়ণ কথা শিশুর কল্পনাকে প্রসারিত করেছে, পারিবারিক জীবনচিত্রও সেভাবে পরিকল্পিত । রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের বীরপুরুষ কবিতায় খোকার মা পালকি থেকে নেমে খোকাকে চুমো খেয়ে কোলে নিয়েছিল, খোকার পরামর্শ কবিতায় যুদ্ধ ফেলে বাবা খোকাকে কোলে নিয়েছে ।

শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়ের শৈশবের পল্লীজীবন[৩৬] কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হতে দেখা যায় । এটা লেখকের শৈশবে পল্লিজীবনের স্মৃতিকথা, গ্রামীণ হিন্দু সমাজের দৃশ্য, স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুর ঐতিহ্য গুরুত্ব পেয়েছে । যেমন,

গণেশ ঠাকুর লেখকদের ওস্তাদ, ইঁদুর তাহার বাহন । সেই ইঁদুরের গর্ত্তোৎক্ষিপ্ত মাটির উপর হাতে খড়ি দিয়ে সেই হস্তাক্ষরে গণপতির আশীর্বাদ বর্ষিত হইত কিনা সেকথা জানিবার জন্য কোনও দিন কৌতূহল হয় নাই । একালে তাহা জানিবার উপায় নাই । কিন্তু সেকালে ঐরূপই প্রথা ছিল ।

অথবা,

আমাকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করা হইবে শুনিয়া গুরু মহাশয় ঠাকুরদাদাকে বলিলেন, ওরকম 'কুকম্মো' কখনো কোর্ব্বেন না দাদা । ইঞ্জিরী স্কুলের ছেলেরা শেখে কি? কেবল বাঘের আর বগের গপ্‌প, নাহয় হাঁস মুরগীর কেচ্ছা! না শেখে ছেলেরা গঙ্গার বন্দনা না বলতে পারে কৃষ্ণের শত নাম, আর তারা শুভঙ্করের ধার দিয়েও যায় না ।

গোপা দেবী শিশু[৩৭] শিরোনামে কবিতায় বলেন,

স্বর্গের অমৃত তুই

মরতের ফুল

সংসারে কিছুই নাই

তোর সমতুল ।

শিশুর তুলনাহীন পবিত্রতা এখানে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেছে । শ্রী বসুভূতি মুৎসুদ্দির বালক বীর[৩৮] শিরোনামে কবিতাটি মোঘলদের সঙ্গে চিতোরের যুদ্ধে একজন রাজপুত শিশুর বীরত্বকাহিনী, মোঘল-বিরোধিতার সঙ্গে যবন-বিরোধিতা সমার্থক হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই একজন শিশুর পবিত্রতা ও সাহসিকতা মধ্যস্থলে রেখে বাংলার বাইরের দৃষ্টান্ত নিয়ে কবি নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আসতে পারেননি ।

কিশলয় পত্রিকায় হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে শিশুকে যুক্ত করে রাখার প্রতি গুরুত্ব বেশি পড়েছে, তথাপি প্রকৃত শিশু যেহেতু প্রকৃত মুক্তির জন্যই তৃষ্ণার্ত ফলে কিশলয় পত্রিকায় হিন্দুত্ববোধ শিশুকে কোথাও কোথাও আঁকড়ে ধরে থাকলেও শিশুর মুক্ত বিকাশকে পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিতে পারেনি ।

কিশোরী (১৩৫৮)

'কিশোরী' প্রকৃতপক্ষে কিশোরীদের সচিত্র বার্ষিকী,[৩৯] এর সম্পাদিকা ছিলেন শ্রী সুধা দেবী, কলিকাতায় দি স্টুডেন্টস এম্পোরিয়াম থেকে এটা প্রকাশিত হয়। আশীর্বাদপত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তোমাদের শুভ কার্য্যে আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি।' কিশোরী বেশ গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে এখানে প্রকাশিত কবিতা গল্প সবই কিশোরী জীবন সম্পর্কযুক্ত। প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতীর মহামিলন গল্পে দুজন কিশোরীর জীবনচিত্র এসেছে যাদের বিকাশের মধ্যে একটি প্রতিতুলনা করে লেখক কিছু নীতিকথার উপসংহার সৃষ্টি করেছেন। কিশোরী দুজনের অন্যতম হল শুভ্রা ধনী দুহিতা এর বিপরীতে তাদেরই গৃহভৃত্য কিশোরী সতী, শুভ্রা স্কুল থেকে ফিরলে সতীকে তার সেবায় নিয়োজিত থাকতে হত। সতীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল স্কুলে পড়ার, এক সময় সে শুভ্রার মতো একই স্কুলে ভর্তিও হয়। সতীর সাফল্যে শুভ্রা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তাদের ভাগ্য বিপরীত হয়ে যায়, উত্তরকালে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সতীর নিকট থেকে শুভ্রাকে সাহায্য নিয়ে বাঁচতে হয়।

বোঝা যায়, উপসংহারটুকু প্রস্তুত করার জন্যই তাদের শৈশব সেভাবে পরিকল্পিত, তথাপি তাদের শৈশবের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখানে হিংসা ও পবিত্রতা পাশাপাশি এবং বিপরীতে স্থাপিত, পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত। বরং প্রতিতুলনার ফলে সতীর শৈশবের পবিত্রতার অংশটুকু সামাজিক দৃষ্টান্ত হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে এবং এরূপ হয়েছে শৈশবের সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ করে রেখে।

খেলাঘর (১৩৬২)

'খেলাঘর' পত্রিকাটি খেলাঘর কার্যালয়, ৯ নয়াপল্টন, রমনা, ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়, এর সম্পাদিকা ছিলেন বেগম জেব-উন-নিসা আহমদ।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে প্রজেশ কুমার রায় বেনজীর আহমদ নমিতা আনোয়ার গোলাম মোস্তফা ফররুখ আহমদ মুহম্মদ সফিউল্লাহ প্রমুখ রয়েছেন। বিভিন্ন সংখ্যায় যেমন তাঁদের লেখা ঘুরে- ফিরে এসেছে তেমনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত লেখকও এসেছেন।

প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা ফররুখ আহমদের বর্ষার গান[৪০] কবিতা, এখানে পূর্ব বাংলার নিসর্গের জন্য কবির নিবিড় ভালোবাসার প্রকাশ রয়েছে। অন্য একটি সংখ্যায় জহুরুল আলমের কাজের ছেলে[৪১] শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশিত হয় যেখানে জাহিদ নামে একটি ছেলের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, বাঁশির সুরের মধ্য দিয়েই প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পরে একই লেখক জহুরুল আলমের রূপের জন্ম[৪২] শিরোনামে আরেকটি লেখা পাওয়া যায়, এটা রূপকধর্মী। এখানে সত্য সুন্দর কল্যাণ তিনজন কিশোরতুল্য, তাদের সঙ্গে সংঘাত হয় দানবের। পৃথিবী হল

বদ্যি বুড়ি, দানবরা এ বদ্যি বুড়িকে বন্দি করেছিল। তিনি কিশোরের সঙ্গে সংঘাতে দানব পরাজিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটির বুকে, কিশোরেরা বিজয়ী হয়। এ তিন কিশোরের হাতে বন্দি পৃথিবীর মুক্তি এসেছে। লেখাটি শেষ হয়েছে এভাবে,

সারা দুনিয়া হাসছে, আকাশ-ভরা আলো বন্যায় শুচি হয়ে ওঠে সমস্ত মানব-মানবী। একদিক থেকে আর একদিকে শুরু হয় উৎসবের আয়োজন। শিশু কলরবে পৃথিবী মুখর হয়ে ওঠে, এমনি করে জন্ম হয় রূপের, জন্ম হয় সুন্দর পৃথিবীর।

লেখটি ঠিক শিশুতোষ নয় আবার শিশুতোষ যে নয় তা-ও নয়, তবে ইহজাগতিক পৃথিবীর নবজন্মের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কে ভাষা দেয়া হয়েছে। শিশুর রূপকধর্মী অবস্থানে অপর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ[৪৩] কবিতা, শিশুতীর্থের তুলনায় এখানে শিশুর অবস্থান রূপকের আরো কিছু গভীরে। তথাপি লক্ষণীয়, ইহজাগতিক এই পৃথিবীর ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করেছে এ শিশু, এ নবজাতক, সে অর্থে অসুন্দরকে পরাজিত করেই তাদের এ বিজয়মাল্য কিংবা বিজয়যাত্রা, তারা এ পৃথিবীর সত্য সুন্দর ও কল্যাণীয় ধারাবাহিকতার, মানবজাতির রূপময় অস্তিত্ব ও জীবনের প্রমাণ। ফলে শিশুর অবস্থান রূপকের মধ্যে থেকেও সর্বোচ্চ, শিশুর স্বাতন্ত্র্যচেতনাও প্রমাণিত। ইহজাগতিক মানবজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন সত্য সুন্দর ও কল্যাণকেই লেখক তিনজন মহাপ্রাণ আলোক শিশুর সঙ্গে তুলনীয় করেছেন, এ তিনটি অর্জনই একত্রে চির শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে মানবজীবনের মঙ্গলময় অস্তিত্বের ধারাবাহিকাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। একথা ঠিক যে সত্য সুন্দর কল্যাণ কোনো কায়াময় শিশুর অস্তিত্ব নয় যেরূপ শিশুর অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ কবিতায় আছে, তথাপি শিশুর প্রকৃত আনন্দময় সত্তা এগুলোর মধ্যে রূপান্তরিত ও স্থানান্তরিত হয়েছে। শিশুর সৌন্দর্যরূপের কল্যাণরূপের সত্যরূপের শিখরচূড় মুক্ত ধারণারই তা প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠেছে।

আজিজুর রহমানের মাতৃহারা[৪৪] কবিতায় শিশুবিকাশের একটি চমৎকার দিক উপস্থাপিত হয়েছে। ট্রেনের কামরায় ভিক্ষারত একজন অন্ধ ফকিরের হাত ধরে চলা মেয়ে-শিশুর নিকট কবির প্রশ্ন ছিল তার আর কে ভাইবোন আছে? অবনতমুখ মেয়েটির অন্ধ পিতাই মহাকালের নিকট বিশাল প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এর উত্তর দিয়েছে, 'আজকে কয়েকদিন/মা মরেছে। কার কাছে ও থাকবে বলে দিন?' কবি লক্ষ করেছেন,

ছোট মেয়ে মায়ের কথায়
উঠলো হঠাৎ কেঁদে
অশ্রুধারার বাঁধ বুঝি সে
রেখেছিল বেঁধে।

মাতৃহারা মেয়েটির ক্রন্দনে কবি অনুভব করেছেন, দুঃখের বর্ষাসজল মেঘ ঘনিয়ে এল তারায় ভরা রাতের আকাশ মলিন হল বেণুবনে ক্রন্দনরত ব্যাকুল বাতাসের মতো নিখিল ধরা অসীম বেদনাভারাতুর হল। কবির নিজের নিকটেই এ বেদনাভার অবিস্মরণীয় ছিল। আর্থিক

অসুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও রুগ্‌ণ মাতা ও অন্ধ ভিখারি পিতাকে নিয়ে এ মেয়ে-শিশুটির একটি পারিবারিক জীবন ছিল, বিপুল আর্থিক সমস্যার মধ্যেও তার বিকাশ প্রতিহত ছিল না। মায়ের মৃত্যু তার উপলব্ধি কাঠামোকেই বিচূর্ণ করে দিল। মাতৃস্নেহের মধ্যে এবং পরিবার-জীবনের মধ্যে যে শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ, এটা থেকে বঞ্চিত হলে একজন অন্ধ ভিখারির কন্যারও যে মুক্ত বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তা এখানে প্রমাণিত। মা মরেছে, কার কাছে ও থাকবে বলে দিন? প্রশ্নের মধ্যেই একদিকে আছে কৈফিয়ৎ কেননা মায়ের মৃত্যুর কারণেই শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়েছে, অপর দিকে মহাকালের নিকট মৃত্যুর নিকট বিশাল প্রশ্ন সে এখন কার কাছে থাকবে, এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? গোটা উপলব্ধি ইহজাগতিক, মাকে মৃত্যুর হাত থেকে শিশুকন্যা বাঁচাতে পারেনি বলে সে ভাসমান কিন্তু সে কারণে ক্ষুধা তাকে মুক্তি দেয়নি। অবুঝ শিশুকন্যা বুকভরা ক্রন্দন নিয়ে ইহজাগতিক এই পৃথিবীতে ক্ষুধার দাসত্বের নিকট পরাজিত হয়ে অন্ধ পিতার হাত ধরে অনেক প্রশ্ন নিয়েই ট্রেনের কামরায় এসেছে। ক্ষুধার নিকট পরাজয়ের প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাত আটটার তারায় ভরা আকাশের নিকট প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত করেছিলেন, আকাশকে বিদীর্ণ হতে বলেছিলেন।[৪৫] কবি আজিজুর রহমান এ মেয়ে-শিশুটির দুঃখে প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করেন, কবির স্মৃতিতে এটা বিলীন হয়ে যেতে পারেনি।

নমিতা আনোয়ারের ভোলা মাস্টার[৪৬] গল্পে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে প্রথম প্রজন্মের সঙ্গে তৃতীয় প্রজন্মের শিশু নাতির স্নেহ-সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া যায়। ভোলা মাস্টারের নাতনি মেয়ে-শিশু, বাড়িতে নেই বলে মাস্টারের গোটা কর্মবৃত্তই বদলে গেছে। তিনি সবই ভুলে যাচ্ছেন, শিশু নাতনি তাকে গুছিয়ে মনে করিয়ে দিত। শিশুর সঙ্গে বৃদ্ধ দাদুর স্নেহসম্পর্কের মধ্যেই ছিল দাদুরও সৃষ্টিশীলতা। হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে ভুলে যাবার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও একান্ত পারিবারিক জীবনকাঠামোতে শিশুর অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে, শিশু নিজে কেবল নয় পরিমণ্ডলটিকেও যে সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে তা এখানে প্রমাণিত।

ফররুখ আহমদের ঈদগা হবে দুনিয়াটা[৪৭] কবিতায় ঈদ আনন্দের এবং ঐক্যসৃষ্টির সমার্থক। একই সংখ্যায় হাসিনা আহমদের পঁচিশে বৈশাখ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শৈশব এবং তাঁর শিশুসাহিত্য আলোচিত। সুধীরকুমার কুণ্ডুর ছোটদের নজরুল প্রবন্ধে শিশুসাহিত্যে নজরুলের অবদান আলোচিত হয়েছে। শিশুদের জগৎকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো উপস্থাপিত।

খেলাঘর পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্পাদকীয়তে[৪৮] পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত হয়েছে এভাবে, 'কিশোর বয়সে পড়াশুনা ছাড়াও তোমরা যাতে চিন্তার খোরাক পাও, মনের দোসর পাও, কাজের সঙ্গী পাও, দেশ বিদেশের গল্প, বিজ্ঞানের কথা হাতের কাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে যাতে তোমরা জ্ঞান লাভ করতে পারো সেদিকে নজর রেখে আমরা যতদূর সম্ভব খেলাঘরকে সাজাতে ত্রুটি করিনি।' এ পত্রিকার প্রতিশ্রুতি আন্তরিক, এগুলো প্রতিপালিত যে হয়েছে পত্রিকা পাঠ করলে তা প্রমাণিত হয়।

নূরন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর আমার ছোটবেলার জীবন[৪৯] স্মৃতিকথামূলক, আত্মজীবনীর অংশ, পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁর গ্রামীণ শৈশবকথা বর্ণনা করেছেন। একটি বয়স পর্যন্ত মেয়ে-শিশুর জন্য মুক্ত পৃথিবী ছিল,

কিন্তু আর একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হতে হলো। খানদানী ঘরের রেওয়াজই ছিল এই। এমন কি বাড়ীর সদর দরজা মাড়ানও বন্ধ।

অথবা,

ভাইয়েরা ওস্তাদের কাছে তাদের পড়া শেষ করে স্কুলে যায়। বাড়ী থাকলে তাদের সাথে খেলাধূলা করি। ঝগড়া করি, মারামারিও যে হোত না তা নয়। খেয়ে দেয়ে বই খাতা নিয়ে ওরা বাড়ীর বার হয়। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উদাস মনে চেয়ে থাকি আমি, তাদের গমন পথের পানে।

ছেলে-শিশু ও মেয়ে-শিশুর মধ্যেকার পার্থক্য এখানে লক্ষণীয়। সেই মুহূর্তে, শৈশবে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মেয়ে-শিশুটিই পরে প্রখ্যাত সাহিত্যিকে পরিণত হয়েছিলেন। এরূপ দৃশ পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে সেখানেই থেমে নেই, তবে গ্রামীণ জীবনের সীমাবদ্ধতা[৫০] এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা এর সঙ্গে তুলনীয় নয়।

বানী গুপ্তার কিশোর নবাব[৫১] একটি ক্ষুদ্র নাটিকা, সিরাজদৌলার কিশোরকাল নিয়ে রচিত। কয়েকটি চরিত্রের সংলাপ উপস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নবাবের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্য[৫২] প্রবন্ধটি শিশুতোষ মোটেই নয়, শিশুসাহিত্য কী এবং কীভাবে তা এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

খেলাঘর পত্রিকায় পাকিস্তান রাষ্ট্রাদর্শের মধ্যে শিশুদের নিয়ে আসার লক্ষ্য ছিল না তা নয় তবে সময়ের জন্য শিশুদের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজন সামনে ছিল। এ সময়ও কেবল পূর্ব বাংলায় স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল না, একটি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলেও তা উন্মোচিত ছিল। ফলে শিশুধারণা গঠনের ক্ষেত্রটি বেশ প্রসারিত ছিল। প্রচুর সমাবেশ এখানে হয়েছিল খেলাঘর পত্রিকা নতুন-পুরাতন সকল লেখককেই উষ্ণ ক্রোড় দিয়েছিল বলে প্রখ্যাত লেখকদের অনেকেই শিশুসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। এসব লেখকের মিলিত প্রয়াসের ফলাফল হিসেবেই খেলাঘর পত্রিকার নিজস্ব কণ্ঠস্বর সৃষ্টিপ্রাপ্ত ছিল। এ কণ্ঠস্বর ছিল শিশুর স্বতন্ত্র ও মুক্ত বিকাশের অনুকূলে পূর্ব বাংলায় সমকালীন সমাজ কিভাবে শিশুকে পেতে চেয়েছিল এখানে তার অনেকখানি পরিচয় মিলবে।

সবুজপাতা (১৯৬২)

সবুজপাতা ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা, ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক ৬৭ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে আগস্ট, ১৯৬২ প্রথম প্রকাশিত হয়, শাহেদ আলী এর সম্পাদক ছিলেন। প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে ফররুখ আহমদ ইবরাহীম খাঁ মঈনুদ্দীন তালিম হোসেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মোহাম্মদ নাসির আলী আহসান হাবীব ইবনে আসাদ আবদুল হাই মাশরেকী মতিনউদ্দীন আহমদ প্রমুখ রয়েছেন। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে সুফিয়া কামাল বেনজীর আহমদ জসীমউদ্‌দীন রওশন ইজদানী প্রমুখ লেখকের প্রচুর রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

সবুজপাতা পত্রিকার[৫৩] প্রথম রচনা কবিতা, শিরোনাম সবুজপাতা, রচয়িতা ফররুখ আহমদ। শেষের কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ।

সবুজ তনু গাছের পাতা আনে প্রাণের বান,
সবুজ হরফ লেখে খোদার কীর্তি অফুরান,
সবুজপাতা যায় দিয়ে ভাই ইশারা খোদার
মালিক যিনি এই দুনিয়ার নাইরে শরীক যার
তামাম আলম জাহানে যার সৃষ্টি কুশলতা
নতুন ডালে সবুজপাতা কয় যে তারি কথা।

ফররুখ আহমদ আস্তিক্যবাদী ছিলেন এ কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে। সবুজপাতা পত্রিকার উদ্দেশ্যের সঙ্গে এরূপ উপলব্ধি সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে যদিও সবুজপাতা পত্রিকার লক্ষ্য সম্পর্কে এরূপ কোনো অভিপ্রায় সরাসরি প্রকাশিত আকারে নেই। এ সংখ্যাতেই সবুজ কাঁচাদের প্রতি দুটো কথা শিরোনামে বলা হয়েছে,

সবুজপাতার প্রতি সংখ্যায়ই থাকবে এসব জীবনী, কাহিনী আর কতো রকমের গল্প-মানুষ তৈরির পাঠ। খেলতে খেলতে শেখার মতো পড়তে পড়তে যাতে তোমরা আগামী দিনের জন্য তৈরি হতে পারো—তোমাদের জন্য আমরা সে আয়োজনই করেছি। সবুজপাতার স্নিগ্ধ ছায়ায় তোমাদের সবাইকে খোশ আমদেদ জানাই।

পরবর্তী অন্য একটি সংখ্যায়[৫৪] প্রথম কবিতার শিরোনাম সবুজপাতা, রচয়িতা বেগম সুফিয়া কামাল। সুফিয়া কামালের উপলব্ধি ফররুখ আহমদের তুলনায় পৃথক। যেমন,

শরৎ প্রাতে শিশির ভেজা
সবুজপাতা শিরশিরিয়ে
ঘুম ভাঙাতে গায় যে গান
রোদের আলোয় ঝিরঝিরিয়ে।

সবুজপাতা পত্রিকা এর লেখকদের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে তোলেনি, ফররুখ আহমদ ও সুফিয়া কামালের কবিতা দুটো প্রকাশিত হওয়া থেকে তা বোঝা যায়। তথাপি ইসলামিক একাডেমীর পত্রিকা হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্ব পড়েছে, লেখকেরা তাদের স্বাধীনতা নিয়েই এখানে যুক্ত থেকেছেন বলে মনে হয়।

বেগম সুফিয়া কামালের অপর একটি কবিতা স্বাধীনতা প্রাণের চেয়ে বাড়া-[৫৫] পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে লিখিত। কবি বলেন,

স্বাধীনতা! প্রাণের চেয়ে বাড়া
পরের দেওয়া সোনার খাঁচা ভেঙ্গে গুঁড়ো করা
মুক্ত আলোকে পেয়ে
বেঁচে উঠুক স্বাধীন দেশের স্বাধীন ছেলেমেয়ে ।

ইংরেজের ঔপনিবেশিকতার বিপরীতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা স্থাপিত, ষাটের দশকের শুরুতে কবির নিকট পাকিস্তানের এ স্বাধীনতা অনাদর্শিক মনে হয়নি । সুফিয়া কামালের অন্যত্র প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতায়ও এরূপ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আছে । কবির নিকট শিশু-কিশোরের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা কাম্য ছিল কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বকালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা ও জটিলতাগুলো কবির নিকট তখনো উন্মোচিত হতে বাকি ছিল । সবুজপাতা পত্রিকাটি ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের মাসে প্রকাশিত হয়, এখানে ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতায় এ স্বাধীনতার কথা আসেনি । এটা কোনো ব্যতিক্রম ছিল না, কেবল সুফিয়া কামাল নয় অন্যান্য লেখকের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য । এ কারণে শিশুদের জন্য ইহজাগতিক কল্যাণ কামনায় তাদের কোনো সীমাবদ্ধতা আসেনি ।

বেনজীর আহমদের অগ্রপথিক কায়েদ আজম[৫৬] প্রবন্ধে জিন্নাহ যে প্রকৃতই ধর্মপ্রাণ ছিলেন তা প্রমাণ করার প্রয়াস আছে । হেদায়েত হোসেইন মোরশেদের মোঘল হারেমের কৃতি মহিলা[৫৭] প্রবন্ধে বাবরের কন্যা গুলবদন, হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী সালিমা বেগম, আকবরের দাইমা মহম আল্‌কা, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা সম্পর্কে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে ।

জসীমউদদীন খোকন সোনা[৫৮] কবিতায় বলেন,

কোন কথাতে জাগবে তুমি রাত্রি হলে ভোর
সারা জনম খুঁজব আমি সেই কথাটির ডোর ।

সবুজপাতা পত্রিকায় ইসলামী ঐতিহ্য, মুসলমানের কথা স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে তবে শিশু বিকাশের কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে । ইসলামের জন্য আগ্রহের কারণে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা বিরোধ প্রদর্শিত হয়নি, বিজ্ঞানকথাও বিস্তর এসেছে । এরূপ একটি মিশ্রণ থাকার ফলে সবুজপাতা পত্রিকার মোট ভূমিকা হয়েছে ইসলাম ধর্মের আলোকে মুসলমান সমাজের মধ্যেই শিশুর প্রতিবন্ধকতাহীন মুক্ত বিকাশকে সৃষ্টি করে তোলা তবে মুসলমান সমাজের অনুসরণীয় মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করে রেখে । এর অর্থ যে ইহজাগতিকতাবোধের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা নয় তবে ইসলামে ইহজাগতিক জীবনকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, পার্থিব দায়িত্বগুলোকে যেভাবে আরোপিত করা হয়েছে তার মধ্যে সমকালীন বিজ্ঞানবুদ্ধিকে যুক্ত করে এরূপ ধারণার সৃষ্টি ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে । সেদিক দিয়ে সমকালীন শিশুধারণার সঙ্গে সবুজপাতা কোনো ব্যতিক্রম

নয় বরং তা একটি ভিন্নতর সংযোজন, মূল প্রবাহকে গতিময় করে তুলতে তা পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছে মাত্র ।

কচি ও কাঁচা (১৩৭১)

কচি ও কাঁচা ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কেন্দ্রীয় কচি কাঁচার মেলার মুখপত্র হিসেবে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ প্রথম প্রকাশিত হয়, এর সম্পাদক ছিলেন রোকনুজ্জামান খান । প্রথম সংখ্যায় একটি উপদেষ্টামণ্ডলীর নাম পাওয়া যায়, পরে এ উপদেষ্টামণ্ডলী আরো সম্প্রসারিত হতে দেখা যায় । প্রথম সংখ্যায় লেখকদের অন্যতম হলেন সুফিয়া কামাল মোহাম্মদ নাসির আলী আহসান হাবীব আবদুল্লাহ আল মুতী ফয়েজ আহমদ এখলাসউদ্দিন আহমদ শাহ ফজলুর রহমান কাজী লতিফা হক প্রমুখ এবং নতুন কলমের লেখকদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভূঁইয়া মো. ইকবাল সিদ্দিকা মাহমুদা লায়লা আর্জুমান্দ বানু জাহানারা খাতুন মো. আলী ইমাম প্রমুখ । এরা অনেকেই বিশ শতকের শেষদিকে খ্যাতিমান ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক হয়েছেন ।

কচি ও কাঁচা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা সুফিয়া কামালের কচি কাঁচার মেলা,[৫৯] কবি বলেন,

এই মাটির এই ধূলার মাঝে ওরা ছড়ায় সোনা
ধূলা-কাদায় আছাড় খেয়ে, করছে আনা গোনা
পায়ের তলায় গড়িয়ে নিয়ে পথ
আঁধার কেটে আলো এনে চালায় ওদের রথ ।

প্রতীকী রথে আরোহিতা শিশুর সম্ভাবনাময় ইহজাগতিক জীবন অভিনন্দিত হয়েছে ।

মোহাম্মদ নাসির আলী লিখেছেন, 'যদি কখনো সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যাও করাচীর ক্লিফটনে বা চট্টগ্রামের কক্সবাজারে তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হলে ছিপি আঁটা একটি বোতল দেখতে পাবে সেখানে ।'

পৃথিবীর অন্য কোনো সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে না নিয়ে লেখক শিশুদের যে ক্লিফটন থেকে কক্সবাজারে নিয়েছেন সেখানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো পেছনে দাঁড়ানো, লেখকের গন্তব্য যেখানে ছিল শিশুদের তা অতিক্রান্ত করে তোলা হয়নি ।

আহসান হাবীব মেলা কবিতায় ভাইবোনকে একত্রে নিয়ে এসেছেন,

আর এক মেলা জগৎ জুড়ে
ভাইরা মিলে বোনরা মিলে
রঙ কুড়িয়ে বেড়ায় তারা
নীল আকাশের অপার নীলে ।

রোকনুজ্জামান খানের স্বাক্ষরিত একটি সম্পাদকীয়তে[৬০] উল্লেখ করা হয়,

২৫শে ডিসেম্বর আমাদের প্রিয় নেতা কায়েদে আজম আর দশটি শিশুর মতই জন্ম নিয়েছিলেন মাটির পৃথিবীতে। অনেক সাধনা আর অধ্যবসায়ের পর তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তান। আমাদের দেশের শিশুরা দেশের খাঁটি নাগরিক হয়ে গড়ে উঠুক, পাকিস্তান শান্তিময় সুখী রাষ্ট্রে পরিণত হোক—কায়েদে আজমের জন্মদিনে এই আমাদের প্রার্থনা।

একই সংখ্যায় নতুন কলম নতুন লেখায় কিশোর কবি বাসুদেব-এর আহ্বান কবিতা পাওয়া যাচ্ছে যেখানে,

সকল দেশের সেরা হবে
মোদের পাকিস্তান
মিলে মিশে রইবো সবাই
হিন্দু-মুসলমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র সাত বছর আগে কচি ও কাঁচা পত্রিকায় এভাবে শিশুবিকাশের আদর্শ সৃষ্ট হতে পেরেছিল, সমকালীন বিষয়ের সীমাবদ্ধতাগুলো ছিল এখানে।

শামসুর রাহমানের শিশুতোষ রচনা প্রধানত শিশু পত্রিকাকে কেন্দ্র করে, কচি ও কাঁচা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যাতেও সেসবের দৃষ্টান্ত মিলবে। যেমন একটি ছড়া,[৬১]

হাজার টাকা মাসে
কামার ঘরে বসে
অশ্বডিম্ব এঁকে
নাজির হুসেন এ.কে।

অথবা, ক্ষুধা শিরোনামে অপর একটি ছড়ায়,

দারুণ এক খিদের তাড়ায়
লোকটা ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়।
ডিআইটি টাও হচ্ছে কাবার।
লোকটা বসে খাচ্ছে খাবার।

ছড়াটি ঈষৎ তুলনীয় অনেক পরবর্তীকালে সেলিম আল দীন রচিত এবং বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘকাল মঞ্চস্থ নাটক মুনতাসির ফ্যান্টাসী-এর সঙ্গে, এখানেও ক্ষুধার এরূপ একটি রূপক চিত্র আছে। মুনতাসির ফ্যান্টাসী-এর রূপকের পশ্চাতে চুয়াত্তর-পঁচাত্তরের দুর্ভিক্ষ ও রাজনীতি-কথা থেকে থাকতে পারে, শামসুর রাহমানের ক্ষুধা রচনার পশ্চাতে এরূপ কিছু কি ছিল? শিশুতোষ ছড়ায় নির্মল আনন্দের সঙ্গে কিছু বক্তব্য জমেছে বোঝা যায়। শামসুর রাহমানের আরো অনেক ছড়া ও কবিতা এ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

মোহাম্মদ মোদাব্বেরের জন্মবিদ্রোহী নজরুল[৬২] প্রবন্ধে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। আরো পরবর্তীকালে একটি সংখ্যায় সুফিয়া কামালের রূপকথা নয়[৬৩] কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা উপস্থাপিত হয়েছে,

রূপকথা নয় রূপকথা নয় কোনো
সত্যি কথাই শোনো,
এক কালে এক ছিল যে এক দামাল
ভয় করত রাজা রাজড়া বলত সামাল সামাল।

কচি ও কাঁচার বিভিন্ন সংখ্যায় খ্যাতনামা আরো যারা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সরদার ফজলুল করিম সাজেদুল করিম রাবেয়া খাতুন সিকানদার আবু জাফর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ শামসুল হক রাহাত খান হাবীবুর রহমান আবদুল্লাহ আল মুতী প্রমুখ অন্যতম।

কচি ও কাঁচা পত্রিকার মোট ভূমিকায় তেমন কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখানে প্রকাশিত লেখাগুলোর দুটো উদ্দেশ্য, শিশুদের আনন্দ দান এবং শিশুদের জীবন গঠন করা। এ জন্য তাদের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন ক্লান্ত পূর্বানুবৃত্তির বাইরে সৃষ্টিশীল দৃষ্টান্তের মধ্যে শিশুশিক্ষার পুনর্গঠন করা তবে আনন্দের বাইরে যেয়ে অবশ্যই নয়। এরূপ একটি লক্ষ্য থেকে থাকার ফলে এবং তার গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিকতা সৃষ্টি হবার ফলে তা একত্রে শিশুবিকাশের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছে।

সামগ্রিকভাবে শিশুধারণা বিকাশে কচি ও কাঁচার ভূমিকা অনেক তবে এটা সমকালীন বিভিন্ন সামাজিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার বাইরে আসতে পারেনি। এরও কারণ হয়তো এখানে যে এ সাহিত্য সমকালীন জীবনঘনিষ্ঠ ছিল এবং নিবিড়ভাবেই ছিল। জীবনের মধ্যে মুক্ত আকাশ যেখানে যেটুকু ছিল সেখানে শ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিল কিংবা প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল বলে সুন্দরের পশ্চাতে অসুন্দরের ছায়াটুকু বিযুক্ত করে চলতে পারেনি।

মুকুল (১৩৭১)

মুকুল পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা চৈত্র ১৩৭১ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের অর্থানুকুল্যে শিরিন প্রেস এবং ৩২ মোগলটুলী ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হোসেন কামাল। পত্রিকার একটি উপদেষ্টামণ্ডলীর নাম পাওয়া যায়। মুকুল প্রথম সংখ্যায় লেখকদের অন্যতম হলেন হোসনে আরা মোহাম্মদ নাসির আলী জসীমউদদীন জাহানারা আরজু মাফরুহা চৌধুরী নজরুল হক বদরুল হাসান গোলাম রহমান সাজ্জাদুর রশীদ সুকোমল বসু সুবোধ দাশগুপ্ত মঈনুদ্দীন প্রমুখ। পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যায় সুফিয়া কামাল মীজানুর রহমান মোহাম্মদ মোদাব্বের আতোয়ার রহমান সিকানদার আবু জাফর এবং আরো অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকের রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

পাক্ষিক মুকুল থেকে রূপান্তরিত মাসিক মুকুলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকের দপ্তর শিরোনামে বলা হয়, 'পাক্ষিক মুকুল পুরোপুরিভাবে শিশুসাহিত্য পত্রিকা ছিল না, কিন্তু এখন থেকে এই পত্রিকা পুরোপুরি কিশোর সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বের হবে।'[৬৪] সুতরাং শিশু মাসিক পত্রিকা হিসেবে মুকুল পত্রিকার নবজন্ম বলা যায়, প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায়ও তা লক্ষ করা যাবে। এ সংখ্যায় মোহাম্মদ নাসির আলীর বাকপটুতা হল ইরান দেশের গল্প, বাদশা নওশেরওয়াঁ এক বৃদ্ধকে তার সভ্যভাষণের জন্য পুরস্কৃত করেন সেই কাহিনী। শিরীন বেগমের বিপ্লবী তীতুমীর ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তীতুমীরের কথা গল্পাকারে বর্ণিত। জাহানারা আরজু'র ফুটল মুকুল কবিতাটিতে মুকুল পত্রিকার উদ্দেশ্য এভাবে বলা হয়েছে,

রূপ কাহিনীর গল্পগুলো
বইয়ের পাতায় বন্দী হোল
এবার বুঝি ডাক দিয়েছে
তেপান্তরের মাঠ,
পায়ে হেঁটেই হবে যে পার
দুর্গম পথ ঘাট।

মাফরুা চৌধুরীর এ্যান্ডারসনের গল্প রূপকথার পুনঃপরিবেশন এবং সাজ্জাদুর রশীদের পূর্ব পাকিস্তানের ভূতাত্ত্বিক পটভূমি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা। শিরিন বেগমের মহাকবি ও সূফী শেখ সাদী[৬৫] প্রবন্ধে শেখ সাদী সম্পর্কে একটি লোকপ্রিয় কাহিনী পুনঃপরিবেশিত হয়েছে। মুফাখখারুল ইসলামের ঈদের খুশী প্রকৃতপক্ষে ঈদের আনন্দ ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সীমিত কিছু চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র নাটিকা। আবদুল গণি হাজারীর টু আরর ইজ হিউম্যান ভুল করার ওপর একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ। মঈনুদ্দীনের একটি রাজহাঁসের কাহিনী পশুপাখিদের নিয়ে রূপকথার কাহিনী হলেও একটি তত্ত্বীয় উপসংহার আছে। যেমন,

হাঁস কহিল, না ভাই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া কি অন্য কোথাও বেশী দিন থাকা যায়? নিজেদের বাড়ী—তার জন্য মন কেমন হবে না? ওখানে খাওয়া পাওয়া ভারী সুবিধা।

অথবা,

হাঁস কহিল, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে চল। মানুষের কাছাকাছি কোন গাছে থাকাই ত সুবিধা। সেখানে তোমাদের সকলেরই আহার পাওয়া যাইবে। এখানে এই ফাঁকা মাঠে তোমরা থাক বটে, কিন্তু আহারের খোঁজে তো সেই মানুষের বাড়ী, তাহাদের আনাচে কানাচে যাইতে হয়।

অথবা,

বাড়ী ফিরিয়া হাঁস আর মুরগী ভারী খুশী। তাহারা আনন্দে বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়ায় আর খেলা করে। পাখীরা এ বাড়ীর আমবাগানে গাছের ডালে ডালে খুশীতে লাফালাফি করে।

হাঁস-মুরগি গৃহপালিত বটে তবে পাখিজগতের সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বের একটি বিজ্ঞানসম্মত পারস্পরিক নির্ভরতা এ রূপকথার মধ্য দিয়ে বর্ণিত। শিশুর সামনে সৌহার্দ্যময় জগতের অস্তিত্ব উন্মোচিত হয়েছে যেখানে শিশুর মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হতে পারে। রূপকথা হলেও তা মানুষের ঐহিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে এবং নিবিড় নিসর্গবেষ্টিত গ্রামীণ গৃহস্থালির পরিম-লের মধ্যে চলে এসেছে– এখানেই এর বিশেষত্ব।

সাজ্জাদুর রশীদের আদিম মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতা[৬৬] প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ, এটা শিশুদের জ্ঞান বিকাশের পরিপূরক। রাজিয়া মাহবুবের মিনু তাতারের কহিনী রূপকথাতুল্য গল্প, এখানে প্রমাণ করার প্রয়াস হয়েছে যে গাছেরও প্রাণ আছে। সুফিয়া কামালের আজাদী দিনে[৬৭] কবিতায় কবি পাকিস্তানের আজাদী দিবসে তাঁর অন্তরের আনন্দের সংবাদ দিয়েছেন,

পাকিস্তানের জন্ম দিনে নতুন করে
আনন্দে মন উঠছে ভরে
তোরণ সাজায় ফুলে ফুলে মন
আজাদ পাকিস্তান।

একই সংখ্যায় মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহর আমাদের আজাদীর ইতিহাস প্রবন্ধে সাতচল্লিশের স্বাধীনতাকে দেশবিভাগ বলা হয়েছে এবং বাংলার বিভাগের জন্য হিন্দুদের দায়ী করা হয়েছে। মোহাম্মদ নাসির আলী কায়েদে আজমের সততা[৬৮] প্রবন্ধে জিন্নাহর চরিত্রের বিশেষ সততার দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, নাকি জিন্নাহ সততার প্রশ্নে রাজনৈতিক মুনাফাকেও গৌণ করে তুলেছিলেন। পাকিস্তানের গান[৬৯] কবিতায় সুফিয়া কামাল বলেন,

মোদের সোনার পাকিস্তান
অনেক সাধের পাকিস্তান.....
পূর্ব্ব দেশের সূর্যের আলো পশ্চিমে যায় লয়ে
মুখের ভাষা মনের আশা গানে যে সুর হয়ে
বাতাস ছড়ায় ভুবন ভরি ফুল ফসলের ঘ্রাণ
অনেক সাধের পাকিস্তান।

বোঝা যায়, কবিতাটি পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। সূর্যোদয় পূর্ব দিগন্তে এবং তার অস্ত পশ্চিম দিগন্তে, কবি অনুভব করেছেন একই সূর্যের আলো পাকিস্তানের পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করেছে। পূর্ব বাংলায় শিশুদের সামনে এ বন্ধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে তিনি ভোলেননি।

মুকুল পত্রিকায় পরেও এসবের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। সুতরাং মুকুল পত্রিকার দুটো দিক, এক, পাকিস্তান রাষ্ট্রের এবং মুসলিম ঐতিহ্যের ধারণাকাঠামোর মধ্যে শিশুবিকাশের অবকাশ, দুই. এগুলোর বাইরে যেয়ে শিশুবিকাশের মুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি, তবে সর্বমোট বিচারে প্রবণতা ছিল

প্রথমটির দিকে, কেবল মুকুল নয়, পাকিস্তান আমলে কোনো শিশু পত্রিকাই এরূপ বৃত্তের বাইরে খুব একটা আসতে পারেনি। কারণ ছিল না তা নয়, পত্রিকাগুলো ছিল নগরকেন্দ্রিক এবং শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনকেন্দ্রিক, ফলে স্থাপিত মূল্যবোধের এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতি-উপলব্ধির বাইরে আসার সমস্যা ছিল অনেক। আরো লক্ষণীয়, সুফিয়া কামাল প্রমুখ খ্যাতনামা কবি এ ধারণাকেন্দ্রের বুনন এবং ঘনত্ব আরো দৃঢ় করে দিয়েছেন। বিষয়টি পত্রিকা ও লেখকদের পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর গঠিত ছিল, এভাবেই পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে নাগরিক জীবনের ধারাবাহিকতা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নগরের এরূপ অবস্থানের কারণে গ্রামীণ জীবন ছিল প্রায়ই অনুসরণের ভূমিকায়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই ছিল নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের ফল, শিশুদের তারা যেভাবে দেখতে পেতেন ও সৃষ্টি করে তুলতে চেয়েছিলেন শিশুর বিকাশ তার বাইরে যেতে পারেনি। এরূপ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এ পত্রিকার মিডিয়াতে, এ মুকুল পত্রিকাতেই শিশুর স্বাতন্ত্র্য, শিশুর মুক্ত বিকাশ নিরুৎসাহিত হয়নি।

টাপুর টুপুর (১৩৭৩)

টাপুর টুপুর একটি কিশোর মাসিক, কার্তিক ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ শফী এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এখলাসউদ্দীন আহমদ। প্রথম সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে সুফিয়া কামাল ফররুখ আহমদ আহসান হাবীব আল মাহমুদ শামসুর রাহমান হাবীবুর রহমান আতোয়ার রহমান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান শামসুল হক বুলবন ওসমান প্রমুখ অন্যতম। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্রে লেখকদের পাতা যুক্ত হয়েছে।

টাপুর টুপুর প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা কবি আল মাহমুদ রচিত রাত দুপুরে।[৭০] এ কবিতায় কবি রাত্রির সঙ্গে প্রভাতের একটি তুলনা করেছেন,

ভূত নেই ভয় নেই দেখবে তুমি
যদি যাও জানালায় রাত দুপুরে
আদিম বাংলাদেশ বঙ্গভূমি
সকালে হারিয়ে যায় অনেক দূরে।

একই সংখ্যায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জমানের কবিতা লেখা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, কিভাবে কবিতা লিখতে হয় বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে সে সম্পর্কে শিশুদের উপযোগী করে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে এভাবে,

'তাই বলছিলাম যদি বড় কবি হতে চাও তবে অনেক কবিতা পড়বে এবং ক্লাসের পড়াশুনায় ফাঁকি দেবে না কখনো। কারণ ফাঁকি দিয়ে আর যাই হোক না কেন কবি হওয়া কখনই যায় না।'

কবিতা লেখাকে শ্রেণিকক্ষের পাঠ থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং কবিতার চেয়ে শ্রেণিকক্ষের পাঠের হয়তো অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকতে পারে তবে দুটোই গভীর সম্পর্কযুক্ত হয়েছে তা ঠিক। কবিতা লেখার সঙ্গে মুক্ত প্রকাশক্ষমতার সম্পর্ক আছে, দুটোকে একত্রে সম্পর্কযুক্ত করেই

এরূপ প্রয়াসের সাফল্য। সৈয়দ আলী আহসানের তুমি[৭১] কবিতায় শিশুর সঙ্গে কবির কবিতার খাতার নিবিড় সম্পর্ক বর্ণিত,

যখন চোখের আলোকিত কথা
যেন কচি কচি ধানের পাতা,
তখন তোমার ঘুম-ভেঙে-জাগা
আমার কবিতা লেখার খাতা।

শিশুর মনের খুশি চোখের আলোকিত কথা কবির নিকট কবিতা লেখার খাতায় পরিণত হয়, অপরিসীম আনন্দের মহামিলন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। একই সংখ্যায় আনিসুজ্জামানের কথার কথা[৭২] শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, এটা বাংলা ভাষায় অর্থহীন শব্দের ব্যঞ্জনাত্মক প্রয়োগের সৃষ্টিকথা সম্পর্কিত। যেমন ভাত টাত, অদল বদল, অলি গলি, আশ পাশ, হাতে নাতে ইত্যাদির মধ্যে একটি অংশ দৃশ্যত অর্থহীন কিন্তু দুয়ে মিলে চমৎকার অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সনজীদা খাতুনের গলা সাধা সোজা নয় রচনাটিও এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। সংগীতচর্চার প্রাথমিক প্রায়োগিক দিকে কিভাবে গলা সাধতে হয় তা এখানে বর্ণিত, শেষ হয়েছে এভাবে, 'দাদুটির নাম ভরত মুনি। তার 'নাট্যশাস্ত্র' অর্থাৎ গান বাজনা আর নাচ শেখা বইতে এই সব কথা পাওয়া যায়।' ভরত মুনিকে দাদু সম্বোধন করে শিশুদের সঙ্গে ভরত মুনির সহজ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস আছে। সচরাচর শিশুদের বিজ্ঞানমনস্কতার দিকে আকৃষ্ট করতে দেখা যায়, সেরূপ প্রয়াস টাপুর টুপুর পত্রিকাতেও আছে তবে শিশুসাহিত্যের যে একটি দিক এখানে উন্মোচিত হয়েছে সেখানে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ যুক্ত করে ঈষৎ নতুনত্ব সৃষ্টি প্রয়াস হয়েছে।

হায়াৎ মামুদের আমার ঘুড়ি[৭৩] কবিতায় বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে কবিতার একটি চমৎকার সংযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে,

রাশিয়া বলো কিংবা আমেরিকা
বৃথাই শুধু খরচ এত করে
আমার ঘুড়ি সবার আগে গিয়ে
আড্ডা দেবে চান্দা মামার ঘরে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মধ্যে চাঁদ এখনো মামা হয়ে আছে এবং শিশুর ঘুড়ি আমেরিকা-রাশিয়ার প্রযুক্তির বাইরে কেবল সুতোয় যুক্ত হয়েই চাঁদ মামার ঘরে যেয়ে আড্ডা দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছে, শিশুর সৃষ্টিশীলতাকে জাগ্রত করেই কবি তাদের সেভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।

সিকানদার আবু জাফরের মানা[৭৪] কবিতায় কবি শিশুদের নিষেধকে অতিক্রান্ত করে দিয়েছেন এবং তাদের অপরাজেয় অবস্থানে স্থাপিত করেছেন। যেমন,

দক্ষিণে যাও বারণ আছে
পশ্চিমে যাও মানা
উত্তরে যাও নিষেধ আছে

পূবে আগল টানা ।
পালিয়ে যাবে কেবল তখন
হার মেনে সব মানা
তুমি তখন সাহস করে
হবে হার না মানা ।

কেবল শিশুর সাহসই তাকে হার না-মানা করে তুলতে পারে, কবি তাকে অভিনন্দিত করেছেন। একই সংখ্যায় সৈয়দ আলী আহসান রাজা কবিতায় রাজার প্রকৃত স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করেছেন যখন রাজ্য ছেড়ে সবার নিকট বিদায় নিয়ে বনে গেলেন। তিনি বিচার ছেড়ে শাসন ছেড়ে অনেক টাকায় খেয়াল ভুলে বনে গেলেন অন্যমনে দুহাতে পথের ধুলো তুলে নিলেন ঝরনা দেখে তার কিনারে পা ছড়িয়ে বসেন দুচোখ মেনে পাখি দেখেন এবং এভাবেই তার দিন রাত্রি গড়িয়ে যায়। রাজার এটা বৈরাগ্য নয় বরং নিসর্গের মধ্যে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া, কবির উপলব্ধি হল,

সত্যিকারের রাজা বলেই
তিনি এখন স্বাধীন হলেন ।

কবি লক্ষ করেছেন আনন্দের মধ্যে মুক্তি, সর্বদা রাজদায়িত্ব পালনে মুক্তি নেই। কবি শিশুর আনন্দময় মুক্তিচেতনার সঙ্গে রাজার এ অরণ্যজীবনের মুক্তিঅন্বেষণকে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছেন।

শামসুল হকের আগুন নিয়ে খেলা[৭৫] শিরোনামে একটি রচনায় আগুন কিভাবে মানুষের বশে এল, ক্ষমতার মধ্যে এল তার বিবরণ পাওয়া যায়। রচনাটি শেষ হয়েছে এভাবে, সে যা হোক আগুন আবিষ্কারের আগে মানুষ ছিল নেহাত অসহায়, শত্রুদের ভয়ে সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত। আবিষ্কারের ফলে সে তার নিজের হাতে পেল বিরাট এক শক্তি।'

রচনাটি শিশুর আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে তোলার অংশ, শিশুশিক্ষা অবশ্যই তবে তা আনন্দহীন নয় বলে একই সঙ্গে তা সৃষ্টিক্ষমতার সমৃদ্ধ।

টাপুর টুপুরের পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে আলোচিত কবি-সাহিত্যিকদের প্রচুর রচনা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি আরো অনেক প্রতিষ্ঠিত ও নবীন লেখকের সমাবেশ ঘটেছে। সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে শিশুর জন্য আলোকিত সুন্দর সৃষ্টিশীল নতুন পৃথিবী গঠনের যেখানে শিশুর বিকাশ হবে মুক্ত ও প্রতিবন্ধকতাহীন। সমকালীনতার এই কারণে কোথাও কোথাও সীমিত সামাজিক সংস্কৃতিক রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে থাকলেও তা শিশুবিকাশকে ঠিক অবরুদ্ধ করে তোলেনি।

নবারুণ (১৯৭২)

নবারুণ একটি সচিত্র কিশোর মাসিক, বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয় ও তথ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে ডিসেম্বর ১৯৭২, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৯ প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন কাজি

আফসারউদ্দীন আহমদ, প্রকাশের ঠিকানা ২৪ বিজয়নগর, ঢাকা। প্রথম সংখ্যার[৭৬] প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা এবং কাজী নজরুল ইসলামের চল চল চল গানটি ক্রমানুসারে পুনর্মুদ্রিত হয়। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সরদার জয়েনউদ্দীন আবদুল মতিন আনম বজলুর রশীদ রওশন আরা ফজল শাহাবুদ্দীন সাহিদা আক্তার মোস্তফা কামাল আনোয়ার সুলতান শাহাবুদ্দিন আহমদ মুহম্মদ বজলুল হক বুলবন ওসমান তাপস মিত্র ইয়াসমিন রশীদ মোজাফফর হোসেন আবদুল খালেক এনায়েত রসুল নীলুফার ফজিলৎ ফজল-এ-খোদা হাসান খসরু রেখা রায় প্রমুখ। নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে এবং সদ্য স্বাধীনতাউত্তর মুহূর্তে এ শিশুতোষ পত্রিকার পৃষ্ঠায় যুদ্ধের রক্তপাত ও যুদ্ধের নেপথ্যে রাজনীতিকথার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। যুদ্ধ এবং রাজনীতিকথার উপলব্ধিগুলোকে শিশুদের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য লেখকেরা যেমন দায়বদ্ধতা অনুভব করেছিলেন তেমনি সরকারি পত্রিকা হিসেবে নবারুণ পত্রিকার নিজেরও একটি অঙ্গীকার ছিল বোঝা যায়। সমস্যা ছিল অন্যত্র, লেখকেরা শিশুদের নিকট তাদের কথাগুলো জানিয়ে ভারমুক্ত হতে চেয়েছিলেন সত্য কিন্তু কী জানাতে হবে এবং কিভাবে জানাতে হবে সে বিষয়ে তারা স্পষ্ট অবস্থানে না-ও থেকে থাকতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধের সত্যতা এবং যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হিংসা রক্তপাত ছিল অনস্বীকার্য, যুদ্ধের ধ্বংস হত্যা রক্তপাত থেকে শিশুরা দূরে ছিল না এবং তারা এর তাপদগ্ধ অংশীদার ছিল। তাদেরও প্রত্যক্ষ তাপ লেগেছিল তা সত্য কিন্তু শিশুর সৃষ্টিশীল ভুবনের সঙ্গে হিংসা রক্তপাত সম্পর্কহীন, রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ কবিতার উপলব্ধি এখানে প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। স্বাধীনতার ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ধ্বংস হত্যা রক্তপাত হিংসার অংশকে না পারা গেছে বাস্তবে ও চেতনাজগতে শিশুদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আবার এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কযুক্ত রাখার সমস্যাকেও এড়িয়ে চলা যায়নি। ফলে এ পর্যায়ে শিশুসাহিত্যের এ বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে পরিণত বয়সীদেরই দায়িত্ব লাঘবের ও দুঃখ লাঘবের প্রয়াস, সে অর্থে এ সাহিত্য পরিণত বয়সীদেরই তবে শিশুদের মতো করে লেখা, শিশুতোষ হিসেবে উপস্থাপিত, শিশুসাহিত্যের চিরায়ত ধারণার সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের অপর্ণা[৭৭] চরিত্রের সঙ্গেও, রক্তপাতের বিরুদ্ধে অর্পণার প্রতিক্রিয়া গোটা রাজপরিমণ্ডলের মন্দিরের বিগ্রহ মাহাত্ম্যের হিংসা ও রক্তপাতের বিরুদ্ধেই উপসংহার সৃষ্টি করে তুলেছিল তবু তা ছাগরক্ত ছিল। আর এখানে বয়সীরা শিশুদের এ হিংসা ও রক্তপাতের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে এসেছে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে শিশুদের প্রতিবাদ সেভাবে আসেনি। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, রক্তপাতের বিরুদ্ধে রক্তপাত যুক্তিময় হয়ে উঠেছে, রাজনৈতিক কারণে এগুলো অনিবার্য ছিল তা-ও সত্য। তথাপি শিশুবিকাশের এ দিকটি রবীন্দ্রনাথের মতো ইতিবাচক পটভূমিতে স্থাপিত নয়, মুক্তিযুদ্ধের উপসংহার বয়সীদের অনুরূপ হয়েছে, ঠিক শিশুদের মতো হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধ আছে বলে প্রতিপক্ষ সৃষ্টি হয়ে আছে, হিংসার বিপরীতে অহিংস অবস্থান সৃষ্টি হতে পারেনি। যে কোনো যুদ্ধ থেকে শিশুর জীবন মুক্ত নয়, সে অর্থে শিশুসাহিত্যেও তার রূপায়ণ হয়তো সাধারণ ঘটনার অন্তর্গত, বাংলায় শিশুসাহিত্যে এই প্রথম সামাজিক জীবনের মধ্যেই পক্ষ-প্রতিপক্ষ ভাব সৃষ্টি করে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত

হিংসা রক্তপাত এত প্রত্যক্ষভাবে এল। বাংলায় শিশুসাহিত্যের এটা নতুন দিক। শিশুর আনন্দভুবনে আসুরিক অসুন্দরের অনুপ্রবেশ ঘটল এই প্রথম, একে শিশুকে গভীর কাল-সম্পর্কযুক্ত করে তোলা হল এবং তা যুক্ত হল ভায়োলেন্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গেও, বাংলায় শিশুসাহিত্যে শিশু সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে একে তাৎক্ষণিক সংযোজন করে তোলা সহজ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর রাজনৈতিক অংশ, পূর্বে শিশুসাহিত্যে এত বড় করে ছিল না। এ ছাড়া পূর্বের ধারাবাহিকতার সঙ্গে ছেদ এনে এটা প্রতিস্থাপিত হল বলে একটি সত্য-অসত্যের প্রতিতুলনা সৃষ্টি হল, পূর্বে যা সত্য ছিল এখন তা আপেক্ষিক সত্যে কিংবা অসত্যে পরিণত হল। পরিণত বয়সীদের উপলব্ধির সংঘাতগুলো শিশুদের ওপর আরোপিত, শিশুদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভুবনে এর ফলে ধারাবাহিকতা ছিন্ন হল, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে চাপ সৃষ্টি হল না তা নয়। প্রাক-একাত্তর থেকে যে সকল পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত থেকেছে সেগুলোতেই এ সকল পরিবর্তন ছিল লক্ষ করার মতো। তথাপি পরিবর্তন ছিল, শিশুতোষ রচনায় রাজনৈতিক বিষয়াবলির অনুপ্রবেশের মূল সমস্যা হল এখানে। সাম্প্রতিককালের শিশুসাহিত্য এগুলোকে ধারণ করেই যেটুকু পূর্ণতা তা অর্জন করেছে।

নবারুণ সরকারি পত্রিকা, মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র উষালগ্নে প্রকাশিত হয়, এজন্য মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধ অংশ এবং রাজনৈতিক অংশ দুটোই গুরুত্ব পেয়েছে। পত্রিকাটির জন্মলগ্ন এখান থেকে বলে পূর্বের কোনো প্রতিতুলনা প্রত্যক্ষ হতে পারেনি।

নবারুণ পত্রিকার প্রথমেই বিজয় দিবস শিরোনামে[৭৮] পত্রিকার একটি নিজস্ব নিবন্ধে বলা হয়,

কিন্তু দানবেরা বাঙ্গালীদের চেনেনি যেমন চেনেনি তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে। তাই তোমাদের মত কিশোর কিশোরী, ছাত্র ছাত্রী যুবক বৃদ্ধ সকলেই এক নেতার পিছনে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাণীকে পথ নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করে যখন শত্রুর সুমুখে রুখে দাঁড়ালো তখন তারা সংখ্যায় হাজার হাজার হয়েও আধুনিকতম অস্ত্রে সজ্জিত হয়েও বাঙ্গালীদের কাছে পরাজিত হল।

উপরোক্ত শব্দপ্রয়োগ এবং বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বে উল্লেখিত রোকনুজ্জামান খানের স্বাক্ষরিত কচি ও কাঁচা পত্রিকার পৌষ ১৩৭১ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তুলনীয় হতে পারে, এখানে সময় আপেক্ষিক পরিবর্তনের তাৎপর্য স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ বিপরীত। নবারুণ পত্রিকার বিভিন্ন রচনাতেও এ ধরনের বক্তব্য আরো কিছু নতুন মাত্রা সহ পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

সরদার জয়েনউদ্দীনের বাহাত্তরের ছড়া[৭৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। যেমন,

রাক্ষসে আর ভয় পাইনে
ভয় পাইনে বর্গীতে
ভয় পাইনি হারিয়ে গিয়ে
জলোচ্ছ্বাস আর গর্কিতে।
আজকে মোরা খেল শিখেছি

খেল শিখেছি রাইফেলে
সেটাই মোরা বাগিয়ে ধরি
ভয়টা এসে হাঁক দিলে ।

অথবা,

খেলনা নয় মাটির পুতুল
খেলনা এখন ম্যাসিন গান
সেরা খেলনা লড়াই লড়াই
খেলনা হাতের তোপ কামান ।

অথবা,

বর্গী ভয়ে দেশ ছেড়েছে
ভয় পেয়েছে বুলবুলি
আর তো ভয়ে ঘুম যাবনা
ভরব গোলা ধান তুলি ।

কবিতাটি শিশুর আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত তা সত্য কিন্তু মাটির পুতুল খেলনার পরিবর্তে রাইফেল ম্যাসিনগান তোপ কামান প্রতিস্থাপিত হয়েছে, এটা শিশুর যুদ্ধক্রীড়ার অংশ । পুরনো বর্গির লৌকিক ছড়া সমকালীন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছে । বাংলা শিশুসাহিত্যে এটা মুক্তিযুদ্ধোত্তর সংযোজন, পূর্বে এটা ছিল না, পরিণত বয়সীদের রাজনৈতিক সংকল্প শিশুর মধ্যে স্থানান্তরিত এবং রূপান্তরিত ।

আবদুল মতিনের বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধে শেখ মুজিবের শৈশবকথা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত । আনম বজলুর রশীদের একটি শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের তাৎপর্যকে সামনে নিয়ে রচিত কবিতা, পাদটীকায় তারকাচিহ্ন দিয়ে উল্লেখিত হয়েছে যে শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল । রওশন আরার জয় বাংলার জয় প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বর্ণিত । প্রসঙ্গত শেখ মুজিবের প্রশংসা আছে, এগুলো এ সময় থেকে বিভিন্ন রচনায় পূর্বানুবৃত্ত হয়ে এসেছে । ইতিপূর্বে প্রাক-একাত্তরে শিশুসাহিত্যে এগুলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল । সাহিদা আক্তারের বাংলাদেশের জন্মকথা প্রবন্ধটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বর্ণনা, এখানে একদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী এবং এর বিপরীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশস্তি বর্ণিত, স্বাধীনতার জন্য শেখ মুজিবের ভূমিকাও উল্লেখিত । শাহাবুদ্দীন আহমদের সাইরেন গল্প একটি বাঘ শিকারের কাহিনী, এর রূপক অংশটি বলা হয়েছে এভাবে,

গল্প শুনে শামীম বললো: বুঝলাম আপনার গল্পের মানে । কিন্তু বড় ভাই নানার আমলের সে বাঙ্গালী এখন আর নেই । এবার তারা নানাকে এগিয়ে দিয়ে আর পালাবে না । এবারকার স্বাধীনতা যুদ্ধই কি তার প্রমাণ নয়? এবার বাঘ একজনের হাতে মরেনি মরেছে দশজনের হাতে । তবু আপনার গল্পটা আমরা ভুলব না । ওটা আমাদের সাইরেন ।

বাঘ শিকারের সঙ্গে সাহস এবং ঐক্যের তত্ত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঐক্যের এবং সাহসের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। তেমনি মোস্তফা কামালের আমার পতাকা কবিতায় মায়ের-ভায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাতের কথা এসেছে, পতাকাতেও সেই রক্তচিহ্ন। যেমন,

আমার মায়ের
আমার ভায়ের
রক্তে যে আঁকা
আমার পতাকা
উড়ে উড়ে যায়
নভো নীলিমায়।

বাংলাদেশের পতাকায় রক্তিম সূর্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে এখানেও মুক্তিযুদ্ধের রক্তচিহ্ন আছে, সুতরাং কবির উপলব্ধিতে অসম্পূর্ণতা নেই, তবে বাংলায় শিশুসাহিত্যে এগুলো নতুন। আনোয়ার সুলতানের নতুন দিনের কিশোর কিশোরী প্রবন্ধে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখিত হয়েছে, শেখ মুজিবের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের আদর্শের কথা বলা হলেও জাতীয়তাবাদ সেভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি।

কাজি আবুল হোসেনের অরুণ প্রাতের তরুণ মুক্তিযুদ্ধের গল্প। ইয়াসমিন রশিদের আমি ছিলাম গেরিলা বিমানযুদ্ধের বিবরণ, যুদ্ধের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত ধ্বংসের কথাও এসেছে।

তুলনীয়ভাবে ফজল শাহাবুদ্দীনের স্নেহের শিখা কবিতাটি অনেক বেশি কাব্যিকতামণ্ডিত, এখানেও মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতাগুলো এসেছে তবে প্রচারের দিকটি অপেক্ষাকৃত গৌণ। যেমন,

অপার স্নেহের শিখা এই মাতৃভূমি
রক্তমাখা অন্ধকারে ঢাকা
রক্তঝরে বাংলাদেশের মৃত্যু থেকে জন্ম নিলে তুমি
হাতে নাও তোমার পতাকা।
এদেশে পাখীরা আজ গায়না তো গান, পুষ্পরাশি
আন্দোলিত হয়না বাতাসে
নদীর তরঙ্গে নেই কল্লোলিত স্বদেশের বাঁশী
বিধ্বস্ত মায়ের শব পড়ে আছে ঘাসে।
সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো ভয়ঙ্কর দুরন্ত দুর্বার
অন্ধকার কারা ছিন্ন ভিন্ন-
তোমার ভাসাও ভেলা রক্তস্রোতে, মৃত্যু নেই আর
জল্লাদের নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা শিশুসাহিত্যের এ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে অস্ত্র রক্তপাত হত্যা ধ্বংস মায়ের অসম্মান বিধ্বস্ত মায়ের শব ঘাসে পড়ে থাকা শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। শিশুর

পবিত্র সুন্দরের ভুবন কি এখানে আক্রান্ত? মানবচরিত্রের তিমিরাচ্ছন্ন দিক মুক্তিযুদ্ধের শত্রুমিত্রের বিভক্তি এবং তার আলোকে শিশুকে স্থাপন এখানে নতুন, পূর্বে এভাবে ছিল না। নবারুণ পত্রিকায় এগুলো শেষ নয়, মুহম্মদ বজলুল হকের এসো বই পড়ি প্রবন্ধে ফুলবাগানে ফুল ফোটার সঙ্গে বইপড়া তুলনীয় হয়েছে, বাগান যত্ন করলে ফুল ভরে যাবে, যত্ন না করলে তা চুপসে যাবে। অনরূপভাবে সালমা নাসিরের খেলতে খেলতে পড়া প্রবন্ধেও খেলার মতো করেই পড়াকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলে আসার ফলে শিশুসাহিত্যের পূর্বেকার সৃষ্টিশীলতা চলে যায়নি তবে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু পরিমাণে বদলে গেছে তা ঠিক।

আব্দুল মতিন পূর্বে বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধে শেখ মুজিবের শৈশবকে যেভাবে আদর্শায়িত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁর শের-ই-বাংলা[৮০] প্রবন্ধে এ কে ফজলুল হকের আলোচনা সেভাবে আসেনি। দুজনের ব্যাপারে লেখকের রাজনৈতিক মূল্যায়ন এক রকমের নয় তা বোঝা যায়। বাংলা ভাষা শহীদ মিনার ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু লেখা[৮১] আছে এগুলোর অন্যতম হল ইবনে হামিদের বাংলা ভাষা, আজিজুর রহমানের যে ভাষায় মাকে মা বলে ডেকেছি, আনোয়ার আহমদের শহীদ ভাইরা আমার, ফাতেমা মাহবুবের বাংলা ভাষা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোহাম্মদ ফজলুল রহমানের বাংলা ভাষার সংগ্রাম[৮২] প্রবন্ধে বাংলা সম্পর্কে আলোচনার একটি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ এসেছে। ফারুক মামুদের তোমার সমাধি সারা বাংলায় গল্পে মূল চরিত্র এনাম ভাই যিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু আর ফিরে আসেননি। মোহাম্মদ নাসির আলীর নববর্ষ দেশে দেশে[৮৩] প্রবন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত এবং বাংলায় গ্রামাঞ্চলে মেলার প্রসঙ্গ এসেছে। লায়লা রহমানের ভাষারও বয়স বাড়ে[৮৪] রচনায় দুর্বল গল্পকাঠামোর মধ্য দিয়ে ভাষার ক্রমবিকাশকে শিশু পাঠোপযোগী করে বর্ণিত হয়েছে। একই সংখ্যায় আশরাফ সিদ্দিকীর খুকুমনির জন্মদিনে কবিতা শেষ হয়েছে এভাবে,

এই যে মাটি এই যে ধূলি এই ধূলিতে এই খুকীটির হাসি—
সকল ব্যাথা ভুলিয়ে যে ভাই স্বর্গ নিয়ে আসলো রাশি রাশি।

মাটির ধূলির সঙ্গে খুকির হাসি মিশ্রিত হয়ে কবির নিকট ইহজাগতিক পৃথিবীতেই স্বর্গসুখের সন্ধান দিয়েছে।

নবারুণ পত্রিকায় সমকালীনতা গুরুত্ব পেয়েছে, সরকারি প্রকাশনা বলে একে কিছু বক্তব্যের বাহন হতে হয়েছে, সরকারি প্রচারের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে প্রথম সংখ্যার পর মুক্তিযুদ্ধ আর তেমন আসেনি। তবু রাজনীতি-কথাগুলো নেপথ্যে থেকে উঁকি দিয়েছে অথবা কখনো সামনেও প্রত্যক্ষে চলে এসেছে। প্রচারের দিকটি প্রাধান্য অর্জন করার ফলে সৃষ্টিশীলতা কোথাও কোথাও দুর্বল হয়ে পড়েনি তা নয়। শিশু তার নিজস্ব অবস্থানে থেকে গেছে, বক্তব্যধর্মিতা বৃদ্ধি পাবার ফলে বয়সীদের সঙ্গে শিশুভুবন প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে। এরূপ একটি অবস্থান পরিণত বয়সীদের আপন শৈশবে ফেরার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

ধানশালিকের দেশ (১৩৭৩)

ধানশালিকের দেশ পত্রিকা উত্তর-একাত্তরে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের অন্যতম। এর সম্পাদক ছিলেন মযহারুল ইসলাম। বাংলা একাডেমী কর্তৃক এটা ফাল্গুন ১৩৭৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ প্রকাশিত হয়। ধানশালিকের দেশ প্রথম সংখ্যায় লেখকদের অন্যতম হলেন সুফিয়া কামাল আবদুল মান্নান সৈয়দ মযহারুল ইসলাম শওকত ওসমান আলাউদ্দিন আল আজাদ মাহবুব তালুকদার হাসান জান সরদার জয়েনউদ্দীন রোকেয়া খাতুন রুবী হালিমা খাতুন আবুল হাসানাত আলী ইমাম প্রমুখ। স্বাধীনতাউত্তর পরিবর্তনের তাৎপর্যগুলো অনেক বড় করে এসেছে, তথাপি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিশুর নিজস্ব আনন্দভুবনের প্রতিশ্রুতি এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে এভাবে, 'স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের জ্ঞানের রাজ্যে যদি আমরা শিশু কিশোরদের আনন্দ সঞ্চারের মাধ্যমে পথ দেখাতে পারি এবং তাদের নির্মল চিত্তে ভবিষ্যতের স্বপ্ন সঞ্চারিত করতে পারি তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।'

ধানশালিকের দেশ পত্রিকা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে এসেছে ঠিকই কিন্তু আনন্দ সঞ্চারের পথে কতটুকু যুক্ত হতে পেরেছে তা একটি প্রশ্ন, বারবারই বয়সীদের কথাগুলো এবং তাদের জন্য কথাগুলো শিশুভুবনকে কোথাও কোথাও মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়েছে, মুক্ত সূর্যালোকের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেও তুলেছে।

ধানশালিকের দেশ প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা হল কবিতা, সুফিয়া কামাল রচিত রক্তিম সকাল।[৮৫] কবি স্বাধীনতার জন্য যাদের অশেষ ত্যাগ রয়েছে তাদের মাতৃভাষা বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছেন এবং তাদের নতশিরে সালাম জানিয়েছেন,

ওরে খোকা ওরে খুকু কিশোরী কিশোর
ঘুরে আসে ফেব্রুয়ারী বছর বছর
অশোকে পলাশে লালে লাল
শহীদী পতাকা ওড়ে রক্তিম সকাল।
বাংলার স্বাধীনতা যাহাদের দান
নতশিরে তাহাদের জানাই সম্মান।

আবদুল মান্নান সৈয়দের বিনু মামার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বক্তব্যধর্মী, দৃশ্যত হাস্যরসাত্মক। কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অবলম্বিত হলেও একটি রূপক বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রখর সমকালীন বক্তব্যকে অগ্রায়ন করা হয়েছে। শিশুতোষ রচনার মধ্য দিয়ে এরূপ ঠাসা বক্তব্য সাম্প্রতিককালের ঘটনা, সুকুমার রায়ের বিভিন্ন ছড়ায় বক্তব্য বড় হয়ে এলেও সেগুলো এভাবে ছিল না। এখানে বক্তব্য বয়সীদের দ্বারা এবং বয়সীদের জন্য সৃষ্ট কিন্তু শিশুতোষ রচনার মধ্যে উপস্থাপিত, সেদিক দিয়ে পরিণত বয়সীদের অন্তরের পরিণত শিশু লক্ষ্য পাঠক, সেখানেই এ সকল বক্তব্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষেত্র পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে গ্রামের ও নগরের একটি সম্পর্কও সামনে এসেছে যেখানে নগরজীবনের কলুষতাকে ও কৃত্রিমতাকে লেখক ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। গল্পে প্রধানত

দুটো চরিত্র শিশু টুলু এবং তার কিশোর মামা বিনু, বিনু এবারে বিজ্ঞান বিষয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে। টুলু নগরবাসী, গ্রামে বেড়াতে এসেছে, বিনু ও টুলুর সংলাপ ও বিজ্ঞান বিষয়ে কৈশোরকে আবিষ্কারপ্রবণতা নিয়ে এ গল্প। মামা বিনু বিজ্ঞানমনস্ক, তার আবিষ্কারের প্রয়াসগুলো হাসির উদ্রেক করে। সে টিকটিকি দিয়ে টিক টিক করা ঘড়ি বানাতে চায়, জোনাকি ধরে বালব বানাতে চায়। তবে শিয়ালের চামড়া দিয়ে কোট বানাতে চায় এটা বিশেষ ব্যাঙ্গাত্মক এবং গুরুত্বপূর্ণ। যেমন,

কুকুরের চামড়ায় কোট বানালে কেমন হয়, মামা? টুলুর প্রস্তাব।

আরে বোকা বোঝনা কেন। কুকুরের চামড়ায়ও বানানো যায় কিন্তু কুকুর খুব বেশি যে। যে জিনিস খুব বেশি পাওয়া যায় তার ব্যবসা চলে না। লোকে কুকুরের চামড়ার কোট কিনতে যাবে কেন, বাড়িতেই বানাতে শুরু করবে। শিয়াল তো অত সহজে পাবে না। তাছাড়া কোট পরে বেশির ভাগ শহরের লোক। কুকুরের চামড়ার কোট পরলে কুকুর আর ভদ্রলোক কি আলাদা করে চেনা যাবে রে?

এখানে মূল বক্তব্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে কুকুর আর ভদ্রলোকের পার্থক্য করার মধ্যে। টুলু মামার গোটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বা প্রয়াসের সর্বমোট ফলশ্রুতি এই যে শহরের কুকুর আর ভদ্রলোকের পার্থক্য করার প্রশ্ন—এ বক্তব্য শিশুভুবনের উপযুক্ত নয়। দুজন শিশু-কিশোরের সংলাপ ও কিছু কাজের মধ্যে স্থাপন করে এ বক্তব্য জন্ম ও বিকাশপ্রাপ্ত। সামাজিক সমস্যার সত্যতাগুলোকে লেখক তাঁর নিজস্ব কৈশোরের মধ্যে রেখে পরিণত বুদ্ধি নিয়ে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন আবার শিশুদের মিডিয়া করে পরিণত পাঠকের অন্তরে পরিণত শিশুর নিকট পৌছে দিয়েছেন। বাংলায় শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের তুলনায় এটা ব্যতিক্রম, ভালোমন্দের প্রশ্ন নয় এগুলো যে পৃথক এটাই বড় কথা। সম্প্রতিককালে এসে এ ধরনের বক্তব্য বিস্তর পাওয়া যাবে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীনতার এরূপ অর্জন অনেক, এগুলো মিলিতভাবে শিশুসাহিত্যের ইমেজ গঠন করেছে। শিশু পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সমন্বয় সৃষ্টি করে নিয়েই পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিলতর ভুবনের মধ্যে অবস্থান করেছে, বিভিন্ন ঘটনার তত্ত্বের বা উপলব্ধির সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মযহারুল ইসলামের ধানশালিকের দেশ কবিতায় দেশ জননীতে রূপান্তরিত, রক্তদানের মাধ্যমে তা অর্জিত, তিনি এ দেশজননীর জন্য তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন,

মুছিয়ে দেবো দেশ জননীর
সকল দুঃখ জরা
রক্তে পাওয়া আমার এদেশ
জীবন দিয়েই গড়া

আবদুল্লাহ আল মুতীর রঙ ধনুকের সাতটি রঙ শিশুদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সুফিয়া কামাল এ বিষয়বস্তুটিকেই কবি রাজপুত্রের হাতে দিয়ে রোমান্টিক কাব্যমা-িত

রূপকথার ভুবনে টেনে নিয়ে এসেছিলেন।[৮৬] বুলবন ওসমানের কারফিউ গল্পের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, কারফিউয়ের পেছনের রাজনীতি প্রধান হয়ে এসেছে। রাজনীতির পরিবর্তনগুলো এর সঙ্গেকার নৃশংসতা নিয়েই শিশুমনকে বিচলিত করে। গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালের, কারফিউ শিশুর চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ কেবল নয়, সমগ্র জীবনকেই তা ওলোটপালোট করে দিয়ে যায়। কারফিউ হল শিশু বাচ্চুর বন্দিত্ব, তার ওপর নিষেধের বন্ধন কিন্তু সে মুক্তি চায়। নগরে দরিদ্র শিশুর রাজনৈতিক অভিব্যক্তি[৮৭] এখানে প্রকাশিত হয়েছে, লেখক রাজনৈতিক কারণে সচেতনভাবেই শুক্রাবাদের কাছে বস্তির দৃশ্যের মধ্যে পাঠককে টেনে নিয়ে গেছেন কেননা শুক্রাবাদের অবস্থান শেখ মুজিবের বাসস্থানের নিকটে। লেখক এর বর্ণনা দিয়েছেন,

রাণার সাথে পুকুর পাড়ে গিয়ে হাজির। সেখানে তার মধ্যে শুক্রাবাদের বস্তির ছেলেরা জড় হয়েছে। গাছে উঠে তারা সবাই চীৎকার করছে, জয় বাংলা---ভুট্টোর মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ....বাচ্চুর খুব ভালো লাগে। তবে গাছে উঠতে না পারায় কিছুটা তার দুঃখ আছে। রাণা তার বছর দুয়েক বড়, সে গাছে অন্য ছেলেদের সাথে গলা মেলায়, জয় বাংলা।

ইতিমধ্যে মিলিটারিদের গাড়িতে ঢিল মারার অপরাধে মিলিটারিদের গুলিতে রাণা প্রাণ হারিয়েছে। এর বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, 'পরদিন সকালে কারফিউ উঠে গেলে বাচ্চু দেখে অনেক লোক বড় রাস্তা দিয়ে মিছিল করে যাচ্ছে, জয় বাংলা বলে চীৎকার করছে, শুধু পুকুর পাড়ের বড় তেঁতুল গাছটায় কেউ নেই।'

গল্পটি শেষ হয়েছে করুণরসের মধ্য দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধকালে নগরজীবনে এ ঘটনা সাধারণ দৃশ্য অবশ্যই, তথাপি ভুট্টোর মুখে লাথি মারার রাজনৈতিক স্লোগান, রাণার মৃত্যুমিছিল একত্রে শিশুর সঙ্গে নগরচেতনা ও রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত করে দিয়েছে। নগর দরিদ্র শিশু-রাজনীতি বহনের নিমিত্ত, নগর দরিদ্রের জীবনের এটা অনিবার্য অংশ। গোটা বিষয়ের মধ্যে অবাস্তবতা নেই তথাপি শিশু পরিণত বয়সীদের অভিজ্ঞতার ও বুর্জোয়া রাজনীতিচর্চার ক্রীড়নক পরিণত বয়সীদের অন্তরের পরিণত শিশুই রাণা ও বাচ্চুতে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সক্রিয়তার নাট্যরূপে অংশ নিয়েছে মাত্র। শিশুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে।

চৌধুরী আবদুল রহমানের একটি স্ফুলিঙ্গ একটি সংগ্রামী জীবন রচনাটি শেখ মুজিবের জীবনকথা, তবে আলোচনায় শৈশব আসেনি। আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা থাকি আমরা আজব শহরে ব্যাঙ্গাত্মক রচনা,

জেগে ঘুমান মহান রাজা
পাত্র মিত্র দিচ্ছে গাঁজা
সুখ টানটা মেরেই হাঁকেন
বেবাক ফরসা।
কচুর মচুর করছে গাত্র

কাছে রাখিস তৈলপাত্র
রাজ্য শাসন মোয়া তা নয়
মালিশ ভরসা ।

জেগে ঘুমিয়ে থাকা কোনো এক মহান রাজার, গাঁজায় দম দিয়ে দুনিয়া ফরসা দেখায় অভ্যস্ত রাজার উদ্দেশ্যে এ কবিতাটি রচিত, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত এ কবিতায় সকল কালের রাজাকেই চিহ্নিত করা যায় । যে শিশুর উদ্দেশ্যে এ কবিতা নিবেদিত তা প্রকৃতপক্ষে পরিণত বয়সীদের অন্তরে বসবাসরত, এটা ইহজাগতিক অবশ্যই তবে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের ভাষায় যে তুলতুলে[৮৮] শিশু তা এখানে লক্ষ্য পাঠক নয় ।

আলী ইমামের কাজল মাটির কথা[৮৯] দেশাত্মবোধক রচনা, প্রাচীন বাংলাদেশের বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশ-চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস আছে । সাঈদা পারভিন খুকুর সূর্য ওই কবিতায় রক্তে মাটি লাল হবার কথা এসেছে,

তিরিশ লক্ষ স্বজনের খুনে
লাল তো হয়েছে মাটি
এই এসো ভেদাভেদ ভুলি
পাশাপাশি সবে হাঁটি ।

শাহাদাৎ হোসেন বুলবুলের কোকিলটারে মারছো কেরে গুলি মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে রচিত, এখানে হত্যার প্রসঙ্গ এসেছে । আবু সালেহ-এর বেঁচে আছি কবিতাতেও মিছিলের কথা এসেছে । খালেদা এদিব চৌধুরীর এক যে ছিল রাজকুমার[৯০] ধারাবাহিক রবীন্দ্রনাথের জীবনী, এখানে রবীন্দ্রনাথের শৈশবকথা এসেছে । আলী ইমামের আমার বাড়ী এসো কবিতায় দেশাত্মবোধ প্রকাশিত হয়েছে, এটা বেশি কাব্যিকতামণ্ডিত । ছোটদের পাতায় সুরাইয়া চৌধুরী বাসনা রচিত একাত্তরের রূপকথা কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের কথা এসেছে, দৈত্য-দানোর মৃত্যুর পর আলোকরথে চড়ে রূপকথার রাজপুত্রের ফেরার কথা আছে । ছোটদের পাতায় একজন কিশোরীর লেখা এ কবিতায় এ রাজপুত্র কে সে বিষয়ে আর কোনো কথা নেই ।

আবুল আব্বাসের বাঁশী[৯১] রচনায় ঢাকার পুরনো পল্টনে দুজন খ্যাতনামা কবি নজরুল ও বুদ্ধদেব বসুর সম্পর্কের চমৎকার স্মৃতিচিত্রকে পুনর্গঠন করা হয়েছে । হুমায়ুন আজাদের লাল নীল ছড়া প্রবন্ধে ছড়া গঠনের প্রকৃতি নিরূপণ করা হয়েছে এভাবে,

‘তাই ছড়ার প্রথম যাদু লুকিয়ে থাকে তার মন মাতানো ছন্দে আর ধ্বনিতে । উচ্চারণ করতে করতে মনে হয় যেন আমরা মিষ্টি কিছু চিবুচ্ছি ।’

সাম্প্রতিক ছড়া গঠনের মধ্যে এভাবে মিষ্টি চিবানো যায় কিনা তা একটি প্রশ্ন । একই সংখ্যায় আতোয়ার রহমানের ছড়া শিরোনামে রচনার কিছু অংশ এভাবে,

ঝুমঝুমি আর চায়না খোকন
চায় নাকো আর সাইকেল

এখন নাকি চাই শুধু তার
একটি নতুন রাইফেল ।
মা দিয়েছেন বাপ দিয়েছেন
পয়সা তাকে ঢের ঢের
এবার তাকে দাও কিনে দাও
বুলেট কেবল সের সের ।

শিশুতোষ ছড়ায় শিশুর জন্য রাইফেল ও বুলেট মুক্তিযুদ্ধের অর্জন । তেমনি মযহারুল ইসলামের প্রকল্পনার দৌড় ছড়ায়,

ত্রাণমন্ত্রী খই এনেছেন
বানমন্ত্রী দই
মৎস মন্ত্রী নিজের হাতে
রাঁধেন বসে কই ।
দৈনিকেতে খবর রটে
ভোজটা এবার জমবে বটে
প্রকল্পনায় ফাইল গেলে
মিললো নাকো সই
সব আয়োজন বেবাক' মাটি
অবাক হয়ে রই ।

সমকালীন আর্থরাজনৈতিক বিভিন্ন জটিল বিষয় নিয়ে এ সকল ছড়া শিশুসাহিত্যে চলে এসেছে, পত্রপত্রিকার সূত্রে এগুলোকে শিশুসাহিত্যে স্থান করে দিতে হয়েছে । এ কথা সত্য যে, খেলনা পিস্তল বন্দুক এখন শিশুর খেলার অন্যতম অংশ, আতোয়ার রহমান এর সঙ্গে সের সের বুলেট যুক্ত করে একে আর খেলনা করে রাখেননি । তেমনি প্রকল্পনার দৌড় ব্যঙ্গপ্রধান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পরিণত বয়সীদের জন্য বাণীবহ, কেবল শিশু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলেই তা শিশুসাহিত্যের অংশ হয়ে থাকতে পারে অন্যথায় তা কি শিশুসাহিত্য? মযহারুল ইসলামের সাপ তুলতে কেঁচো[৯২] ছড়াটিও প্রায় অনুরূপ । এখানে দৈনিক পত্রিকায় যে সকল সম্পাদক আজব খবর ছড়ান তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে । এটা ছড়া বটে কিন্তু এর সামনে-পেছনে নেপথ্যে কোথাও শিশু নেই । মযহারুল ইসলামের এসো তবু[৯৩] শিরোনামে অন্য একটি কবিতায়,

আমরাও চলে যাবো পার হয়ে
পথটির ওপারে যেখানে
কুয়াশায় ঘিরে আছে অন্ধকার
বড়ই গুমোট এক জটিল প্রশ্নের মত

মনে হয় নিঃসীম পারাবার ।

শিশুসাহিত্যিক হাসান জানের অন্তহীন অন্ধকারে চলে যাবার উপলব্ধিকে সামনে নিয়ে এ কবিতায় আমরাও শব্দের ব্যবহার হয়তো শিশুদের সঙ্গে নিয়েই, তথাপি এ কবিতাটি কবির অন্ধকারে যাত্রার প্রতিক্রিয়া থেকে রচিত, শিশু পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এখানে কোথাও শিশু নেই ।

আলী ইমামের অন্য কোনোখানে বুদ্ধদের বসু সম্পর্কে লিখিত নিবন্ধ । এখানে বুদ্ধদেব বসুর শৈশবের কথা এসেছে । বুদ্ধদেব বসু খুব ছোটবেলায় তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন, যে একটি কবিতায় বুদ্ধদের বসু তার মায়ের স্মৃতিকে গেঁথে তুলেছিলেন, আলী ইমাম তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন । লেখক এ রচনায় বুদ্ধদেব বসুকে শিশুদের নিকটে নিয়ে যেতে পেরেছেন ।

ধানশালিকের দেশ আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা হলেও নবারুণ পত্রিকার অনুরূপ সরকারি প্রচারের মধ্যে আত্মসমর্পিত ছিল না । মুক্তিযুদ্ধের যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তা এখানেও এসেছে তবে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারের দিকটি আসেনি, বরং এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ করা যায় । ফলে সামনে এবং নেপথ্যে থেকে যে শিশু ধানশালিকের দেশ পত্রিকায় এসেছে তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চিরন্তন শিশু, কেবল কোনো আনন্দলোকে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি । এ শিশু মুক্তিযুদ্ধের উপলব্ধির মধ্যে বড় হচ্ছে সুতরাং স্বাধীনতার উপলব্ধি তার নিকট বড় হয়ে আছে, এ যেমন তার অন্তরের স্বাধীনতা তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একত্রে । মুক্তিযুদ্ধের কারণে অস্ত্র হত্যা রক্তপাত হিংসা ইত্যাদির ভাষা তার নিকট উন্মোচিত, তথাপি লেখকেরা শিশুদের এসবের বিপরীতে স্থাপন করেছেন এবং রক্তপাতের অসুন্দর উপলব্ধি থেকে সরিয়ে এনে প্রতিবাদ হিসেবেই তাদের গড়ে তুলেছেন । একটি বৈপরীত্যও থেকে থাকতে পারে যে, হত্যা রক্তপাতের একই প্রান্তিকে আছে রাইফেল মেশিনগান এবং অন্যান্য মারণাস্ত্র যা হিংসা রক্তপাত হত্যাকে মৃত্যুকে নিশ্চিত করে । সমকালীন সমাজের সমগ্র পরিম-ল যেখানে এরূপ তত্ত্বীয়ভাবে সৃষ্টিপ্রাপ্ত সেখানে শিশুদের এ থেকে পৃথক থাকার কথা নয়, তারা পৃথক থাকেনি, পৃথক থাকতে পারেনি । ফলে লক্ষ করা যায়, শিশুধারণার মধ্যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, সমাজের বিভিন্ন চেতনাস্রোতের মধ্যে এবং এর কাছাকাছি থেকেই এ শিশুবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতসমূহ যেটুকু পূর্ণতা তা অর্জন করেছে । বাংলার শিশুসাহিত্যে এগুলো নতুন, সেদিক দিয়ে ধানশালিকের দেশ পত্রিকা ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ সৃষ্টি না করেও গাঢ় সমকালীনতা অর্জন করেছে । এখানে শিশুর মুক্ত বিকাশ আছে ঠিকই সেই সঙ্গে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক কিছু অর্জনকেও তা একত্রে সমন্বিত করে নিয়েছে ।

শিশু (১৯৭৭)

'শিশু' প্রকৃতপক্ষে শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক আশ্বিন, ১৩৮৪, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ প্রকাশিত । শিশুদের সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়ে শিশু একাডেমীর ঘোষিত লক্ষ্যের[৯৪] সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ । জোবেদা খানম এর সম্পাদক ছিলেন । প্রথম সংখ্যায় লেখকদের

মধ্যে সুফিয়া কামাল আহসান হাবীব হোসনে আরা শামসুর রাহমান হোসেন মীর মোশাররফ সুকুমার বড়ুয়া নীলুফার বানু শামসুল হক সরদার জয়েনউদ্দীন জোবেদা খানম মাহমুদুল হক বুলবন ওসমান আলী ইমাম জুবাইদা গুলশান আরা মোহাম্মদ মোদাব্বের নীলিমা ইব্রাহীম আবদুস সাত্তার আতোয়ার রহমান আসাদ চৌধুরী শাহজাহান তপন প্রমুখ রয়েছেন ।

প্রথম সংখ্যায় প্রথম রচনা কবিতা, শিরোনাম ঈদের দিন[৯৫] রচয়িতা সুফিয়া কামাল । ঈদের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে এ কবিতায় । যেমন,

যেন না ভুলিয়া যাই
মলিন বসনে পথে যারা ফিরে তারাও যে বোন, ভাই
তোমার আমার খুশির অংশ উহাদেরে দিলে তবে
এ ঈদের খুশি চাঁদের হাসির লিখন পূর্ণ হবে ।

আতোয়ার রহমানের আপন চোখে পিঠ দেখা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা, পেঁচা সম্পর্কে আলোচনা । মোহাম্মদ মোদাব্বের-এর পাগলা রাজা রূপকথার গল্প, পেছনে কিছু নীতিকথার অগ্রায়ন আছে । রাজা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে হুকুম দিলেন তার রাজ্যে 'কেউ হাহা করে হাসতে পারবে না, আর দুপুর রোদে ইটের পাঁজায় বসে মটর ভাজা গিলে খেতে হবে ।' এক পাগলকে পাওয়া গেল যে এরূপ কাজ করে, পাগলের সঙ্গে সংলাপে রাজার উপলব্ধি হল যে রাজা প্রকৃতই অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন এবং এ পাগল তা রাজাকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে । রাজা খুশি হয়ে পাগলকে জমিদারি দিতে চাইলে পাগল বলে, 'আমি পাগল মানুষ জমিদারী দিয়ে কি করব? পথে পথে ঘুরে বেড়াই, পথই আমার ভাল ।' এই বলে পাগল আবার পথে নেমে পড়ল । কিন্তু 'রাজ্যের লোক পাগলকে মাথায় নিয়ে চেঁচাতে লাগল, পাগল জিন্দাবাদ ।'

পাগল রাজা একটি রূপকথার গল্প কিন্তু সমকালীন সমাজজীবনের সঙ্গে মেলানো । তার ফলে রূপকথা হলেও তা কিছুটা রূপকধর্মী, রূপকথার বাইরে সমকালীন সমাজ জীবনকে তা স্পর্শ করে গেছে । এ পাগলা রাজাকে কি সমকালীন আবেষ্টনীতে পাওয়া সম্ভব? পুরোপুরিভাবে পাওয়া যাবে না, সেভাবে তা আর রূপকথার গল্প থাকে না । দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখের রূপকথার তুলনায় এগুলো ভিন্ন প্রকৃতির, শিশুর সামনে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য, কিছু নীতিকথা দেয়া হয়েছে । রচনাটি শিশুতোষ কিন্তু উপলব্ধির এ অংশটি শিশুর বাইরে বিস্তৃত পরিসরে স্থাপিত ।

রাবেয়া খাতুনের রাজকুমারী মিনী ও ছানা রূপকথার গল্প অথবা, স্বপ্ন, কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা । শিশু ছানা রূপকথার গল্প শুনতে ভালোবাসে, বিজ্ঞানের বাস্তবতাগুলো তার পছন্দ নয় । মিশরের রাজকুমারী মিনীর গল্প শুনে রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সে একটি নীল তারায় আরোহণ করে মমি করে রাখা সত্যিকারের রাজকুমারী মিনীর কাছে চলে গিয়েছিল, দুজনের সাক্ষাতের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে,

রাজকুমারী ঘাড় দুলিয়ে জানালো এক সময় তার অনেক কিছু ছিল, এখন কেউ নেই ।

ছানা আরো অবাক হয়ে বললো, এখন নেই কেনো?

মেয়েটি চারদিকে তাকিয়ে বললো, কি জানি কেনো। আমি তো ঘুমিয়েছিলাম। জেগে তোমাকে দেখলাম, ইস কদিন মানুষ দেখিনি।

জেগে ওঠার পর ছানার সংকল্প সৃষ্টি হল সে এখন বিজ্ঞান পড়বে কেননা 'অনেক বিজ্ঞানীরা ধারণা, আবার সে মিনী বেঁচে উঠবে, আধুনিক বিজ্ঞান বাঁচিয়ে তুলবে তাকে। আর বেঁচে উঠে মিনী শোনাবে তার সময়ের মাঝে কয়েক হাজার বছর আগের দুনিয়ার গল্প।'

লেখিকা আরো বর্ণনা দিয়েছেন, 'মিনীর গল্প থেকে ছোট মামা অন্য কাহিনীতে চলে গেলেন। কিন্তু ছানা আর কোনও দিকে মন দিতে পারলো না। রাজকুমারী মিনীর মুখ তার চোখের পাতায় চলাফেরা করতে লাগলো।'

রূপকথা দিয়েই রূপকথার মোহ ভেঙে শিশু ছানার জন্য বিজ্ঞানের আকর্ষণ সৃষ্টি করে তোলা হয়েছে। বাংলা শিশুসাহিত্যে শিশুর কল্পনাজগৎ সংকোচন না করে ক্রমেই বিজ্ঞানবুদ্ধির দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা লক্ষ করা যাবে। এখানে লৌকিক রূপকথার ব্যাকরণ থেকে কিছুটা সরে এসে সামাজিক মানুষের কথা শোনা যায়, রাজকুমারী মিনী ও ছানা কাহিনীর মূল অবতরণ কিংবা উত্তরণ হল রূপকথা থেকে বিজ্ঞানবুদ্ধির মধ্যে, রূপকথা নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র, স্বপ্নে হলেও রাজকুমারী মিনীর সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ একটি অতিরিক্ত কাব্যময় রোমান্টিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

আসাদ চৌধুরীর শিল্পাচার্যের কথা নিবন্ধটি জয়নুল আবেদিন সম্পর্কে, জয়নুল আবেদিনের কিছু শৈশবকথা এসেছে। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অভ্যাস ও কুঅভ্যাস চিনতে হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত নিবন্ধ। শাহজাহান তপনের আঙুল দিয়ে গোনা প্রকৃতপক্ষে গণনা করা সম্পর্কে বিজ্ঞান নিবন্ধ। আবদুল হাফিজের মাথা নিয়ে মাথাব্যথা বিজ্ঞানধর্মী রচনা। হোসনে আরার খুশীর গানে সবাই মাতে কবিতায় ঈদের আনন্দের সঙ্গে সাম্যচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। শামসুর রাহমান খোকার খাতা কবিতায় এ খাতার সঙ্গে একটি কাব্যিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন,

খোকার খাতায় পরী ঘুমায়
রৌদ্র পোহায় পৃথিবী।
বলতো খাতা কনক চাঁপা
বলতো আমায় কী দিবি?

তপন চক্রবর্তীর বনমানুষ[৯৬] বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। যতীন সরকারের ব্যাকরণের ভয় অকারণ[৯৭] ধারাবাহিক প্রবন্ধ, গল্পের মধ্য দিয়ে ব্যাকরণ বোঝানোর প্রয়াস হয়েছে। বিজয় দিবস সংখ্যায় বিজয় দিবসের কথা[৯৮] শিরোনামে পত্রিকার নিজস্ব নিবন্ধে বাঙালি জাতিকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু শত্রুর চক্রান্ত যে সফল হতে পারেনি সেকথা বলা হয়েছে। আতোয়ার রহমানের মাছ নিয়ে বাজির লড়াই হালকা গল্পের কাঠামোতে মাছ সম্পর্কে বিজ্ঞান নিবন্ধ, সুমন ও মৃদুল দুই ভাইবোনের সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত। তেমনি সেলিনা শাহজাহানের ঝড়

বাদলের কথা বিজ্ঞান বিষয়ক, সুমন ও বড়দা'র সংলাপের মধ্য দিয়ে আবহাওয়া, বাতাসের চাপ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য জানানো প্রয়াস আছে।

মকবুলা মনজুরের তুলির পুতুল[৯৯] গল্পে ডালিয়ার জন্য তার ধনী পিতার উপহার আমেরিকার পুতুলের তুলনায় তুলির জন্মদিনে তার শিল্পী পিতার নিজের তৈরি উপহার অনেক বেশি সুন্দর বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তুলির আবেগপ্রবণ অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে এভাবে, 'ওর শুধু মনে হল ডালিয়ার আব্বার কিনে আনা বিলেতী পুতুলটার চাইতে এ পুতুলটা অনেক বেশি সুন্দর।' তুলির পিতার নিজের হাতে তৈরি স্নেহের উপহার অনেক বড়, তবে লেখিকার অগোচরেই হয়তো দুই পিতার তুলনা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তা নিয়ে দুই শিশুকন্যার প্রতিযোগিতাও সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। গাজী শামছুর রহমানের আইনের কথা[১০০] আইন বিষয়ক নিবন্ধ, পরেও এরূপ নিবন্ধ বিভিন্ন সংখ্যায় এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে[১০১] প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত এ লেখায় তিনি তুলনা দিয়েছেন রবিনসন ক্রুসোর সঙ্গে, সমাজজীবনের বাইরে নিঃসঙ্গ জীবনে ক্রুসো ছিলেন একা। এজন্য আইন প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু আইন সমাজজীবনের জন্য প্রয়োজন। ভবিষ্যতে শিশুদের হাতেই আইনের শাসনের দায়িত্ব থাকবে একথা লেখক শিশুদের জানিয়েছেন। এর পর দুর্বল কাহিনীভিত্তিক সংলাপের মধ্য দিয়ে ছেলে ও মেয়ের জন্য সম্পত্তি বিভাজন সম্পর্কে ইসলামি আইন বিষয়ে লেখক কিছু প্রামাণ্য তথ্যও উপস্থাপন করেছেন। আইনের এ বিষয়গুলো শিশুর অবস্থান সম্পর্কে সামাজিক ধারণার অংশ, সমাজকাঠামো এসবের ওপর স্থাপিত। মুহম্মদ আবু তালিবের বাংলা ও হিজরী সনের জন্মরহস্য[১০২] প্রবন্ধে কিভাবে বাংলা সন জন্মপ্রাপ্ত সেগুলো জানাবার প্রয়াস আছে। পরের সংখ্যায় গাজী শামছুর রহমানের আইনের কথা[১০৩] সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে লিখিত। জোবেদা খানমের কবি জসীমউদদীন[১০৪] স্মৃতিকথা ও আলোচনামূলক বিনন্ধ। গাজী শামছুর রহমানের আরো একটি আইন বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়, শিরোনাম আমাদের দেশের আইন,[১০৫] এটা আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ। আইনের বিষয়গুলো শিশুদের জ্ঞাত করার প্রয়াস রয়েছে, পশ্চাতে উদ্দেশ্য হল শিশুদের সচেতন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

শিশু পত্রিকার মোট ভূমিকা হল শিশুবিকাশের পরিপূরক অবস্থান, কিন্তু ঘটনাক্রমে তা নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাইরে যায়নি। শিশুদের পাঠক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হবার কারণে এরূপ সীমাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবীরূপে এসেছে। বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা এখানে কম, বিনোদন জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বিজ্ঞানবুদ্ধি গড়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহ অনেক, এমনকি আইনের মতো জটিল বিষয় যদিও দৃশ্যমানভাবে শিশুতোষ নয় তথাপি শিশুদের কিছু কল্যাণচেতনা সামনে নিয়ে সেভাবে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। সরাসরি ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পায়নি, ঈদের প্রসঙ্গ সামাজিক আনন্দের ঐক্যময় প্রকাশ হিসেবে এসেছে। শিশু পত্রিকার মোট ভূমিকা হল ইহজাগতিকতাপ্রবণ সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির দিকে কিন্তু সমাজের ট্রাডিশনাল উপলব্ধিগুলোকে বর্জন না করে। শিশু পত্রিকা বাংলাদেশে শিশুদের পরিবর্তনশীল সময়ের

উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একই সঙ্গে পূর্ণ ইহজাগতিক চেতনাম-ল গঠনেও মনোযোগী। বাংলাদেশের স্বাধীনতাউত্তর পরিবর্তনগুলো সহজভাবে এসেছে, আধা-সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পত্রিকা হলেও তা সরকারি নবারুণ পত্রিকার মতো সরব রাজনৈতিক অভিজ্ঞান গ্রহণ করেনি। এমনকি বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত ধানশালিকের দেশ পত্রিকার তুলনায়ও এর রাজনৈতিক প্রোফাইল নিচে, তবে সামাজিক চেতনা প্রকাশের অভাব কোথাও হয়নি।

বাংলায় গ্রন্থিত শিশুসাহিত্য এবং শিশু সাময়িক পত্রিকায় সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, দুটোই মিলিতভাবে শিশুসাহিত্যের লাবণ্যময় প্রবাহকে গঠন করে তুলেছে। শিশু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় বিষয়বস্তুর সমকালীনতা আছে। শিশু সাময়িক পত্রিকায় দুটো বিষয় লক্ষণীয়, এক. পত্রিকায় সহজ আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকার ফলে ব্যাপকভাবে লেখকদের এখানে পাওয়া গেছে যাদের রচিত শিশুসাহিত্য প্রায়ই অগ্রন্থিত এবং যারা সরাসরি শিশুসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত বা খ্যাতিমান নন। দুই. শিশু সাময়িক পত্রিকার মিডিয়া থাকার ফলে সময়কেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে এগুলো প্রায়ই গ্রন্থিত নয়। পঞ্জিকা বর্ষে ধর্মীয় সামাজিক রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ঘটনা এবং ব্যক্তি অবলম্বিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে বলে লেখকেরা এ বৃত্তের মধ্যেই বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে উপস্থিত থেকেছেন। এরূপ হবার ফলে একদিকে পত্রিকার নীতিমালার মধ্যে লেখকেরা জিম্মি হয়েছেন অপর দিকে তাঁর ভালোমন্দ দুভাবেই সমকালীন থেকে যেতে পেরেছেন। এখন প্রশ্ন হল এরূপ অবস্থান শিশুবিকাশের জন্য কিরূপে এবং কতটুকু সম্পর্কযুক্ত? সম্পর্কযুক্ত নয় তা নয় তবে প্রশ্ন সেখানে দাঁড়িয়েছে যেখানে সমকালীন বিষয়গুলো স্থায়ীভাবে কোনো একখানে এসে থেকে থাকেনি। সাতচল্লিশ সালের আগে ও পরে এবং একাত্তর সালের আগে ও পরে এরূপ মৌলিক পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। কোথাও কোথাও ইতিহাসের প্রচলিত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং বিপরীত হয়ে গেছে। এতদিনকার শেখানো সত্যোপলব্ধি আপেক্ষিক হয়ে গেছে এবং স্রোত বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে। একই শিশুর বা ধারাবাহিক শিশুর সামনে তাৎপর্যের ভূমিকম্পের ফলে নতুন করে শেখার কিংবা নতুন করে স্মৃতিকে ভোলার প্রয়োজন পড়ে যায়। এতে শিশুদের পরিণত অভিভাবকেরা, সমাজচেতনার ধারাবাহিকতা, বিরাজমান মূল্যবোধ, শিশুর রুদ্ধদ্বার সামাজিক শিক্ষায়তন কিরূপ ক্রাইসিসের মধ্যে ছিল তা বোঝা যায়। চিরায়ত উপলব্ধির পাশে সমকালীনতার সংঘাত ও সমকালীন আপেক্ষিক অর্জনগুলোর পারস্পরিক সংঘাত এখানে প্রতিভাত হয়, শিশু পত্রিকাগুলো এসবের দৃষ্টান্ত ধারণ করে আছে। সাধারণভাবে শিশু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু অগ্রন্থিত রচনার বাইরে গ্রন্থিত শিশুসাহিত্যে এগুলো প্রায়ই এভাবে পাওয়া যাবে না। শিশু সাময়িক পত্রিকার এগুলো বিশেষ একটি দিক, কোনো মৌল আর্থরাজনৈতিক পরিবর্তনের সামনে লেখকদের এরূপ বিপরীত দৌড় কখনো আবশ্যক হয়। সাময়িক পত্রিকার ধারাবাহিকতার কারণে একে ধারণ করে রাখা সহজ হয়। গ্রন্থিত শিশুসাহিত্যে এগুলো এত

গভীরভাবে প্রযোজ্য নয়। কোথাও কোথাও লেখকেরা পুরনো বিশ্বাসের ক্ষতিপূরণ করেছেন সময়ের সঙ্গে নিজেদেরও চরণের গতি বাড়িয়ে দিয়ে, পূর্বেকার বিশ্বাসের বিপরীত কিছু লিখে, তবে সর্বত্র তা এভাবে ঘটেনি। সমকালীন বিষয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা যেখানে ছিল সেখানে এরূপ বিপরীত দৌড় আবশ্যক হয়নি। এরূপ কেবল পত্রিকার লেখকদের ক্ষেত্রে ঘটেছে তা নয়, পত্রিকার সম্পাদকীয় এবং পলিসি বিবরণ ইত্যাদির মধ্যেও তা লক্ষ করা যাবে।

শিশু সাময়িক পত্রিকার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠাপ্রবণ লেখকের নক্ষত্র সমাবেশ, প্রায় সকল পত্রিকারই এটা বৈশিষ্ট্য। প্রচুর লেখককে প্রায় সকল পত্রিকার ফোরামেই পাওয়া যাবে এতে বিভিন্ন পত্রিকার নিজস্ব কণ্ঠস্বর এবং মূল প্রবণতা নষ্ট হয়নি। এরূপ একটি অবস্থার ফলে শিশুসাহিত্যে শিশুধারণা সম্পর্কে কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে হলে এ সকল শিশু সাময়িক পত্রিকার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। তবু শিশুসাহিত্যে গ্রন্থিত অংশের সীমাবদ্ধতাকে পত্রিকাগুলো অতিক্রম করতে পারেনি। লক্ষ্য পাঠক যেহেতু ছিল নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের শিশু সুতরাং তাদের বিকাশের যে ক্ষেত্র তার নিচে এ সাহিত্যপ্রয়াস নামেনি। পত্রিকার ভূমিকা একটু ব্যাপক পরিসর হলেও এ সীমাবদ্ধতাকে তা অতিক্রম করে যায়নি। সেভাবে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে। এরূপ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বিভিন্ন পত্রিকার ঐক্যময় রূপে শিশুধারণাকে লক্ষ করা যাবে।

পত্রিকায় রচনা প্রকাশের সময় যে সমকালীনতা থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলো গ্রন্থিত করার সময় সে সমকাল আর থাকে না। শিশুধারণার কোনো উপসংহারের জন্য এ সমকাল সমকালীনতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই লেখকেরা সমকালীনতার প্রতিক্রিয়া নিয়ে উপস্থিত হন। পত্রিকা সমকাল ও সমকালীনতাকে যেভাবে ধরে রাখতে সমর্থ গ্রন্থিত শিশুসাহিত্যের ভূমিকা তার তুলনায় পশ্চাতে। ফলে পত্রিকার মধ্যে চলমান শিশুধারণা গঠনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি, এখানে শিশু সাময়িক পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত উঁচুতে, সেভাবেই এগুলোকে পাওয়া যাবে। শিশুধারণা গঠনের ব্যাপারে পত্রিকার নিজস্ব প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র থাকে, সমকালীন লেখকেরা সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন মাত্র। পত্রিকায় শিশুধারণার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের বিবরণ যেভাবে পাওয়া যাবে গ্রন্থিত শিশুসাহিত্যে সেরূপ পাওয়া যাবে না তা নয়, দুয়ের মধ্যে ঈষৎ পার্থক্যও থেকে যায়। একটি কাল-পরিসীমায় সে সময়ের সামাজিক শিশুধারণাকে পত্রিকাগুলো সামনে নিয়ে আসতে পারে, গ্রন্থিত অংশ এর পরিপূরক। কোনো লেখকের প্রকাশিত যে সকল রচনা অগ্রন্থিত আকারে তবু থেকে যায় সেগুলো পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই মাত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

পত্রিকা সমকালীন সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে একত্রে চিরায়ত বা কালোত্তীর্ণ কথাকেও ধারণ করে। একারণে কোনো কালসীমায় প্রকাশিত পত্রিকাকে সামনে নিলে সে সময়ের ক্রমউত্তরণ, কোনো ধারণার বা মূল্যবোধের ক্রমবিকাশ ইত্যাদির পূর্ণ চিত্ররূপ পুনর্গঠন করা সম্ভব। সে অর্থে পত্রিকাগুলো যেমন ভৌত সময়ের শ্রেষ্ঠ দলিল তা একত্রে সামাজিক মানুষের অধিভৌত

মনোবিকাশের যথার্থ দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হতে পারে, বাংলায় শিশু পত্রিকগুলো সামনে নিলে সেসরে প্রমাণ মিলবে।

বাংলায় সামাজিক শিশুধারণার পূর্ণ স্বরূপটি পাওয়া যাবে শিশু সাময়িক পত্রিকার মধ্যে, এখানেও কালঘটিত একটি ক্রমপরিবর্তন বা ক্রমউত্তরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ শতকের শুরুতেই শিশু পত্রিকায় শিশুধারণা যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল তা নিশ্চিতই সেখানে স্থির হয়ে থেমে থাকেনি। প্রথমদিকে মানুষ কোনো না কোনো ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল, স্বাভাবিকভাবেই শিশুও এভাবে যুক্ত হয়ে ছিল। সময়ের পরিবর্তনের ফলে এরূপ প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে তা অনেকখানি মুক্ত হয়ে এসেছে, পত্রিকার মধ্যে এ ক্রমবিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যাবে। শুরুতে এটা প্রায় হিন্দুর ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, মানুষ এখানে অনেকাংশে বন্দি যেমন ছিল তেমনি একটি মুক্তির পিপাসাও তাকে পীড়নরত ছিল। এরূপ একটি অবস্থানের সঙ্গে দেশাত্মবোধ মিশ্রিত থাকার কারণে মুক্তির পিপাসার একই সঙ্গে শৃঙ্খলকেও মানুষ আনন্দে ধারণ করে ছিল। মানুষকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়নি কিন্তু শিশুর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্জন কিঞ্চিৎ অপেক্ষায়িত ছিল। ধর্ম ও বিজ্ঞান একত্রে আসার ফলে এরূপ বন্দিত্ব থেকে মুক্তি অসম্ভব হয়নি তবে সময় নিয়েছিল তা সত্য। এজন্য লক্ষ করা যাবে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে সামাজিক ভূমিকা যত বেড়েছে ধর্মকে বর্জন না করেই তত বেশি ইহজাগতিকতাবোধ সামনে অগ্রসর হয়ে এসেছে। তবু ধর্মের ভূমিকা ক্রমেই কমতে থেকেছে তা সত্য। ধর্মের একটি সামাজিক ভূমিকাও ছিল। ট্রাডিশনাল সমাজমানসের নিকট বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষিত ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধারণ করে রেখেই তার মধ্যে বিজ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটানো। এতে ধর্মের অবস্থান দুর্বল হয়নি তবে অপেক্ষাকৃত যুক্তিসম্মত হয়েছে, সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে ও জীবনে শিশুর প্রকৃত ইহজাগতিক অবস্থান চিহ্নিত করা অনেকখানি সহজ হয়েছে, শিশু সাময়িক পত্রিকাসমূহে সেসবের বিবরণ পাওয়া যাবে। এজন্য বিশ শতকের প্রথমদিকে শিশু সাময়িক পত্রিকাগুলো যত সহজে হিন্দুত্বকে অবলম্বন করেছিল পরের দিককার পত্রিকাগুলো সেভাবে আকৃষ্ট হয়নি। পত্রিকাগুলোর ক্রমবর্ধমান এরূপ ভূমিকার কারণে শিশুর স্বাতন্ত্র্যমূলক অবস্থান অনেক বেশি দৃশ্যমান হয়েছে যেরূপ পূর্বে ছিল না, কিংবা কম ছিল। সময়ের এবং চেতনার এরূপ মিশ্রিত ক্রমবিবর্তনের ফলে হিন্দুর সমাজকাঠামোতে প্রাথমিক বিকাশপ্রাপ্ত হলেও এবং কোথাও কোথাও ট্রাডিশনাল মূল্যবোধ ধারণ করলেও এ শিশুধারণার সঙ্গে ক্রমেই ইহজাগতিক মানবচেতনা প্রাধান্য অর্জন করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুধারণা হিন্দুর পরিমণ্ডলের বাইরে এসেছে তা নয় তবে পূর্ণ হিন্দুত্বের সঙ্গে মানবকেন্দ্রিকতা কিংবা দুর্বল হিন্দুত্বের সঙ্গে পূর্ণ মানবকেন্দ্রিকতা অর্জিত হয়েছে শিশুকে ক্রমেই এরূপ পরিমণ্ডলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

হিন্দু সম্পাদিত সকল শিশু সাময়িক পত্রিকা একই আদর্শের অনুসারী ছিল তা নয়, অনেক পত্রিকাই গোঁড়া অবস্থান থেকে সরে এসেছিল, কোনো কোনো পত্রিকা আবার সরতে পারেনি।

যারা সরতে পারেনি তারা সনাতন হিন্দুত্বের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, তথাপি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের কারণে তাদের মধ্যেও পরিবর্তনের বায়ুসংযোগ ঘটেছিল। তারা আঁকড়ে ছিল সনাতন বিশ্বাসকে কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবার ফলে পরিবর্তন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি। অবশ্যই লক্ষ্য ছিল সনাতন বিশ্বাসকে ধারণ ও গ্রহণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিম-লে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হোক, সেভাবেই এ সকল পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। কৃষি এবং অন্যান্য গ্রামীণ পেশার কথা এখানে নেই অথবা খুব কমই এসেছে, প্রধানত নাগরিক জীবন সম্পর্কযুক্ত পেশাগুলোর প্রাধান্য অর্জিত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিষয়গুলো প্রায়ই সেভাবে সাজানো, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বজনীনতাকে অবশ্য খর্বিত বা খণ্ডিত করা হয়নি। এতে গ্রাম ও নগরের পার্থক্যকে, হয়তো পল্লিশিশুর সঙ্গে নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুর মধ্যেও পার্থক্যের সূত্রগুলোকে চিহ্নিত করা যাবে। এ সময়কালের আরো কিছু পত্রিকা ছিল যেগুলোর ফোরাম আরো অনেক বেশি লিবারেল ছিল। সনাতন হিন্দুত্বকে এরা আহত করেনি কিংবা বর্জন করেনি তবে মূল আকাঙ্ক্ষা সমর্পিত ছিল শিশুর ইহজাগতিক মুক্ত বিকাশের দিকে ফলে হিন্দুত্বের বাইরেও তাদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল, ১৩১৯ সালে প্রকাশিত শিশু পত্রিকাটিকে এরূপ পর্যায়ে শ্রেণিকরণ করা যায়। পত্রিকায় হিন্দুত্বের দৃষ্টান্তগুলো যেমন গুরুত্ব অর্জন করেছিল তেমনি হিন্দুত্বের বাইরের দৃষ্টান্তগুলোও একেবারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েনি। এ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী রচনাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো, এগুলোর মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বীকৃতি আছে। কোথাও কোথাও ইতিহাসের বিভ্রান্তি বা ভুল তথ্য আছে কিন্তু সেগুলো সম্ভবত লেখকের নিকট তথ্যের অসম্পূর্ণতা থেকে হয়ে থাকতে পারে, কোনো উদ্দেশ্যমূলক সচেতন প্রয়াসের ফল বলে মনে হয় না। এরূপ দৃষ্টান্ত হিন্দু সম্পাদিত অন্যান্য পত্রপত্রিকায় বিরল, হয়তো নেইও। পত্রিকাটির লক্ষ্য পাঠক যেহেতু ছিল শিশু সুতরাং শিশুর জানার অধিকারের[১০৬] ওপর গুরুত্ব পড়েছে এবং সে জ্ঞান বা জানাও অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ ভুবনে স্থাপিত রেখে, বিশ্বাসের কোনো বিশেষ প্রান্তিকে টেনে নেবার সচেতন প্রয়াস নেই। হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকায় হিন্দু সমাজের সঙ্গে কমিউনিকেশন সহজ ছিল, লক্ষ্য পাঠক প্রায়ই প্রধানত হিন্দু সমাজের শিশু এবং পরিণত বয়সী পাঠক ফলে এরূপ অবস্থান একটি সহজ কমিউনিকেশন সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার এবং অপর দিকে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের অসম বিকাশের কারণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি সহজ হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি ছিলই, সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এরূপ বিভক্তি আরো সুপরিসর হয়েছিল, শিশু সাময়িক পত্রিকায় শিশুধারণা গঠনের মধ্যে সেগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল। তবে বিশ শতকের প্রথমদিকের এ দৃশ্য অপরিবর্তিত থাকেনি, পরিবর্তন যেভাবেই হোক বিভক্তি একবারে মুছে যায়নি। কোনো কোনো পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত লিবারেল অবস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, এখানেও শিশু পত্রিকাটিকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ফলে বিশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে শিশু সাময়িক পত্রিকার গোটা দৃশ্যপটই বদলে গিয়েছিল, সাতচল্লিশের রাজনতিক পরিবর্তন একে সহজ করে দিয়েছিল ।

উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের সূচনাপর্বে যেভাবে শিশুধারণা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে অস্পর্শিত ছিল পর আর সেভাবে তা থাকেনি । সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক যত বেশি সমকালীন বৃহত্তর পরিসরে উন্মোচিত হয়েছে তত বেশি জটিলতা একে স্পর্শ করে গেছে । উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ জীবনকে যেভাবে যেখানে পেয়েছিলেন পরের দিকের লেখকেরা আর্থসামাজিক এবং আর্থরাজনৈতিক বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু অর্জন করেও নিয়েছিলেন । সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যা ক্রমেই অনেক বড় হয়েছে । পত্রিকাগুলো সেসব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে । পরের দিকে রূপকথার মধ্যেও সমকালীন সমাজ প্রসঙ্গ রাজনীতিকথা ইত্যাদি সহজে প্রবেশাধিকার পেয়েছে যেরূপ পূর্বে ছিল না । উপেন্দ্রকিশোর প্রমুখের মধ্যে দেশাত্মবোধ প্রবল মাত্রায় ছিল, এগুলো অবশ্যই রাজনীতিকথার অনিবার্য অংশ, উত্তরকালে রাজনীতির জটিলতাগুলো আরো অনাবৃত হয়ে এসেছে । এগুলো শিশুবিকাশের অংশ হয়েছে ফলে তা শিশুধারণারও অবশ্যম্ভাবী অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে । প্রথমদিকের শিশুভুবন সৌন্দর্যভুবন পরে মেঘাবৃত হয়নি তবে নানাবিধ জটিলতার সঙ্গে এগুলো অভিন্ন হয়েছে । এ কারণে একই শিশু একই চিরায়ত শিশু একই ইহজাগতিক শিশু যত বেশি সমাজ সম্পর্কযুক্ত হয়েছে তত বেশি বিভিন্নমুখী ছেদক ধারণা বিশ্বের মধ্যে একে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে হয়েছে । একটি পর্যায়ে এসে এরূপও হয়েছে যে তৃতীয় প্রজন্মের শিশুকন্যা অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমতী হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষদের প্রত্যক্ষ অভিযুক্ত করেছে,

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ কর
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙ্গে ভাগ কর ।
তার বেলা?[১০৭]

ধেড়ে খোকাদের দ্বারা বাংলা ভেঙে ভাগ করার প্রসঙ্গও এসেছে । এগুলো শিশুর সম্পর্কযুক্ত রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের অনিবার্য উপসংহার । পরিণত বয়সীদের অন্তরের বিরাজমান শিশুর উপলব্ধির ভুবনে জন্মপ্রাপ্ত ছিল এবং তা শিশুধারণার অবিভাজ্য অংশ । সুতরাং দেখা যাবে, বিশ শতকের শিশু ক্রমেই যত জটিলতার সামনে এসেছে শিশুসাহিত্যেও তার অনিবার্য ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে । শিশুর মুক্ত সৃষ্টিশীল বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি কিন্তু অনেক বেশি বাস্তবতার সঙ্গে তার সমন্বয় গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেভাবে সমন্বিত হয়েও উঠেছে । এ কারণে প্রথমদিকের হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকায় মুসলমান প্রসঙ্গ দুর্বলভাবে উপস্থিত অথবা উপস্থিত নেই, উত্তরকালে কিঞ্চিৎ মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে তা প্রকাশের সুযোগ অর্জন করেছিল । তবে হিন্দু বা মুসলমান যেভাবেই হোক কিংবা যেখানেই হোক শিশু ছিল এবং শিশু ছিল

বলে শিশুধারণা ছিল, সেগুলো জটিল ছেদক চেতনাস্রোতের মধ্যেই বিকাশের সুযোগ অর্জন করেছিল।

সাহিত্যের সবগুলো ফর্মই পত্রিকায় অনুসৃত হয়েছে, কবিতা ছড়া গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদির ঐক্যময় রূপে শিশুসাহিত্যের অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, বিষয়বস্তুর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে পরিণত বয়সীদের সঙ্গে শিশুদের পার্থক্য রাখা হয়নি, পূর্বেকার ব্যবধান কিংবা দূরত্ব ক্রমেই বিলুপ্ত হয়েছে। কেবল লক্ষণীয় হয়েছে, পৃথিবী এবং জীবন যেন সুন্দর থাকে, ইহজাগতিক জীবন অসুন্দর যেন না হয়, মানব-সত্তার এবং মানব অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস যেন থাকে।[১০৮] কেবল শিশুতোষ উপস্থাপনার কারণেই সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে শিশুসাহিত্য সম্পূর্ণ পৃথক একটি ভুবনে স্থিত হয়েছে, শিশু পত্রিকার ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে লক্ষ করা যাবে। শিশুকে কেন্দ্রিত অবস্থানে স্থাপিত রেখেই এ সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস বলে ফর্মের কোনো পার্থক্য এখানে বড় হয়ে আসেনি, প্রকৃত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে এবং কাদের জন্য এগুলো উপস্থাপিত হচ্ছে তার ওপর। রাজনৈতিক সামাজিক এবং অন্যবিধ জটিলতার কারণে পরিণত জনমানস আপেক্ষিক শিশুতে পরিণত হয়ে বিচিত্র বিষয় নিয়ে শিশুসাহিত্যের ভুবনে প্রবেশাধিকার নিয়েছে এবং শিশুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে। পত্রিকায় সমকালীন বিষয়গুলো আশ্রয়-প্রশ্রয় পাবার ফলে এগুলো সহজ হয়েছে। প্রকৃত শিশুর সঙ্গে বয়সীদের অন্তরে বসবাসরত শিশুর একটি আনন্দময় মিলনস্থল সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। একই কারণে শিশুধারণার ক্ষেত্রটি অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে। সমকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ইত্যাদি যে কোনো প্রসঙ্গে শিশুর প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি প্রখর ও প্রশস্ত হয়েছে যেরূপ পূর্বে ছিল না। শিশুর এরূপ অবস্থান কিন্তু বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন নয়, সমাজজীবনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতগুলো শিশুর নিকট অনেক বেশি উন্মোচিত, এগুলো থেকে শিশু মোটেই দূরে নয়। শিশুর জন্য সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের প্রয়াস কোনো পর্যায়েই বিলীন কিংবা দুর্বল হয়নি। একটি বিস্তৃত জটিল আর্থসামাজিক আর্থসাংস্কৃতিক ও আর্থরাজনৈতিক পরিমণ্ডল শিশুর নিকট উন্মোচিত হবার ফলে তার গ্রহণ ও আত্তীকরণ ক্ষমতা অনেক বেশি প্রখর ও প্রশস্ত হয়েছে, এগুলো শিশুর স্বাতন্ত্র্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকের সমাপনী কিংবা বিশ শতকের সূচনাপর্বের অখণ্ড এবং অবিমিশ্র সৌন্দর্যভুবনের মধ্যে তা কেবল সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি। অনিবার্য অসুন্দর বর্জন না করেই তাকে সৌন্দর্যের তীর্থসন্ধানী হতে হয়েছে।

সাতচল্লিশের সীমান্ত বিন্যাস ছিল একটি ঝটিকাময় রাজনীতির উপসংহার, বাংলার শিশুও এ বিভক্তির অনিবার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম বিভক্তি পূর্বেই ছিল, এখন একটি জলদুর্ভেদ্যপ্রায় সীমান্ত দুয়ের মধ্যে আরো বেশি বিভক্তির প্রাতিষ্ঠানিকতা সৃষ্টি করে তুলল। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হয়েছিল, পুনশ্চ একটি অনিবার্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা বাংলাদেশে রূপান্তরিত হল। উত্তর-সাতচল্লিশের শিশু পত্রিকাগুলো এই বিভক্তির ও উত্তরকালের পরিবর্তনসমূহের গোটা তাৎপর্যকে শিশুধারণার মধ্যে সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করে দিয়েছে।

অব্যবহিত উত্তর-সাতচল্লিশে শিশু পত্রিকাগুলোর স্থূলভাবে লক্ষ্য ছিল দুটো, এক. পাকিস্তানের উপযুক্ত করে শিশুদের প্রস্তুত করা, সেভাবে তাদের জীবন গঠন, বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন, দুই. ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নৈকট্য সৃষ্টি, এ অংশটি কেবল পাকিস্তান সৃষ্টি হবার জন্যই নয়, মুসলমান সমাজের একটি সামগ্রিক দায়বদ্ধতা মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য এসবের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। একারণে সাধারণভাবে মুসলমান লেখকদের হাতে এগুলো প্রায়ই উপেক্ষিত হয়নি, তবে কোথাও কোথাও গুরুত্বহীন থেকেছে।

সাতচল্লিশের সীমান্ত বিন্যাস পূর্ব বাংলাকে যেভাবেই বিচ্ছিন্ন করে থাকুক না কেন শিশুধারণার উত্তরাধিকারের তা ঠিক প্রতিবন্ধক হয়নি। ফলে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শিশুধারণার মূল প্রবাহের যে বর্ণ ও গতিপ্রকৃতি তা সেভাবে ছিলই, অর্থাৎ একটি সীমাহীন মুক্ত আনন্দভুবনে শিশুকে শৈশবকে স্থাপন করে রেখে উপলব্ধির প্রয়াসগুলো ছিন্ন হয়নি। উপরন্তু সমকালীন বিভিন্ন জটিলতার মধ্যে রেখে শিশুকে উপলব্ধির যে প্রয়াস তা-ও একত্রে উত্তরাধিকারের অংশ হয়েছিল তবে অনিবার্যভাবেই এসবের মধ্যেকার হিন্দুত্বের অংশগুলো ঝরিয়ে নিয়ে। কারণও ছিল, বাংলার মুসলমান সমাজের নিজস্ব কিছু বিকাশের প্রয়োজন মুসলমান জনসংখ্যাধিক্য পূর্ব বাংলার মুসলমান লেখকদের গভীর দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের সৃষ্টিও সেই মুহূর্তে ছিল মুসলিম সমাজ চেতনা ও রাজনীতির অবিসংবাদিত দায়বদ্ধতার অংশ, শিশুসাহিত্য এবং সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলায় বাংলা সাহিত্য এ দায়বদ্ধতা থেকে সরে যেতে পারেনি। একদিকে যেমন রাজনৈতিক কারণে ছিল এ দায়বদ্ধতা তেমনি এর সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনৈতিক কারণে ছিল এ দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তির তৃষ্ণা, এ তৃষ্ণাই ক্রমে আরো অপরূপ হয়ে, আরো স্ফীত হয়ে লেখকদের অনেক দূর অগ্রসরও করে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং উত্তর-সাতচল্লিশে এবং প্রাক-একাত্তর পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় বাংলাদেশের শিশু সাময়িক পত্রিকায় এবং সর্বমোট শিশুসাহিত্যে শিশুবিকাশের শিশুধারণা বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে, এক. শিশুধারণা বিকাশকে অনেকখানি মুক্ত রেখেই পাকিস্তান রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তোলা দুই. পাকিস্তান রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে একে জড়িত না করা এবং একত্রে এর বিরোধী অবস্থানও সৃষ্টি না করা, তিন. মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিকটতর করা, চার. মুসলিম ঐতিহ্যের বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে ঔদাসীন্য, তবে এখানেও বিপ্রতীপ অবস্থান সৃষ্টি না করা, পাঁচ. সম্পূর্ণ ইহজাগতিক একটি অবস্থান গ্রহণ করা যা মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল না, ছয়. ইহজাগতিকতা সৃষ্টির নিমিত্ত হিসেবে প্রধানত বিজ্ঞানবুদ্ধিকে প্রসারিত করা, বাংলায় শিশুসাহিত্যে এ বিজ্ঞানবুদ্ধিকে ক্রমপ্রসারিত হতে দেখা গেছে। এরূপ উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের মধ্যে বাংলাদেশ আরো লাবণ্যময় প্রবৃদ্ধি অর্জন করা এবং কিশোর বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ফিকশনের মাধ্যমে এসবের সঙ্গে সাম্প্রতিকতম প্রয়োগিকতার সংযোগ সৃষ্টি করে তোলা, সাত. যুক্তিবোধকে অধিকতর প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সকল ক্ষেত্রেই শিশুসাহিত্যের মধ্যে উন্মোচিত করা, আট. ক্রমবর্ধমান আর্থসামাজিক আর্থরাজনৈতিক ও আর্থসাংস্কৃতিক সমস্যা কিংবা জটিলতাগুলো শিশুসাহিত্যের মধ্যে উন্মোচিত করা, আগামী দিনের

প্রস্তুতি হিসেবে এসবের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ও বস্তুনিষ্ঠ সংযোগ কিংবা পরিচয়-সম্পর্ক সৃষ্টি করে তোলা। এরূপ আরো কিছু হালকা অথবা গভীর সৃষ্টিলক্ষণ দ্বারা এগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব, এগুলো প্রায়ই বাংলাদেশ সৃষ্টির আগের কথা হলেও কোনো কোনোটি ছাড়া বাকিগুলো একাত্তরের কালসীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়েছিল, কোনো পর্যায়েই তা বিচ্ছিন্ন হয়নি। কেবল পাকিস্তান রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অংশটুকুই ঝরে গিয়েছিল, অনিবার্যভাবেই একে ঝরে যেতে হয়েছিল। এরূপ মৌল বিবর্তনের ফলে কবি-সাহিত্যিক যাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে নানাবিধ কারণেই নিবিড় হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন তাঁদের রাতারাতি বেশবাস পরিবর্তনের প্রয়োজন গভীর হয়েছিল তাঁরা সেভাবে নিজেদের পরিবর্তন করেও নিয়েছিলেন। ফলে লক্ষ করা যাবে, শিশুদের যাঁরা পাকিস্তানের জন্য আদর্শ করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের জন্য লক্ষ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন জিন্নাহ, তাঁরা রাতারাতি তদস্থলে বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবকে স্থাপন করে নিলেন। সুফিয়া কামালের মতো কালসচেতন লেখককেও এরূপ পরিবর্তনের মধ্যে দ্রুত পোশাকবদল করতে দেখা যায়। শিশুধারণা গঠনের এ অংশটি আপেক্ষিক, সুতরাং অনিবার্যভাবেই তা ধারাবাহিক নয়, তা দুর্বল এবং বাহ্যিক রাজনৈতিক পরিবর্তনসাপেক্ষ, শিশুসাহিত্যের সাময়িক পত্রিকা অংশে এ দুর্বলতাগুলোকেও প্রবল আবেগে অনুসৃত হতে দেখা যায়। এটাও শিশুসাহিত্যের অনিবার্য অংশ এ অর্থে যে, ইংরেজ আমলে ঔপনিবেশিক প্রভু ও রাজরাজড়াদের এরূপ আবেগমণ্ডিত উপস্থাপন হয়েছে, পাকিস্তান আমলে এসে কেবল ব্যক্তির দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পুনশ্চ সেখানে পরিবর্তন হয়ে গেল। এগুলো সামাজিক পরিণত বয়সীদের মানসিক অপরিণত অবস্থার এবং বিভিন্ন স্বার্থের নিকট শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দাস্যতাবৃত্তির ফল। এগুলো যদিও পৌনঃপুনিক পূর্বানুবৃত্ত, তথাপি শিশুধারণা গঠনের বিষয়ে এসবের তেমন কোনো স্থায়ী মূল্য নেই। শিশুধারণা গঠনের আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও রাজনীতির সঙ্গে এর ক্রমবর্ধমান সংযোগ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পরিণত জনপৃথিবীর সঙ্গে এটা শিশুভুবনের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। দুটাকে একত্রিত এবং একাকার করে দিয়েছে। শিশুসাহিত্যের সূচনাপর্বে নেপথ্যে ছিল দেশাত্মবোধ, পত্রিকাগুলো শিশুধারণা বিশ্বের সঙ্গে সমকালীনত্বের সূচনাপর্বে নেপথ্যে ছিল দেশাত্মবোধ, পত্রিকাগুলো শিশুধারণা বিশ্বের সঙ্গে সমকালীনতার সংযোগ সহজ করেছিল। পত্রিকার মিডিয়া হয়ে কালের কথা বা সমকালের কথা সমাজ ও সংস্কৃতি-চেতনার কথা রাজনীতিকথা একত্রে সহজ প্রবেশাধিকার অর্জন করেছিল, শিশুর ইহজাগতিক বিকাশের এবং সম্পর্কযুক্ত শিশুধারণা বিকাশের সঙ্গে এর মোটেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে উঠতে দেয়নি। শিশু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে এসবের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত মৃদু ছিল সামাজিক সমস্যাগুলো ক্রমেই প্রখর হয়ে আসছিল তা সত্য তবে রাজভক্তির অথবা রাজভীতির কারণে সেভাবে রাজনীতির কথামালা প্রখর হয়ে আসেনি তা-ও অসত্য নয়। পত্রিকাগুলো এক্ষেত্রে বহুবিধ সুযোগ সম্প্রসারিত করেছিল, ফলে সামাজিক সমস্যাগুলো চিরায়ত সাহিত্যে তুলনীয়ভাবে মন্থর পদবিক্ষেপে হলেও আসছিল। এগুলোই শিশু

সাময়িক পত্রিকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে ক্রমেই লাবণ্যপ্রভ এবং অপেক্ষাকৃত ক্রমবর্ধমান স্ফীত সলিলপ্রবাহ হিসেবে সৃষ্টি হয়ে উঠছিল তা লক্ষ করা যাবে।

শিশু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের প্রথা থেকেই ছেলে-শিশু এবং মেয়ে-শিশুর বিষয়ে অভিন্ন উপলব্ধি যেমন ছিল তেমনি পার্থক্যবোধও যে ছিল না তা নয়। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মাতৃমূর্তির অবস্থান বেশ বড় হয়ে আছে,[১০৯] পুরুষ দেবতা ও নারী দেবীর মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য কিংবা অধিক্ষেত্র সেভাবে সুচিহ্নিত নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই পুরুষ দেবতা ও নারী দেবী পরস্পরের পরিপূরক, উভয়ের সম্মিলিতরূপেই দেবলোকের অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল। নারীর দেবীরূপের মধ্যে একত্রে সংহাররূপ ও কল্যাণরূপ মিশ্রিত ছিল, সে অর্থে নারী শক্তির প্রতীক ছিল। কিন্তু হিন্দুর সামাজিক জীবনে নারীর পূর্ণ অবস্থান ঠিক দেবলোকের সাদৃশ্য থেকে সেভাবে গঠিত হয়নি, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের সীমাবদ্ধতার কারণে নারীর তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক অবস্থান ঠিক পুরুষের সমান্তরাল হতে পারেনি। তবে পাশ্চাত্যশিক্ষার ক্রমপ্রসারের ফলে নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন ও সমাজ অংশে পরির্তনের সূত্রপাত হয়েছিল, বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং সতীদাহ নিবারণের প্রয়াস থেকেও তা বোঝা যায়। শিশু সাময়িক পত্রিকায় ছেলে-শিশুর ও মেয়ে-শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের মধ্যে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত কিংবা লক্ষণ অনুভব করা যাবে। এরূপ সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন যেখানে সরাসরি এসেছে পত্রিকাগুলোর ভূমিকা সেখানে স্পষ্ট নয় অথবা কম্পিত আকারে দৃশ্যমান তবে মেয়ে-শিশুর তুলনায় ছেলে-শিশুর আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি কিংবা সুপ্রচুর। শিশু ও শৈশবের আনন্দময় প্রকাশ হিসেবে দুয়ের মধ্যে গুরুত্বের ঈষৎ তারতম্য থেকে থাকতে পারে, বড় রকমের বৈষম্য অন্ততপক্ষে পত্রিকায় লক্ষ করা যায়নি। তথাপি বৈষম্য ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে বৈষম্য কিঞ্চিৎ কমেও আসছিল তা সত্য, মেয়ে-শিশু ও ছেলে-শিশুর আবির্ভাবের মধ্যে তা দেখা যাবে। হিন্দু সমাজে বেশ কিছু মহিলা লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল। শিশু সাময়িক পত্রিকার ফোরামে তাঁদের বিভিন্ন রচনায় মেয়ে-শিশু ও ছেলে-শিশুর গুরুত্ব বদলে গিয়েছিল তা নয় তবে মেয়ে-শিশুর ওপর কিছু গুরুত্ব পড়েছিল। তা সত্ত্বেও মেয়ে-শিশু ও ছেলে-শিশুর মধ্যেকার ও ব্যবধান মুছে যায়নি, এমন-কি রবীন্দ্রনাথও এ সীমাবদ্ধতা থেকে যে মুক্ত ছিলেন না সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।[১১০] প্রথমদিকে মুসলমান শিশুর কোনো অস্তিত্ব এ শিশুসাহিত্যে ছিল না, পরে এগুলো দৃশ্যমান হয়েছে। মুসলমান সমাজে মেয়ে ও ছেলে-শিশুর ক্রমবর্ধমান আবির্ভাব লক্ষ করা গেছে উত্তর-সাতচল্লিশে পূর্ববাংলায় এবং মুসলমান লেখকদের হাতে, এ সকল শিশুও ছিল সমকালীন মুসলমান সমাজের অংশ। হিন্দু সমাজের অনরূপ দৃশ্য পূর্বানুবৃত্ত হয়নি তার কারণ এ দুয়ের ধর্মীয় ও সামাজিক পশ্চাৎভূমি পৃথক ছিল। তথাপি নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে মুসলমানের সমাজচেতনা অনগ্রসর ছিল বলে মেয়ে-শিশু এবং ছেলে-শিশুর অবস্থানের মধ্যে অনিবার্য পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। এখানেও ছেলে-শিশুর তুলনায় মেয়ে-শিশুর আবির্ভাব তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল। ছেলে-শিশুর আবির্ভাব অনেক বেশি কিংবা সুপ্রচুর ছিল, আবির্ভাবের তারতম্য ঠিক অধিকারের সমার্থক নয়।

তথাপি নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের অভাব মেয়ে-শিশুকে প্রকৃতপক্ষে ছেলে-শিশুর বিস্তর পশ্চাতে টেনে রেখেছিল। এরূপ যে টেনে রেখেছিল সে বিষয়ে সামাজিক উপলব্ধিও অনেক বিলম্বে সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছিল, শিক্ষা ও বিত্তে অনগ্রসরতা ছিল এর অন্যতম কারণ। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে এরূপ সীমাবদ্ধতা কিছুটা কমেছিল তার প্রকাশ এ সময়ে পত্রিকার মধ্যেও লক্ষ করা যাবে। তবু মেয়ে-শিশু এবং ছেলে-শিশুর মধ্যে বৈষম্য ছিল, এ বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়ে কিংবা বৈষম্যের কারণসমূহ চিহ্নিত করার বিষয়ে মহিলা শিশুসাহিত্যিকদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মেধাবী ভূমিকা নেই। মেয়ে ও ছেলে-শিশুর মধ্যেকার এ ব্যবধান বা বৈষম্য প্রকৃতপক্ষে সামাজিক দৃষ্টান্ত থেকে বিকাশপ্রাপ্ত, বৈষম্যের উৎস শক্তিমান হয়ে থাকার কারণে শিশুসাহিত্যে এসবের প্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হতে পারেনি। সমগ্র বিশ শতকের শিশু সাময়িক পত্রিকায় এসবের অকৃত্রিম প্রকাশ রয়েছে। শিশুধারণা গঠনের ব্যাপারে এসবের উপসংহার এখানে যে, শিশুর সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্য সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল এবং শিশু সাময়িক পত্রিকায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। শিশুর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে বলে শিশুর ইহজাগতিক বিকাশের দিকটি অত্যধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে, মানবজীবনের ধারাবাহিক ইহজাগতিক অস্তিত্বের প্রধান গুরুত্ব-কেন্দ্র এবং উৎস-কেন্দ্র চিহ্নিত হয়েছে এখানে। শিশুর অস্তিত্বের সমগ্রতা সামনে এসেছে, দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন ছেদক চেতনাস্রোতের মধ্যে স্থাপন করে। শিশুর সর্বমোট ইহজাগতিক অস্তিত্ব চিহ্নিত হয়েছে সে কারণে স্থানীয় অবস্থানের মধ্যে শিশুর সামনে একটি বৈশ্বিক পরিমণ্ডল উন্মোচিত হয়েছে যেরূপ পূর্বে ছিল না। বিভিন্ন জটিল চেতনাপ্রবাহের মধ্যে শিশুর মানসিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে, শিশুর চলমান মুহূর্তের বিদ্যমান সকল বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয় করে নেবার ক্ষমতাও অর্জন করেছে। শিশুর এরূপ একটি অবস্থানের ফলে পরিণত মানুষের পক্ষে পুনশ্চ বিস্মৃতপ্রায় শৈশবে ফেরা সহজ হয়েছে, শিশুধারণার মধ্যে ইহজাগতিক সকল মানুষের মিলনস্থল সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। আবার একই কারণে শিশুধারণার ক্ষেত্র অনেক সুপরিসর কিংবা প্রশস্ত হয়েছে এবং বিরাজমান শিশুভবনের শিশু আনন্দভুবনের মধ্যে বিভিন্ন জটিল আর্থসামাজিক আর্থসাংস্কৃতিক ও আর্থরাজনৈতিক চেতনাপ্রবাহের আনন্দমিলন সম্ভব হয়েছে। এর ফলে শিশুধারণা এখন সুপ্রশস্ত একটি ভুবন, সুপরিসর একটি পৃথিবী যেখানে শিশুকে তার সমগ্র অস্তিত্বের পূর্ণতাবোধ নিয়েই পাওয়া যাবে। এগুলো বাংলায় সামাজিক শিশুধারণার এবং একত্রে বাংলা সাহিত্যের শিশুধারণার প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে। শিশু সাময়িক পত্রিকায় এবং গ্রন্থিত শিশুসাহিত্যে এরূপ একটি ধারণাবিশ্ব একত্রে সৃষ্টিপ্রাপ্ত ও ক্রম বিকাশপ্রাপ্ত হতে পেরেছিল। শিশু সাময়িক পত্রিকার ভূমিকা এখানে সর্বাধিক, এর পরই গ্রন্থিত শিশুসাহিত্যের অবস্থান, দুয়ের মিলিতরূপে সাম্প্রতিক এবং চলমান সমাজচেতনার সঙ্গে যুক্ত পূর্ণ শিশুধারণাকে পাওয়া যাবে, শিশুর ইহজাগতিক সঠিক অবস্থান প্রমাণিত হবে।

১. *শিশু*, বৈশাখ, ১৩১৯
পত্রিকার কোনো সংখ্যার বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া সূত্র পুনরাবৃত্ত করা হয়নি। সুতরাং পরবর্তী সূত্র উল্লেখের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন রচনার আলোচনা একই সূত্র থেকে বোঝাবে।
২. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯
৩. ঐ, পৌষ, ১৩১৯
৪. ঐ,
৫. ঐ, মাঘ, ১৩১৯
৬. ঐ, ফাল্গুন, ১৩১৯
৭. ঐ, চৈত্র, ১৩১৯
৮. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
৯. ঐ, ভাদ্র, ১৩২১
১০. ঐ, আশ্বিন, ১৩২১
১১. আতোয়ার রহমান, *শিশুসাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, পৃ-৩০
১২. ঐ, পৃ. ৯১
১৩. *আঙুর*, বৈশাখ, ১৩২৭
১৪. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭
১৫. ঐ, আষাঢ়, ১৩২৭
১৬. *শিশুসাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ৩৫
১৭. ঐ, পৃ. ৯১
১৮. *শিশু সাথী*, বৈশাখ, ১৩৩০
১৯. ঐ, শ্রাবণ, ১৩৩০
২০. পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায়।
২১. *শিশু সাথী*, আশ্বিন, ১৩৩০
২২. ঐ, কার্তিক, ১৩৩০
২৩. *শিশুসাহিত্যে* মুসলিম সাধনা, পৃ. ৬২
২৪. *শিশু সওগাত*, বৈশাখ, ১৩৪৭
২৫. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
২৬. ঐ, আষাঢ়, ১৩৪৭
২৭. ঐ, শ্রাবণ, ১৩৪৭
২৮. ঐ, শ্রাবণ, ১৩৪৮
২৯. ঐ, ভাদ্র, ১৩৪৮

৩০. ঐ, কার্তিক, ১৩৪৮
৩১. ঐ, মাঘ, ১৩৪৮
৩২. ঐ, বৈশাখ, ১৩৪৯
৩৩. *বার্ষিক শিশু সাথী*, আশ্বিন, ১৩৩৯
৩৪. ঐ, ১৩৪৮
৩৫. *কিশলয়*, বৈশাখ, ১৩৪৩, পৃ. ৯১, পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।
৩৬. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩
৩৭. ঐ, ভাদ্র, ১৩৪৩
৩৮. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪
৩৯. *কিশোরী*, আশ্বিন, ১৩৫৮
৪০. *খেলাঘর*, আষাঢ়, ১৩৬২
৪১. ঐ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬২
৪২. ঐ, ফাল্গুন, ১৩৬২
৪৩. পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায় ।
৪৪. খেলাঘর, কার্তিক, ১৩৬২
৪৫. পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায় ।
৪৬. *খেলাঘর*, পৌষ, ১৩৬২
৪৭. ঐ, বৈশাখ, ১৩৬৩
৪৮. ঐ
৪৯. ঐ, আষাঢ় ১৩৬৩
৫০. পূর্বে, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।
৫১. *খেলাঘর*, আষাঢ়, ১৩৬৩
৫২. ঐ, শ্রাবণ, ১৩৬৩ এবং ভাদ্র, ১৩৬৩
৫৩. *সবুজ পাতা*, আগস্ট, ১৯৬২
৫৪. ঐ, নভেম্বর, ১৯৬২
৫৫. ঐ, আগস্ট, ১৯৬৩
৫৬. ঐ, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩
৫৭. ঐ, জানুয়ারি, ১৯৬৪
৫৮. ঐ, মার্চ, ১৯৬৪
৫৯. *কচি ও কাঁচা*, অগ্রহায়ণ, ১৩৭১
৬০. ঐ, পৌষ, ১৩৭১
৬১. ঐ, মাঘ, ১৩৭১

৬২. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২
৬৩. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪
৬৪. *মুকুল*, চৈত্র, ১৩৭১
৬৫. ঐ, বৈশাখ, ১৩৭২
৬৬. ঐ, আষাঢ়, ১৩৭২
৬৭. ঐ, ভাদ্র, ১৩৭২
৬৮. ঐ, আশ্বিন, ১৩৭২
৬৯. ঐ, কার্তিক, ১৩৭২
৭০. *টাপুর টুপুর*, কার্তিক, ১৩৭৩
৭১. ঐ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩
৭২. ঐ, পৌষ, ১৩৭৩
৭৩. ঐ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩
৭৪. ঐ, পৌষ, ১৩৭৩
৭৫. ঐ, মাঘ, ১৩৭৩
৭৬. *নবারুণ*, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৯
৭৭. পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায় ।
৭৮. *নবারুণ*, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৯
৭৯. ঐ
৮০. ঐ, মাঘ, ১৩৭৯
৮১. ঐ, ফাল্গুন, ১৩৭৯
৮২. ঐ, চৈত্র, ১৩৭৯
৮৩. ঐ, বৈশাখ, ১৩৮০
৮৪. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০
৮৫. *ধানশালিকের দেশ*, ফাল্গুন, ১৩৭৯
৮৬. পূর্বে, শিশু সওগাত আলোচনা দ্রষ্টব্য ।
৮৭. পূর্বে, প্রথম অধ্যায় ।
৮৮. পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায় ।
৮৯. *ধানশালিকের দেশ*, চৈত্র, ১৩৭৯
৯০. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০
৯১. ঐ, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৮০
৯২. ঐ, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮০
৯৩. ঐ, ফাল্গুন-বৈশাখ, ১৩৮০-৮১

৯৪. পূর্বে, প্রথম অধ্যায়, শিশু একাডেমী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।
৯৫. *শিশু*, আশ্বিন, ১৩৮৪
৯৬. ঐ, কার্তিক, ১৩৮৪
৯৭. ঐ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪
৯৮. ঐ, পৌষ, ১৩৮৪
৯৯. ঐ, মাঘ, ১৩৮৪
১০০. ঐ, চৈত্র, ১৩৮৪
১০১. *সওগাত*, পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়
১০২. শিশু, বৈশাখ, ১৩৮৫
১০৩. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫
১০৪. ঐ, আষাঢ়, ১৩৮৫
১০৫. ঐ, শ্রাবণ, ১৩৮৫
১০৬. Article 13. Convention on the Rights of the Child, *International Documents on children.*
১০৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, *ছড়া-সমগ্র*, কলিকাতা, ১৯৮৫, বাণীশিল্প, পৃ.৩৬
১০৮. The world is wide. Everything in it can be used to make books for children. But...the theme of these
should be. The earth is beautiful! Living is wonderful! Believe in makind!
Francis Lander Spain, The contents of the Basket. P.49
উদ্ধৃত, আতোয়ার রহমান, *শিশুসাহিত্য নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, পৃ.৬
১০৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মুখলেসুর রহমান, *মাতৃকা*, ঢাকা, ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী ।
১১০. পত্রাবলী, ২৫ শ্রাবণ, ১৩১০, *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক, ১৩৪৯, পৃ. ২২৪-২৫

উৎস:

[লেখক:]

শিশুর মানস গঠনে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠাগার

আ ল ম তা লু ক দা র

নানান জনের নানান মত। বিভিন্ন পথিকের বিভিন্ন পথ। এমন মনোভাব জাগ্রত থাকলেও একটা বিষয়ে আমাদের অভিমত শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। কারণ শিশুদের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। তারাই নতুন কিছু করতে পারে, নতুন কিছু গড়তে পারে। আমরা কেউ বলতে পারি না একটি শিশু বড় হয়ে কী হবে? কিন্তু গরু-ছাগলের বাচ্চা বড় হয়ে কী হবে তা অতি সহজেই বলতে পারি। মানবশিশু সমন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা একেবারেই অসম্ভব। তো এই অসম্ভব যে সম্ভব করতে পারে তার প্রাথমিক নাম শিশু। কেউ কেউ শিশুকে যিশুর সাথে তুলনা করেছেন। তো এই শিশুদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সামনে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি হতে হয়।

প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবার। আর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির নাম বিদ্যালয়। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি একজন শিশুর মানস গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। আরো অগ্রসর হওয়ার আগে আমরা যদি প্রশ্ন করি "বিদ্যা লাভের উদ্দেশ্য কী? জ্ঞান, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার উদ্দেশ্য? যশ, সিদ্ধি, সাফল্য। কার সাফল্য? যে বিদ্যা আয়ত্ত করে তার। বিদ্যা লাভের উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসফলতা।" আর এ কথা তো সবাই মানি, ব্যক্তি হতেই সমষ্টি।

আমরা জানি মানুষ দুইভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। জন্মগত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। শিশু কিছু জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান জন্মসূত্রেই লাভ করে থাকে। আর পরিবারের সদস্য হিসেবে সদস্যদের সাথে মিলেমিশে তাদের আচরণ দেখে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে থাকে। শিশুর পরিবার যদি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয় তা হলে শিশুটি একভাবে গড়ে উঠবে আর যদি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন না হয় তাহলে অন্য দিগন্তের যাত্রী হওয়ার আশংকা থেকে যায়। একজন শিশুর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান হল বিদ্যালয়। একটি শিশু কিভাবে কী পরিবেশে কী অবস্থায় বিকশিত হতে পারে? তার মানসিক গঠন কেমন হবে তা একটি কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটির লেখক সিলিয়াম। একটি পোস্টার হতে সংগৃহীত হয়েছে :

সমালোচনার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে নিন্দা করতে শেখে
শত্রুতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে হানাহানি করতে শেখে
বিদ্রূপের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে অপরাধ করতে শেখে
ধৈর্যের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে সহিষ্ণুতা শেখে
উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে ।
প্রশংসার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে তার মূল্য দিতে শেখে
সহতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে ন্যায়পরায়ণতা শেখে
নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে বিশ্বাসী হতে শেখে ।
গ্রহণযোগ্যতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে নিজেকে পছন্দ করতে শেখে
স্বীকৃতি আর বন্ধুত্বের মাঝে বেড়ে উঠলে
সে শিশু পৃথিবীতে ভালোবাসা খুঁজে পেতে শেখে ।

পরিবার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রযোজনায় একটি শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে বা উঠতে থাকবে এটাই প্রচলিত ধারণা। শিশু আনন্দের সাথে শিখবে-লিখবে-খেলব এটাই কাম্য। বিদ্যালয়ের পরিবেশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আচার ব্যবহারের উপর শিশুর মানসিক গঠন কেমন হবে তা নির্ভর করে। শুধু পড়ে নয়, শুনে এবং দেখেও শিশুরা শিখে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ কতটা আনন্দদায়ক, কতটা আপন মধুর, কতটা নিরাপদ, কতটা ভালোবাসায় পূর্ণ, কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, কতটা প্রশংসামূলক বা উৎসাহমূলক তার উপর শিশুর মানস গঠনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে। একটি শিশু যখন ভাবতে পারবে তার শিক্ষক/শিক্ষিকা সব মুসকিল আছানের উপযুক্ত মানুষ তবে সে বিকশিত হবে একরকম ভাবে আর যদি অন্যরকম হয় তাহলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে আপনাআপনি ভাবে।

আমরা একথা খুব স্পষ্ট করেই বলতে পারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর মানস গঠনে বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের আচার-আচরণ, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ইত্যাদি অনেককিছুর উপর নির্ভর করে

থাকে। 'শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন'– এই আপ্তবাক্যটির মধ্যেও শিশুর মানসিক গঠনের ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব শিশু সম্মেলনে বিশ্বের প্রতিটি দেশ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কী সেই শিশু অধিকার? প্রধানত দশটি অধিকার নিম্নরূপ :

১. বাদ যাবে না কোনো শিশু
২. সবার আগে শিশু
৩. সকল শিশুর চাই আদর-যত্ন
৪. শিশুনির্যাতন আর শোষণ বন্ধ করুন
৫. শুনতে হবে শিশুর কথা
৬. প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষা
৭. এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ করুন
৮. যুদ্ধ থেকে শিশুকে রক্ষা করুক
৯. শিশুর স্বার্থে পৃথিবীকে বাঁচান
১০. দারিদ্র্য বিমোচনে শিশুর জন্য বিনিয়োগ।

এইসব শিশু অধিকার বাস্তবায়ন করলে শিশুদের মানসিক গঠনে ইতিবাচক বিপ্লব ঘটবে বলে বিশ্লেষকদের অভিমত।

মানুষ গড়ার কারখানা হল বিদ্যালয়। বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাংলাদেশে নানা পদ্ধতির নানান নামে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। সরকারি, বেসরকারি, রেজিস্টার্ড, নন-রেজিস্টার্ড, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, এক্সপেরি মাধ্যমিক স্কুল ইত্যাদি নামে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা—৮১৫০৮টি, শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা—৩৮১৭২৪ জন, ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা—১,৬৫,৩৯,৩৬৩ জন। গত ২০০৯ সালে ড্রপ আউটের সংখ্যা—৪৫.১%। পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রায় অর্ধেক ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণের পাদপীঠ হতে হারিয়ে যাচ্ছে। যে শিক্ষা অধিকার, যে শিক্ষা সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম তা অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে।

সচেতন জনগণের প্রশ্ন কেন এই ঝরে পড়া? কেন এই হারিয়ে যাওয়া? এর কারণ অনেকগুলো হতে পারে। তবে কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম হল:

১. অর্থের অভাব;
২. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না;
৩. পড়ার আনন্দ বা মজা থেকে বঞ্চিত;
৪. যথেষ্ট আদর-যত্ন বা মূল্যায়ন করা হচ্ছে না;
৫. মনিটরিং ঠিকমতো হচ্ছে না;

৬. বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না;

৭. শিশুদের বিকশিত হবার বিভিন্ন ধরনের সুযোগের অভাব;

৮. শিক্ষকের স্বল্পতা;

৯. শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রদান;

১০. প্রতিদিন শিক্ষকদের জন্য গড়ে ৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে হয়।

নির্বাচিত পাঠ্যবই বাদেও জীবনের জন্য অনেক কিছু শেখার, জানার প্রয়োজন রয়েছে। একটি শিশু হয়তো পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগী নয় কিন্তু গল্প-কবিতায় তার খুব আগ্রহ। অন্যজনের হয়তো গান-বাজনার আগ্রহ, অন্যজনের হয়তো কাব স্কাউটিং-এ আগ্রহ, অন্য জনের হয়তো অভিনয়ে, অঙ্কনে কিংবা আবৃত্তিতে আগ্রহ। কারো কারো হয়তো নাচে বা বিতর্কে আগ্রহ। এখন যদি একটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই ব্যতীত অপাঠ্য অর্থাৎ এক্সট্রা কারিকুলাম কিছু না থাকে তাহলে একজন শিক্ষার্থীর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ মারা যেতে পারে। একটি ক্লাশে ১০/১২ জন ছাত্র/ছাত্রী বেশ ভালো মানের থাকে। বাকিরা হয়তো দুর্বল। কিন্তু তাদের জন্য অন্যরকম সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে সে সুযোগটা থাকতেই হবে।

ওই যে গল্প আছে না, আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের, সে দৈত্যটা কেন মুক্তি পাচ্ছে না? তার এত ক্ষমতা দুনিয়ার সব হাজির করতে পারে, কিন্তু নিজের মুক্তির জন্য কিছুই করতে পারে না। কারণটা কী? কারণ হল তার মধ্যে শিক্ষা নেই, শিক্ষার আলো নেই।

অনেকের মতে আগে আগে 'কাঁচা ঘর পাকা শিক্ষক ছিল'। এখন পাকা ঘর কাঁচা শিক্ষক। শিক্ষকতা একটা মহতী পেশা। এটা চাকরি নয়। তাঁকে তাঁর ছাত্র/ছাত্রীরা শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। তো তিনি যদি আপটুডেড না থাকেন নিজে আনন্দের মাঝে না থাকেন, মজার মজার কথা বলে মুগ্ধ না করতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদের কি দেবেন? আরো একটি বিষয় সংশ্লিষ্টদের বিবেচনায় রাখতে হবে। শিশু মনস্তত্ত্বটা কী? শিশুরা বাবা-মায়ের কাপড় পড়তে চায়, জুতা-মোজা পড়তে চায়, কারণটা কী? কারণটা হল সে বুঝাতে চায় আমাকে ছোট ভেব না। এই দেখ আমি বাবার জুতা পড়তে পারি, মায়ের কাপড় পড়তে পারি। সোজা অর্থ সে নিজেকে বড় ভাবে এবং বড় হতে চায়। প্রকৃতি রঙ বদলায়। মানুষও বদলায়। প্রকৃতি+সংস্কৃতি = কীর্তিমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় মানুষের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত। কিন্তু কবর সাড়ে তিন হাতের বেশি লাগে। এই কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি পাঠাগার বা লাইব্রেরি কর্নার থাকলে শিক্ষকদের যেমন সুবিধা শিক্ষার্থীদের একটা আলোর ভাণ্ডারের কাছাকাছি রাখা। আর পাঠাগারের গুরুত্ব যে কতটা জরুরি তা নতুন করে বলার বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—"বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে? কে জানিত সঙ্গীতকে হৃদয়ের আকাশে জাগ্রত আত্মার আনন্দ ধ্বনিকে, আকাশের দৈব বাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দি করিবে, অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে"?

উক্ত বাণী বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। না বুঝার কিছু নেই। বিপদ হল অনুধাবন করে কার্যকরী ব্যবস্থা না করা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি শিশু পাঠাগার থাকলে আর সেই পাঠাগারে মজার মজার দেশি-বিদেশি ছড়া, কবিতা, জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের বই শিশুদের পাঠের সুযোগ করে দিলে তার মধ্যে এক ধরনের জগৎ সৃষ্টি হবে। সে জগতে কল্পনার জগৎ, স্বপ্নের জগৎ, বড় হবার ইচ্ছা, ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষা। তার ভিতর সৃষ্টি হবে একধরনের সাহস। সে ভাববে, আমিও জানি, আমিও বলতে পারি। আত্মবিশ্বাস, আত্মজিজ্ঞাসায় তুলনা করার পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা নিজের অজান্তেই তৈরি হয়ে যাবে। শিক্ষক যদি দীক্ষক না হন তাহলেও সমস্যা। একজন শিক্ষককে অবশ্যই বুঝতে হবে এটা কাঁচা মাটি। এখন যেভাবে ইচ্ছা সে ভাবেই এদের চরিত্র, এদের মানসিক কাঠামো গঠন করা যাবে। তা না হলে দেখা যাবে গন্তব্য নেই, গমন আছে, ক্ষুধা নেই অথচ ভুঞ্জন আছে, বক্তব্য নেই, বাক্য আছে।

তাই যদি হয় তাহলে কী অনুভব?
ঠাণ্ডায় পুড়ে যাচ্ছে হাত
আলোকিত অন্ধকার রাত।

না, তা তো আমরা চাচ্ছি না। আমরা চাই সভ্য ভব্য হতে। আলোকিত হতে। আমরা তো অনেকেই জানি সভ্যতা কী? সভ্যতা হচ্ছে ধর্মাধর্ম জ্ঞান, নীতি-অনীতি, বোধ, রুচি-অরুচির বিচার। যেখানে সভ্যতা নেই, সেখানে সত্যিকারের ভালো জিনিসের দাম নেই।

আমাদের আগামীদিনের নাগরিকদের সভ্য করতে হলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, পড়ুয়া জাতি হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে হবে। পড়ার অভ্যাস শিশুবেলায় গড়ে না উঠলে মেধার বিকাশ হবে না। আমাদের দেশের জন্য জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সম্পন্ন মানুষ দরকার। যদি তা না হয়, যদি সবাই মিলে নিজ

নিজ দায়িত্ব পালন না করি তাহলে ওই ধারণাই ঠিক হবে, যা Everybody করবে তা Anybody না করলে Nobody করবে। আর ঘোড়ার বাচ্চার জায়গায় ঘোড়ার ডিম প্রত্যাশা করলে কেমন হবে?

"ঘোড়া খায় হিমশিম এ খবর আচ্ছা
কিছুতেই হয় না ডিম হয় খালি বাচ্চা
অথচ বাজারময়
ঘোড়ার ডিমের জয়
চিন্তিত ঘোড়া কয় এ আপদ আচ্ছা

যতই চেষ্টা করি হয় খালি বাচ্চা ।”

সর্বশেষে কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই বলা যায় চরিত্রবান, দায়িত্ববান, সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাগার/কর্নার স্থাপনে এবং তা সঠিকভাবে চালু রাখার মাধ্যমে নিয়মিত পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে শিশুদের ইতিবাচক মানস গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ।

[লেখক: শিশু সাহিত্যিক, ছড়াকার । সরকারী কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত ।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের শিশুনাটকের চর্চা: সংকট ও সম্ভাবনা

তা ন ভী র আ হ মে দ সি ড নী

বাংলাদেশের শিশু-নাট্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বজুড়ে শিশু-নাট্যের ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যায় । এর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের শিশুনাট্যের সংকট ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা যেতে পারে । এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা যায়, সতের শতকে রাশিয়ায় শিশু-নাট্যচর্চা শুরু হয় । স্কুলভিত্তিক এই নাট্যচর্চার পেছনে ভাবনা ছিল, শিশুরা বিনোদনের মাধ্যমে পাঠকক্ষের জটিল ও কঠিন বিষয় থেকে নিজেদের খানিকক্ষণের জন্য মুক্ত করতে পারবে । যার ফলে স্কুলভিত্তিক নাট্যচর্চা ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছিল । এই সময়ের নাট্যচর্চায় পেশাদারিত্ব ছিল না । বরং শখের নাট্যচর্চা হিসেবে চর্চিত হয় । অক্টোবর বিপ্লব পরিস্থিতি পাল্টে দেয় । শিশুদের নাট্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দানই নয়, বরং নাট্যদল গঠনের দিকে অভিনিবেশ করা হয় । রাষ্ট্রীয় শিশুনাট্যদল গঠিত হতে থাকে । এই কাজে প্রথম হাত দেন সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক, বিপ্লবী এ ভি

লুনাচারস্কি। তিনি বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম শিক্ষা কমিশনার ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯২০ সালে গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় শিশুনাট্যদল। অর্থাৎ শিশুদের থিয়েটারে আগ্রহী করতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম উদ্যোগ নেয়। এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন, এ এ বারিন্টসেভ, এন আই সাটস, লু, এম বন্দি, জি এল রোসেল, এ আই সলোমারস্কি, এস লা গরোডিসকিয়া প্রমুখ। একই সময়ে বিভিন্ন শহরে নাটকের দল তৈরি হতে থাকে। ১৯৩০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা ভাষা-ভাষী অঞ্চলে নাটক প্রদর্শন করতে থাকে ২০টি শিশুনাট্যদল। প্রতি বছরই দলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। একই সময়ে বেশ কয়েকটি পুতুলনাচের দল গঠিত হয়। রাষ্ট্রের অর্থায়নে দলসমূহের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

প্রথমদিকে লোকগল্পসমূহ নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চায়িত হয়। আবার কখনো-বা শিশুতোষ গল্পের মঞ্চরূপ নিয়ে আসে শিশু নাট্যদলসমূহ। এসব নাটকে রঙিন জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আবার কখনও-বা শিশুদের খেলা নিয়ে মঞ্চায়িত হয় নাটক। একথা অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই যে রুশ বিপ্লব শিশুনাট্যের ক্ষেত্রে নতুন ভূমি কর্ষণের সুযোগ এনে দেয়। বেশ কয়েকজন নাট্যপরিচালক এবং সংগঠক নাটকের ক্ষেত্রে আপন মেধা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এই নাট্যদলসমূহ সক্রিয় ছিল। বিষয় এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তারা নতুনতর অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়। ১৯৭১ সালে প্রায় ৪৬টি শিশু নাটকের দল ছিল– যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে নাটক মঞ্চায়িত করতে থাকে। একই সময়ে বড়দের নাটকের দলগুলো আলাদা করে শিশুদের জন্য নাটক মঞ্চায়িত করত। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নাট্যচর্চার প্রভাবে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, জার্মানি, চেকোস্লাভাকিয়া ইত্যাদি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে শিশুনাট্যচর্চা শক্তিশালী হতে থাকে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, এখানে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তার সবগুলোই রাষ্ট্র নিয়েছিল। কেননা জাতিকে সম্মুখবর্তী করার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভেবেছিল তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। তাদের ভাবনায় ছিল, শিশুকে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে আগামী দিনের জাতি গঠনের কাজ করা যাবে। শিশুর সাংস্কৃতিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তারা প্রাণময় ভূমিকা রাখে।

উল্টোপক্ষে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে এই উদ্যোগ ব্যক্তিপর্যায়ে নেয়া হয়। ফলে এতে পেশাদারিত্বের চেয়ে শখের নাট্যচর্চা করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেহেতু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেই তাই তা শখের নাট্যচর্চা হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়। কয়েকটি নাট্য উৎসব কিংবা মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই চর্চা টিকে আছে পাশ্চাত্যে। একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ অবশ্য শিশু নাট্যচর্চার জন্য একটি ভূমি তৈরি করতে পেরেছে। সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষীণ পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও ব্যক্তি ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেট পুঁজিরও ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে থিয়েটার তার শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সদ্য লড়াই করা যুবকরা লড়াইয়ের নতুন ভূমি সন্ধান করতে গিয়ে থিয়েটারকেই সঙ্গী করে। করে নাট্যচর্চার সাথে

রাজনীতির গভীর সম্পর্ক আছে। যেহেতু এটা একক ব্যক্তির কাজ নয় তাই থিয়েটারকে সমষ্টির মাঝে অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। বাংলাদেশে যে গতিতে থিয়েটার অগ্রসর হচ্ছিল তাতে বাধা শুরু হয় ৭৫-পরবর্তী রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে। এ সময় সামরিক শাসকেরা ক্ষমতা দখল করেন। তাদের প্রধান প্রবণতা ছিল গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে দখলবাজি। এক্ষেত্রে অবৈধ ক্ষমতাদখলকারীদের অস্ত্র হয় সামরিক ও বেসামরিক আমলারা। একই সাথে তারা ধর্মকেও সঙ্গী করে টিকে থাকার জন্য। থিয়েটার যেহেতু মানুষের চিন্তন নিয়ে কাজ করে তাই সামরিক স্বৈরশাসকেরা থিয়েটারকে তাদের গোপন শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন দ্বারা নাটককে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা এ সময়ে ছিল। আবার বিপরীতক্রমে লক্ষ করা যায়, নাট্যকর্মীরা নিজের শক্তিকে ঝালিয়ে নিতে সব সময় সচেষ্ট ছিল। তাই সামরিক শাসনের সময়ে মঞ্চায়িত হয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার নাট্যকার ব্রেখটের নাটকসমূহ যেখানে জনগণকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে সক্রিয় হতে আহ্বান জানানো হয়। স্বৈরশাসন ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে শৈল্পিক দ্রোহ করে রচিত হয় নাটকসমূহ। গভীর রাজনৈতিক প্রত্যয়জাত হয়ে পথনাটক আন্দোলনও নিজ শক্তিতে রাজপথে দ্রোহ করে। বাংলাদেশের এমনি প্রেক্ষাপটে শিশু নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭০-এ উদ্যোগ নেওয়া হলেও কচিকাঁচার মেলা ১৯৭৩ সালে মঞ্চস্থ করে নাটক 'আলোর ফুল'। ১৯৭৪ সালে ছোট্ট থিয়েটার নামে একটি নাটকের দল গঠিত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় নাটকের দল ঢাকা শিশুনাট্যম। বাংলাদেশে শিশুনাট্যচর্চায় একটি গুরুত্ববহ নাম প্রফেসর ইমেরিটাস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর বাসায় গঠিত হয় ঢাকা লিটল থিয়েটার। এই দল গঠনের পেছনে আরও যাঁরা ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, নাজমা জেসমিন চৌধুরী, সালাহউদ্দিন জাকী, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, রাইসুল ইসলাম আসাদ, আফজাল হোসেন, মাহবুব আলী, সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন, সেলিম আল দীন প্রমুখ। কিন্তু তাঁদের এ উদ্যোগও সফল হয়নি। নিয়মিত নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

শিশু নাটকের দল গঠনের এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আরও দুটি ধারা লক্ষ করা যায়:

প্রথম ধারাটি হল বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার চর্চারত দলসমূহের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে শিশু নাটকের দল গড়ে তোলা।

দ্বিতীয় ধারাটি হল ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে 'থিয়েটার' কোর্স হিসেবে পাঠ্য রাখা আবার বিশেষ বিশেষ দিবসকেন্দ্রিক নাট্য প্রদর্শনী হয়।

বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটারভুক্ত দলসমুহ মূলত দুটি কারণে শিশু নাটকের দল গঠন করে। প্রথম কারণটি হল তাদের নাট্যকর্মীর সংকট মোচনের কাজ করবে শিশুনাট্যদল। এখান থেকে যে শিশু বড় হবে সে এসে মূল দলে কাজ করবে। একই সাথে তার একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ থাকার জন্যে নতুন করে কর্মশালা করার ঝক্কি থাকবে না। প্রশিক্ষিত নাট্যকর্মী তৈরি ছাড়াও দলের কোনো একজনকে নির্দেশক হিসেবে তৈরির জন্য এই শিশুদলে নাটক তৈরির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এখানে যেমন একজন নতুন নির্দেশক পাওয়া যায় আবার তার অনুশীলনের জন্য একটি ভূমিও পাওয়া গেল।

শিশু নাটকের দলগুলোর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিদেশভ্রমণের সুযোগও নেহাত মন্দ নয়। মূল ধারার সাথে থাকলে বিদেশের নাট্য উৎসবে আমন্ত্রণ পাওয়া যায়। যার ফলে আলাদা একটি শিশু নাটকের দল থাকলে যেমন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয় তেমনি বিদেশভ্রমণের ভালো সুযোগও মিলে। বাংলাদেশে মূল দলের সহায়ক হিসেবে শিশু নাটকের দলসমূহ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর প্রধান কারণ শিক্ষাব্যবস্থা। এই সময়ের অভিভাবকেরা চান না তার শিশু নাটকের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে সময় ব্যয় করুক। জিপিএ ফাইভ পাওয়ার লড়াইয়ে সবাই ব্যস্ত। ভালো নম্বর, সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এসব নিয়ে ব্যস্ত অভিভাবকরা। আবার আরেক শ্রেণির অভিভাবক আছেন যাঁরা সন্তানদের তারকা বানাতে চান। তাই অভিনেতা হিসেবে প্রস্তুতির জন্য যোগাযোগই হাতিয়ার হয়। অভিভাবকেরা সন্তানকে নাট্যকর্মী নয় তারকা বানাতে চান। বাংলাদেশে প্রচুর বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল থাকার কারণে কোনো এক চ্যানেলে ঠিকই অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া যাবে। এখানে অভিনেতাকে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। অসংখ্য বেসরকারি চ্যানেলের দাপটে শিশু অভিনেতার জন্য প্রস্তুতির দরকার হয় না।

শিক্ষাব্যবস্থার কারণে অভিভাবকেরা চান না তাঁর শিশু নাটকে সময় অপচয় (!) করুক। একজন শিক্ষার্থীকে নিজের শিক্ষাজীবন শেষ করার জন্য চারটি পাবলিক পরীক্ষা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষামুখী শিক্ষাব্যবস্থার কারণে মানুষ হিসেবে বিকাশের সুযোগ কমে আসছে। শিক্ষা এখন পণ্য ছাড়া আর কিছুই না। তাই স্কুল থেকে ফিরেই শিশুকে ছুটতে হয় কোচিং ক্লাসে নতুবা কোনো একজন শিক্ষকের কাছে কোনো বিষয়ে পাঠ নিতে। আর যেটুকু সময় থাকে তা দেয় ইন্টারনেট কিংবা টেলিভিশনকে। এখন স্কুলগামী শিশুদের বড় একটা অংশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয়। তাদের হাতে থিয়েটার করার একদম সময় থাকে না। দলগুলোর মহড়া হয় যে কোনো একটা উৎসব অথবা বিদেশভ্রমণকে কেন্দ্র করে। শিশু নাটকের নিয়মিত প্রদর্শনীর কোনো আয়োজন করা যায় না। এই কারণে শিশু নাট্যচর্চা মুখ থুবড়ে পড়েছে। নাটকের দলগুলোর পক্ষে শিশুনাট্যচর্চা অনেকটা মৌসুমি হয়ে গেছে। আবার একই সঙ্গে বলা যায়, শিশু নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে দলগুলো সরকার থেকে কোনো সহায়তা পায় না। এমনকি শিশু একাডেমির নাটক মঞ্চায়ন অনুপযোগী একটি মিলনায়তন থাকলেও কোনো স্টুডিও নেই যেখানে নাটক মঞ্চায়িত হতে পারে। শিশু একাডেমির নাট্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দিন দিন এখানে বিদ্যার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ এখানে প্রশিক্ষকদের যে সম্মানী দেওয়া হয় তাতে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষক কাজ করবেন না। নাটক এখানে অবহেলিত দীর্ঘদিন ধরে। শিশু একাডেমির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তো টেলিভিশনে সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই শিশুরা এখানে আগ্রহ হারাচ্ছে। আবার যোগ্য প্রশিক্ষকের সংকটও একটা বড় কারণ। বাংলাদেশের শিশু নাট্যচর্চায় পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন উৎসবসহ নানা আয়োজনে নাটককে

অগ্রসর করার প্রয়াস নিয়েছে। তারা নিয়মিত শিশুনাটক মঞ্চায়ন, নাটকের দর্শক তৈরি করা এবং শিশুদের নাটকের দল সংগঠিত করার পাশাপাশি নতুন নতুন নাটকের দল তৈরির প্রয়াস নিয়েছে। তারা বছরে যে একটি নাট্যউৎসব করে তাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নাটকের দলসমূহ অংশ নেয়। এই উৎসবে সাধারণ দর্শকসহ বিপুল সংখ্যক নাট্যকর্মী অংশ নেয় যার ফলে উৎসবস্থল জমজমাট হয়। যদিও শিশুনাট্যের চেহারা এর চেয়ে নিশ্চিতভাবেই খারাপ। পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন বিভিন্ন সময় এই সংগঠনভুক্ত দলসমূহে বিদেশভ্রমণের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু নিয়মিত নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে তাদের এ উদ্যোগ কোনো ফল বয়ে আনতে পারছে না।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে নাট্যচর্চা থাকলেও তা মূল ধারা থেকে দূরবর্তী। তারা বছরে বিভিন্ন উৎসবে নাটক মঞ্চায়িত করে। এই নাটকগুলো সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চায়িত হয় না। তাদের চর্চা স্কুলের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে। স্কুলকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা আবার কখনো কখনো দেশজ রীতি থেকে দূরে অবস্থান করে। ইংরেজি ভাষায় তারা নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। যার সাথে বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি কিংবা ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও ইংরেজি একক ভাষা হিসেবে বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত। তারপরও একথা বলা অসঙ্গত হবে না বাংলা ভাষার শক্তি আছে, এই শক্তির জোরেই ইংরেজি এদেশে প্রবল প্রতাপে শাসন করতে পারছে না। উন্মুল মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ পথে হাঁটতে চাইলেও প্রস্তুতির অভাবে সে পরাজিত হয়েছে। এখানে ইংরেজি নাটকের পাশাপাশি দেশীয় নাট্যকারদের নাটকও মঞ্চায়নের উদ্যোগ থাকা দরকার।

বাংলাদেশের শিশু নাট্যচর্চার ভূমি কর্ষণের সুযোগ আছে। বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিশু নাট্যকার রয়েছেন। মঞ্চায়ন না হওয়ার কারণে শিশু নাটকের নতুন নাট্যকার তৈরি হচ্ছে না। অথচ ব্রিটিশ-পরবর্তী বাংলায় নাট্যকার হিসেবে আমরা পাই বন্দে আলী মিঞা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, হবিবুর রহমান, জোবেদা খানম, কল্যাণ মিত্র, আলাউদ্দিন আল আজাদ, নুরুল মোমেন, রশীদ হায়দার, ফজল এ খোদা, সৈয়দ শামসুল হক. আসাদ চৌধুরী, নাজমা জেসমিন চৌধুরী প্রমুখ। এ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য এ মুহূর্তে নাট্যকার-সংকট যতটা না তার চেয়ে বেশি সংকট কর্মী, নির্দেশক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর। এই সংকট উত্তরণের মধ্য দিয়ে সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। এ পর্যায়ে যে উদ্যোগ নিতে হবে–

প্রথমত, দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে শিশু নাটকের দল পরিচালনা না করে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে হবে। দলের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব শিশু নাটকের কর্মীদের গায়ে লাগবে না।

দ্বিতীয়ত, স্কুলকেন্দ্রিক নাটকের দল গঠন করতে হবে। এখানে একই সঙ্গে এসেম্বলি থিয়েটার, টিফিন থিয়েটার ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। যার ফলে শিশু-কিশোররা থিয়েটার বিষয়ে আগ্রহী হবে। সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করবে স্কুল। এখানে বিদ্যার্থীরা অবসর সময়টা কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

তৃতীয়ত, উৎসবকেন্দ্রিক নাটকের প্রদর্শনী নয়, নিয়মিত প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিতে হবে।

তবে উল্লিখিত কাজ করার জন্যে যা করা সবার আগে প্রয়োজন তা হল সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ। তৃতীয় বিশ্বের দেশে এ জাতীয় উদ্যোগ কখনোই ব্যক্তিপর্যায়ে বা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ নেবে না। আবার একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে দীর্ঘ সময়ের সামরিক শাসন এবং বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় মৌলবাদ উত্থানের এ কালে রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্বিষ্ট প্রগতিশীল শক্তিকেই উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের নাটক মঞ্চায়নের জন্য ১০০ আসনের একটি মিলনায়তন নির্মাণ করতে হবে। এতে প্রতিসপ্তাহে দুদিন নাটক মঞ্চায়নের সুবিধা রাখতে হবে। আবার যে দলসমূহ নাটক প্রদর্শনী করবে তাদের প্রযোজনা ব্যয়ের একটা অংশ রাষ্ট্র বহন করবে। তবেই বাংলাদেশে শিশু নাটকের প্রাণদায়ী চর্চা শুরু হবে।

[লেখক: নাট্যকার ও নির্দেশক। কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমি।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র-বাস্তবতা

মো. আ মি নু ল ই স লা ম

আমরা জানি শিশুরা সর্বদাই কল্পনাপ্রবণ। বোধ জাগৃতির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের পছন্দতালিকার শীর্ষে উঠে আসতে থাকে তার চোখে দেখা প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্নতর রং, রূপ, রেখা, আকার, আয়তনের দৃশ্যবস্তু কিংবা উপরোক্ত সকল প্রত্যয়ের সংশ্লেষে সৃষ্ট নানারূপ মাধ্যমসমূহ। ক্রমশ গল্প শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হলে লক্ষ করা যায় যে,

সদ্যপরিচিতের চেনা বাস্তবতায় ঘটে যাওয়া কোনো বিষয় বা আখ্যানের চেয়ে রূপকথার রাজা-রানি-রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রতিই তাদের আগ্রহ বেশি। আগ্রহ উপকথায় বিধৃত বিচিত্রনামা পশুপাখি তথা প্রতিকূলের সমাহারে সৃষ্ট চরিত্রনির্ভর গল্পের প্রতিও শিশুর মনোযোগের ঘাটতি দেখা যায় না। তাই অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের প্রতিও শিশু-কিশোরদের দুর্নিবার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। শিশু-মনস্তত্ত্বের এই জটিল অথচ আগ্রহোদ্দীপক বিষয়টির চমৎকারিত্বপূর্ণ প্রয়োগ-সম্ভাবনা এবং একইসঙ্গে এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ওয়াল্ট ডিজনি একদা অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই উপলব্ধির ফসল বিশ্বব্যাপ্ত চলচ্চিত্র-বাণিজ্যেও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তিনি শিশুদের জন্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন জগদ্বিখ্যাত শিশুতোষ গল্প-গাথা বা আখ্যানকে অ্যানিমেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্রায়ণে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাসসমূহ শিশুদের মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে পুনর্লেখনের প্রচলন যেমন লক্ষ করা যায়; তেমনি লক্ষ করা যায় সেসবের শিশুতোষ চলচ্চিত্র বা অ্যানিমেশন চিত্রের নির্মাণও।

শিশুদের যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া সাপেক্ষে অর্থাৎ কেবল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের গণ্ডি অতিক্রম করে ছবি, বই, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, কম্প্যুটার, ইন্টারনেট প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ সাধনের ফলে তার যোগাযোগ চাহিদারও অবিরত সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে। যুগ পরিবর্তনের ধারায় একইসঙ্গে বিস্তৃত লাভ করে চলেছে তাদের কাঙ্ক্ষিত পছন্দের তালিকাও। চলচ্চিত্রমাধ্যমে শিশুর এইসকল চাহিদাকে পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্য নিয়েই যেন অনেকটা তার সম্মুখে আবির্ভূত। চলচ্চিত্রমাধ্যমের প্রাযুক্তিক চমৎকারিত্ব শিশুমনকে অতি সহজেই আলোড়িত ও আবিষ্ট করতে সক্ষম। সেই প্রযুক্তির সঙ্গে রোমাঞ্চকর ও কল্পনাশ্রয়ী আখ্যানের সংযোগে সহজ-সরল এবং শিশুদের বোধগম্যরূপে নির্মিত চলচ্চিত্র শিশুরা আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিশুদের মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে কল্যাণকর চলচ্চিত্রের সংখ্যা আমাদের দেশে হতাশাজনক। ইতিপূর্বেও প্রকারান্তরে তা ব্যক্ত হয়েছে। শিশুদের উপর চলচ্চিত্রসহ অপরাপর গণমাধ্যমের যথা ছবি, বই, টেলিভিশন, কম্পিউটার প্রভৃতির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অনস্বীকার্য। কেননা বাস্তব জগৎ থেকে মাধ্যমের জগৎকে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধির ক্ষমতা শিশুর নেই। উপরন্তু, চলচ্চিত্র শব্দ, রং, ছবি, গল্প, সংগীত প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট আকর্ষণীয় এক প্রাযুক্তিক মাধ্যম। সেই সঙ্গে বাস্তবতার এক মায়া বা illusion এর সর্বাঙ্গে লিপ্ত বলে শিশুর পক্ষে এহেন পর্যায়ে বস্তুজগৎ ও মাধ্যমজগতের পার্থক্য নির্ণয় দুরূহ। অপরদিকে, বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান আহরণের জন্যও যে কোনো শিশুর পক্ষেই গণমাধ্যমের ভূমিকা সক্রিয় বলে স্বীকৃত। চলচ্চিত্রের ন্যায় টেলিভিশনও শিশুকিশোরদের সম্মুখে আগ্রহোদ্দীপক জগতের পটভূমি তুলে ধরে। সমালোচকের মতে: শব্দ, রং, গল্প, গান, ছবি মিলিয়ে চলচ্চিত্র অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি মাধ্যম। তার চেয়েও হৃদয়হরণকারী হল টেলিভিশন। শিশুদের জন্য তো বটেই, কেননা টেলিভিশন দেখবার জন্য খুব বেশি লেখাপড়া জানবার প্রয়োজন হয় না। চলচ্চিত্রও এখন শিশুরা টেলিভিশনেই বেশি দেখে। বসবার বা শোবার ঘরে থেকেই যখন তখন বেশ দেখা যায় এই মাধ্যম।

ফলে শিশুর কাছে গণমাধ্যমের জগৎ আর বস্তুজগৎ একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত প্রায় বিভেদহীন বলা যায়। অনেক গবেষক শিশুদের টেলিভিশন দেখার উপর গবেষণা করে যে প্রতিপাদ্য দাঁড় করিয়েছেন তা অনেকটা এরূপ: টেলিভিশন দেখতে দেখতে অনেক শিশুর কাছে সেখানকার উপস্থাপিত ছবিগুলোকেই বাস্তব বলে বোধ হয় এবং কাহিনীর বিচ্ছিন্ন পরিচিত ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে তাদের সাড়াও লক্ষ করা যায়।

শিশুদের জন্য বিশেষায়িত চলচ্চিত্র ব্যতিরেকেও সাধারণ কাহিনীচিত্রেও শিশুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এসব চলচ্চিত্রে শিশু বা কিশোরদের চারিত্রিক রূপায়ণ ঘটে সাধারণত শিশুতোষ মনোভঙ্গিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে। কাহিনীর প্রতি সততার পটভূমির অজুহাত কিংবা কারণ দেখিয়ে শিশুর মনোভঙ্গিগত উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ জাতীয় চলচ্চিত্রে শিশুর প্রতি অমানবিক আচরণ প্রদর্শনসহ তাদের দ্বারা নীতিবহির্ভূত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুর প্রতি একেবারে ঋণাত্মক মনোভাব পোষণের মাধ্যমেও কাহিনীর প্রাগ্রসরতা লক্ষ করা যায়। যদিও আপাতভাবে ধরে নেয়া হয় যে, শিশুর প্রতি সমাজ ও পরিবারের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি কেবল কাহিনীর বিন্যাসে অনিবার্য কিন্তু শিশুনীতির প্রশ্নে এরূপ সমঝোতা করার অর্থই হল শিশুর অধিকার লঙ্ঘন করা। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র মাধ্যমে এমনসব কাহিনীর প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা দেখা যায় যা দর্শনান্তে দর্শক-শ্রোতার পক্ষে নিয়তিবাদের প্রতি আত্মসমর্পণের বিকল্প থাকে না। প্রচল ধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে এ এক সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি এরূপ বিষয়ও দেখা যায় যা প্রত্যক্ষ বা উপভোগ করলে ভাবপ্রবণতার আতিশয্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ধর্মীয়ভাবে চলচ্চিত্রমাধ্যমে ভোক্তাদের মোহগ্রস্ত রাখার প্রবণতা উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রের ন্যায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও বিদ্যমান। এদেশের অনেক চলচ্চিত্রেই পীর-ফকিরের মাজার, মসজিদের গম্বুজে আরবি হরফে মুদ্রিত 'আল্লাহ' লেখা এবং ঘরে বাঁধানো মক্কা-মদিনার ছবিসমূহ ইনসার্ট (insert) ও ইম্পোজিশন (impostion) পদ্ধতির মাধ্যমে পুনঃপুন আপতনের ফলে সৃষ্ট দৃশ্যাবলির সম্মুখে চলচ্চিত্রের বিপদগ্রস্ত চরিত্রের আহাজারি এবং একপর্যায়ে বিপদ থেকে মুক্তিলাভ বাস্তব জীবনে সম্ভব না হলেও চলচ্চিত্রে সম্ভব দেখানো হয়। দৃশ্যমাধ্যম বা চলচ্চিত্র কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিফলিত এরূপ সক্রিয় চিত্র মানুষের ভাবাবেগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে পক্ষান্তরে তাকে মোহগ্রস্ত রাখার অপপ্রয়াস চালাতেই দেখা যায়। এতে সাধারণ দর্শকের মনে পলায়নপর মানসিকতার জন্ম নেয়। দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়ার ফলে মানসিকভাবে পঙ্গু একপ্রকার দর্শকগোষ্ঠীর জন্ম হয়। বর্ণিত এরূপ দৃশ্যাবলি শিশুমনেও উদ্দীপনায় সাড়া জাগায় এবং ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অথচ শিশু-কিশোর মানসিকতার উপযোগী কতই-না বিচিত্র বর্ণিল কাহিনীর অস্তিত্ব আমাদের বিশুদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যই নয় বাংলার লৌকিক জগতে মৌখিক রীতির শিশুতোষ গাথা-গল্পের পরিমাণও কম নেই। শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণে কোনো কোনো সমালোচক-তাত্ত্বিক বিশ্বের চিত্রনির্মাতাদের স্ব-স্ব অঞ্চলের প্রচলিত প্রাচীন ও বহুমুখী সাংস্কৃতিক উপাদান যথা গল্প, গাথা ও লোককথার মৌখিক ঐতিহ্য, যেখানে

মানবীয় গুণবিশিষ্ট পশুপাখি চরিত্রের সমাহারে সমৃদ্ধ; রূপকথার রাজা-রানি, রাজপুত্র-রাজকন্যা, দেব-দৈত্য, হীরা-মাণিক্যের ছড়াছড়ি সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধের আহ্বান জানান। এই বলে যেন সচেতনও করে দিতে চান যে, লোক-বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা প্রবাদ-প্রবচন ও শিশুভোলানো ছড়া-কবিতার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অসম্ভব রকমের চলচ্চিত্রিক সম্ভাবনা। আর এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

আমি চাইব বাংলার শিশু-সিনেমা এই সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও শৈলীকে গ্রহণ করুক। আমি সর্বোপরি চাইব বাংলার শিশু সিনেমা বাংলা ভাষার সযত্ন, সংবেদনশীল ও সৃষ্টিশীল প্রয়োগ ঘটাক। বাংলা ভাষার বিবিধ সম্পদ (উল্লিখিত) শিশুদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে যা দরকার তা হল, বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ছবির বিষয়বস্তু করে তোলা। শিশুদের সঠিক সময়ের আগে ও দীর্ঘ সময় ধরে ইংরেজি বা হিন্দির মতো অন্য কোনো ভাষার সংস্পর্শে রাখা তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখা আদৌ আপত্তিকর নয়, কিন্তু গোটা এক প্রজন্ম যদি শৈশবাবস্থায় নিজের মাতৃভাষা সঠিকভাবে না শেখে তবে তার ভবিষ্যৎ ফল খুবই খারাপ হতে পারে। ভিন্ন একটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক এহেন মন্তব্য করলেও স্বাধীন বাংলাদেশের এবং বাঙালির স্বাজাত্যবোধ-ধারণা বিকাশেও উপরোক্ত মন্তব্য যথার্থ। কারণ প্রচলিত চলচ্চিত্র ধারায় আমরা এমন অনেক চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ করি যেসব প্রত্যক্ষণের সময় চলচ্চিত্রের পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা বাংলা হলেও আশ্চর্য হতে হয় তা কোন্ দেশীয় চলচ্চিত্র এই ভেবে! বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে চলচ্চিত্র প্রসঙ্গের আলোচনায় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের উচ্চারণও শোনা যায়। চলচ্চিত্রকে আবর্তিত করে অর্থনীতির এরূপ বিশ্লেষণের সময় দর্শক হিসেবে শিশুর অবস্থান মূল্যায়নের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ফলে সামাজিক এক প্রকার শূন্যতার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনার ক্ষেত্রে উঠে আসে। দর্শক বা ভোক্তা হিসেবে শিশু-কিশোরদের গুরুত্বের এই অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র একদিকে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার উৎসে পরিণত। অপরদিকে অধিকাংশ নির্মাতাদের ব্যক্তিগত খেয়ালের চরিতার্থতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যাকে আমরা চলচ্চিত্র শিল্প বা film industry বলে জানি। যদিও স্বীকৃত যে, চলচ্চিত্র প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতারই প্রকাশমাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চৈত্রিক পটভূমি বিশ্লেষণে এমতো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই অবান্তর মনে হয় না যে, চলচ্চিত্র মাধ্যমে এরূপ প্রকাশে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধের চেয়ে স্বেচ্ছাচারিতার বহিঃপ্রকাশই বেশি। কেননা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রমাধ্যমে শিশু-কিশোর চরিত্র উপস্থাপনায় কিংবা দর্শক হিসেবে শিশু-কিশোরদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্মাতারা মানবিক, সামাজিক এবং শৈল্পিক নীতিবোধের কোনোরূপ মনোনিবেশ করেন না। এ অবস্থা কেবল শিশু-কিশোর চলচ্চিত্রের জন্যই যে প্রযোজ্য তা নয় বরং এ অবস্থা বাংলাদেশের সার্বিক চলচ্চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে অনিবার্য এক বাস্তবতা। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এরূপ অবস্থাদৃষ্টে সংক্ষুব্ধ সমালোচক এবং চলচ্চিত্রনির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল বলেন:

বাংলাদেশের ইদানীংকার ছবিতে আরবি ঘোড়া আছে, ইরানি পোশাক, তুঘলকি দরবার, মায় টেক্সাসের পাহাড় (!) এ সবকিছুই আছে, নেই শুধু বাংলাদেশ। মূর্তিমান অপসংস্কৃতির প্রতীক এইসব ইতিহাস-ভূগোলহীন ছবি আমাদের সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে প্রতিনিয়ত যে অশুভ প্রভাব ফেলছে, সে সম্পর্কে দেশের সচেতন মানুষেরা বিভিন্ন সময়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ছাত্রসমাজ ও চলচ্চিত্র সংসদকর্মীরা এর বিরুদ্ধে ঢাকায় মিছিল পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! সর্বাধুনিক শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রের এসব নির্মাতারা সমাজে নানারকম মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ছড়াচ্ছে, জনগণের সামাজিক ও নান্দনিক চেতনাকে ভোঁতা করছে, এবং একইসঙ্গে মোটা পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে।

উল্লেখের অবকাশ রাখে না যে, সাম্প্রতিক মুক্তবাজার অর্থনীতিকালে মাধ্যম-ব্যবস্থাপনার বিশ্বায়নে মানুষের নৈতিক জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবশ্য এ কথার অর্থ নির্বিশেষে এই নয় যে, আজকের মানুষ সার্বিকভাবে নৈতিকতাবিবর্জিত। আমাদের ধারণা মাধ্যম-পরিস্থিতির জন্যই নৈতিকতা সম্পর্কে মানুষের স্থিতিশীল ধারণা দিন দিন ক্রমশ অস্পষ্ট, অস্থির এবং বিভ্রান্ত হয়ে উঠছে। কারণ মাধ্যমকে আশ্রয় করেই মুক্তবাজার অর্থনীতি বা Open Market Economy-র নামে, Entertainment-এর নামে উন্নয়নশীল দেশসমূহে মৌলিক সংস্কৃতিচর্চার পরিবর্তে Synthetic সংস্কৃতিচর্চার যে আগ্রাসন দিন দিন বেড়েই চলছে তার ভালো-মন্দ বিবেচনার বোধ সাধারণ নাগরিকের কাছে কতটা স্পষ্ট তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সমালোচকের নিম্নোক্ত বক্তব্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন লাভ করা যায়: 'কোনটা ভালো' আর 'কোনটা মন্দ', এই বিষয়ে কোনো সমাজেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থাকে না; বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, যে কোনো সময়েই, 'ঠিক' এবং 'ভুল' সম্পর্কে কোনো একটি সমাজে একটি বিস্তারিত ধারণার প্রচলন থাকে, যা ওই সমাজব্যবস্থাটিকে নৈতিক স্থিতিতে ধারণ করে। আবার, যে কোনো সময়েই নির্দিষ্ট মাত্রার স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তাসহ 'ঠিক' এবং 'ভুল' সম্পর্কে জনগণের ব্যক্তিগত ধারণাকে আধার করেই সমাজে একটি স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে যে অবস্থাটি চলছে, তাতে [আমি মনে করি], 'ঠিক' এবং 'ভুল' সম্পর্কে জনগণের কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। যেভাবে আগে কোনো বিষয় ভালো-মন্দ অনুভূত হত, বর্তমানে সেই পরিচ্ছন্নতা আর নিশ্চয়তা নিয়ে তারা সেই ধারণায় অটল থাকতে পারে না; পুরনো দিনের পুরনো মূল্যবোধের জন্ম হয়নি। অন্যকথায়, জনগণের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে নয় (যা সর্বদাই সত্যি, আজকের দিনে আরও বেশি সত্যি) 'ঠিক' আর 'ভুল' সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে অস্থিরতা আর অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই কারণেই আমরা আজকে এমন সমাজব্যবস্থায় বাস করছি যেখানে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। নতুন স্থিতিশীল ব্যবস্থা সৃষ্টির কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না।

মুক্তবাণিজ্যের দর্শন বা philosophy-কে অবলম্বন করে সত্তর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়ার তুমুল আগ্রাসন একদিকে ধনিক গোষ্ঠীর কাছে পুঞ্জিভূত স্বাচ্ছন্দ্যের তরঙ্গ বইয়ে দিচ্ছে অন্যদিকে অগণিত সাধারণ মানুষকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াজাত বঞ্চনার শিকারে পরিণত করে

তুলছে। শুধু তাই নয়, তত্ত্বগতভাবে এই প্রক্রিয়া প্রতিটি দেশের স্বাধীন সরকার-ব্যবস্থাপনাকে পঙ্গু করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করছে নানারূপ কৌশলী নীতিমালা। ফলে তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনে corporate economy এবং corporate culture সক্রিয় হয়ে ওঠার বাঙালির আবহমানকালের নৈতিক সামাজিক মূল্যবোধসহ মানুষে মানুষে বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও নঞর্থক রূপান্তর শুরু হয়ে গেছে। আমরা আমাদের শিশুদের সামনে কী স্বপ্ন, অথবা স্বপ্ন পূরণের কোন্ ফরমুলা রেখে 'মানুষের মতো মানুষ হ বাছা' বলে আশীর্বচন করব সেক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে গভীর সংকট। কিন্তু আগামী প্রজন্মের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাই নির্মাতার শাণিত ভাবনার সংকট দেখা দিলে চলবে না। শিশুর জন্য প্রত্যাশিত চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্মাতাকে অবশ্যই বর্ণিত বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সমালোচকের ভাষায়: মানুষ শুধু খেয়ে বাঁচে না, বাঁচতে নানারকম ছবিও লাগে। ছবি হতে পারে রঙে-রেখায়, যেমন চিত্রশিল্প, আলোকচিত্র, সিনেমা, টেলিভিশন; নয়ত কথায় যেমন উপন্যাস। ছবি যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। মানুষের ছবি ছাড়া চলে না। তাই আজ যে নতুন পদ্ধতিতে ছবি তৈরি হচ্ছে, তা চিন্তার কারণও বটে, বিস্ময়ের কারণও বটে। কম্পিউটার এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে আজ যেভাবে ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে, আগে তা ভাবাও যেত না। তাছাড়া বাস্তবের সাথে এ এই ছবির সম্পর্কও সম্পূর্ণ নতুন। আসলে কোনও কোনও ছবির বাস্তবতা একান্ত নিজস্ব। ছবির বাইরের কোনও কিছুর কথা তারা বলে না। 'অসদ'-বাস্তব, (বা 'কল্প'-বাস্তব), কিন্তু বাস্তব বটে। সুতরাং বাঙালির আবহমানকালের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, মানুষে মানুষে বিশ্বাসের ঐতিহ্যের ভিত্তিসহ আর্থসামাজিক নানা প্রসঙ্গ এবং অনুষঙ্গের পাশাপাশি প্রাযুক্তিক বিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কেও চলচ্চিত্রনির্মাতা বিশেষত শিশুতোষ চলচ্চিত্রনির্মাতাদের সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্রের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশমালা

১. বছরে কমপক্ষে দশটি স্বল্পদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়ে সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে বদ্ধপরিকর হতে হবে।

২. যেসব শিশু চলচ্চিত্রের আখ্যান বা কাহিনী ও বিষয়বস্তু লোক-বাংলার প্রচলিত শিশুতোষ গল্প, গাথা, প্রবাদ, প্রবচন নির্ভর হবে অগ্রাধিকারে সেসব চলচ্চিত্রের অন্তত ৯০% ভাগ ব্যয় সরকারের অনুদান থেকে বহনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্ভর গল্পভিত্তিক শিশুতোষ চলচ্চিত্রের জন্যও এই ধরনের অনুদান প্রথা কার্যকর রাখা উচিত। তবে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্ভর শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হলে এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, প্রাযুক্তিক কৌশল প্রয়োগের অজ্ঞানতা শিশু দর্শকদের উপর কোনোক্রমেই চাপানো ঠিক নয়। এতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

৪. কারিগরি ও প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও সম্ভাবনা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এদেশের শিশুদের জন্য বিশ্বখ্যাত গল্প-গাথা, মিথ, ফেইরিটেলস, ও রূপকথার কাহিনীনির্ভর ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষার শিশুচলচ্চিত্র বাংলা ভাষায় ডাবিং-এর মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। এবং এই প্রকল্পের আওতায় দেশের সমগ্র শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বছরে কমপক্ষে একটি চিরন্তন শিশু-কিশোর সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ নিশ্চিত করা।

৬. বাঙালির জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নানা আন্দোলন-সংগ্রাম অবলম্বনপূর্বক বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্যের পাঁচটি করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পের আওতায় জাতীয় বীর ও খ্যাতিমান মনীষীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রদর্শিত প্রতিভার উপর ভিত্তি করে জীবনীমূলক চলচ্চিত্রও নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ফলে শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে এবং জাতীয় জীবনে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে উঠবে।

৭. শিশুতোষ চলচ্চিত্রের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন: বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ডিএফপি, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ টেলিভিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রভৃতির সংশ্লিষ্ট ভগ্নি-প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলনে একটি স্বতন্ত্র 'সেল' গঠন এবং উক্ত সেলের যথোচিত ভূমিকা নিশ্চিত করা।

৮. শিশু-কিশোর শ্রেণির চলচ্চিত্রের জন্য স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং এই শ্রেণির চলচ্চিত্রের উপর থেকে প্রমোদকরসহ যাবতীয় কর প্রথা রহিত করা। এর ফলে নির্মাতারা শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণে পূর্ণ মনোযোগী ও আগ্রহী হবেন। ফলে যুগোপযোগী শিশুতোষ চলচ্চিত্রনির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠবে।

৯. মাসে কমপক্ষে দুইদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে শিশুদের জন্য উপযুক্ত সময়ে শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা। সম্ভব হলে বেসরকারি চ্যানেলসমূহেও মাসে দুইদিন করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সম্ভব হলে বেসরকারি চ্যানেলসমূহে বিদেশি শিশুতোষ কার্টুন ছবি প্রদর্শনে সরকারের সতর্ক নজরদারি প্রতিষ্ঠা করা, যেন কোনোক্রমেই

হিংসাত্মক মনোভাবাপন্ন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও প্রযুক্তিনির্ভর ছবি আমাদের শিশুদের উপভোগের আওতায় না আসে। কেননা, এসব ছবি প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের পরিবর্তে শিশুমনে অনবরত হিংসার জন্ম দেয়। সুতরাং এ জাতীয় (যথা গ্র্যান সেজার, সেজার এক্স প্রভৃতি) চলচ্চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ করা।

১০. পর্যায়ক্রমে মাসে অন্তত একদিন দেশে প্রতিটি সিনেমা হলে 'শিশু দর্শক দিবস' পালনের মাধ্যমে নামমাত্র মূল্যে (সম্ভব হলে বিনামূল্যে) টিকিটের বিনিময়ে শিশুচলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

১১. দেশের প্রতিটি স্কুলকে (একেবারে প্রাথমিক স্কুলে সম্ভব না হলেও মাধ্যমিক স্কুল পর্যায় থেকে) শিক্ষা, তথ্য এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসে অন্তত একবার নির্ধারিত প্রেক্ষাগৃহে কেবল শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আওতায় আনা। পর্যায়ক্রমে এই বয়স গ্রুপের শিশুদের সঙ্গে দেশজ এবং বিশ্বখ্যাত শিশুতোষ চলচ্চিত্র বা অ্যানিমেশন ফিল্মের পরিচয় ঘটানোর মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মানসিক ও আত্মিক বিকাশ এবং একইসঙ্গে সৃজনশীলতার পথকে সুগমে সাহায্য নিশ্চিত করা।

১২. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক চলচ্চিত্র নির্মাণপ্রক্রিয়া গত দু বছর ধরে থেমে আছে; এই প্রক্রিয়াটি পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে ব্যাপকসংখ্যক শিশুতোষ চলচ্চিত্রনির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা। উপরন্তু এ যাবৎ যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন চ্যানেলে সেসবের ব্যাপক প্রদর্শন শুরু করা।

১৩. বর্তমানে টেলিভিশন মাধ্যমই যেহেতু সকল বয়সী দর্শকের ন্যায় শিশু-কিশোরদেরও আশ্রয়স্থল সে বিবেচনায় বাংলা সাহিত্য এমনকি বিশ্বসাহিত্যের সৃষ্টিশীল রচনাসমূহ শিশু-কিশোর দর্শকদের উপযোগী করে 'সিরিয়াল ফিল্ম' বা ধারাবাহিক চলচ্চিত্রনির্মাণ এবং সকল শিশুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি তা টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা যেতে পারে।

১৪. বছরে অন্তত একবার যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের পড়ালেখার চাপ কম থাকে সেরূপ সুবিধামতো সময়ে সপ্তাহব্যাপী দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা। এরূপ উৎসবে প্রদর্শিত বৈচিত্র্যপূর্ণ নানারকমের চলচ্চিত্র দর্শনে শিশু-কিশোরদের মনোজগতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। জাতির সাপেক্ষে ইতিবাচক ও সৃষ্টিশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় উল্লিখিত দর্শক গ্রুপকে অনুপ্রাণিত করতে হলে সরকারকে জাতীয়ভাবে এরূপ উৎসব আয়োজনে এগিয়ে আসতে হবে।

১৫. জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়নকালে শিশুতোষ চলচ্চিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। 'শিশু-কিশোররা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ' একথা মনে রেখে উক্ত নীতিমালা প্রণয়নে শিশু মনস্তাত্ত্বিক, শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিশুসাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবেত্তার সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র উপ-কমিটিকে এতদ্বিষয়ে নিযুক্ত করা।

শিশুতোষ চলচ্চিত্র শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রেরণা ও গর্ববোধের জন্ম দেয় বলেই আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তাদের সম্মুখে চলচ্চিত্রের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের উন্মোচন ঘটানো। এই মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষায় নিজেরা বয়স্কদের পাশাপাশি তাদের অবস্থানকে সম্মানজনক করে তুলতে পারে। ফলে তাদের মেধা, জ্ঞান, রুচিবোধ হয়ে উঠতে পারে সুস্থ এবং পরিণত। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের সবগুলো যথাযথ নিশ্চিতকরণ সম্ভব হলে কেবল বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্রেরই বিকাশ ঘটবে এমন নয় বরং নির্মিত এসব চলচ্চিত্র দর্শনে আমরা লাভ করব শাণিত মেধাসম্পন্ন একটি সৃষ্টিশীল প্রজন্ম। যাদের সুষ্ঠু নেতৃত্বে আমাদের এই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে বিজয়পতাকা বহন করে চলবে। উপরন্তু, এমন প্রত্যাশাও অসংগত নয় যে, সহস্র বছরের বাঙালি সংস্কৃতির ধারা নবপ্রজ এই শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান ও প্রাযুক্তিক জ্ঞাননির্ভর ও সাংস্কৃতিক সাধনায় আরো প্রাণবান ও গতিশীল হয়ে উঠবে।

উৎস: 'হালখাতা' পত্রিকার 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা'।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক। শিক্ষক, নাট্যকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।]